অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৮

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১।১ দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপদ : কানাই পাল

মূল্য পাঁচ টাকা

অলখ-ঝোরা

১

করুণা ঝির সঙ্গে আতা পাড়িয়া তাহার ছোট টুক্‌রীটি ভর্তি করিয়া সুধা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সূর্যদেব সবেমাত্র অস্তশিখরের অন্তরালে লুকাইলেও, তাহাদের মাঠের মধ্যের বাড়ী তাহারই মধ্যে একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়। বাড়ীর পশ্চিম দিকে একটা পুকুর, তাহার পর প্রায় দুই শত বিঘা সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সুতরাং সূর্যদেব যখন ধরণীর নিকট বিদায় লন, তখন গাছপালা বাড়ীঘরের আড়ালে একটু একটু করিয়া নামেন না, একেবারেই দিগন্তরেখার অন্তরালে চলিয়া যান। সামান্য কিছুক্ষণ পশ্চিম আকাশের মেঘে কিংবা ধূলিজালে বর্ণচ্ছটার খেলা দেখা যায়। তাহার পর অন্তহীন কালো অন্ধকারের স্তূপ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

সুধা বাড়ী আসিয়া দেখিল তাহার ছোট ভাই শিবু বাহির-বাড়ীর খোলা দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। মাথার উপর ধূমলেশহীন বিরাট নীল আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত শুভ্র জলহীন বালুকাময় নদীগর্ভের মত ছায়াপথ আকাশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুধাও চিৎ হইয়া শিবুর পাশে শুইয়া পড়িল। শিবু আকাশের তারার দিকে তাহার ছোট তর্জনীটি তুলিয়া বলিতেছিল, "এক তারা লারাপারা,* দুই তারা···"

সুধা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "কি হিজিবিজি বকছিস্? ঐ দেখ্, একটা তারা খ'সে পড়ল।"

প্রকাণ্ড একটা উল্কাপিণ্ড আকাশের চারিপাশে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দীপ্তি ছড়াইয়া পশ্চিম দিক্ হইতে ছুটিয়া পূর্ব দিকের মাঠের পারে গিয়া পড়িল, শিবু বলিল, "তারা পড়লে কি বলতে হয় বল্ দেখি।"

* লারা=নারা, না-পারা

সুধা মাদুরের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আহা, তা যেন আর আমি জানি না! ছ'টি ব্রাহ্মণ, ছ'টি ফুল আর ছ'টি পুকুরের নাম করতে হয়। এই আমি বলছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তুইও বল্। হরিহর, বিষ্ণুরাম, বেণু, রতনকেষ্ট, গোপী, ছোটকালী, তারপর গে গোলাপ, দোপাটি, টগর, জবা, শালুক..."

শিবু বলিল, "দিদি, তুই কিচ্ছু জানিস্ না। এগারটি ব্রাহ্মণের নাম করতে হয়।"

সুধা বলিল, "উনি মহাপণ্ডিত ভট্‌চায ঠাকুর এলেন আমার ভুল ধরতে! বল্ দেখি সাপের নাম করলে রাত্তিরে কি বলতে হয়?"

শিবু বলিল, "নারায়ণং নমস্কৃত্য..."

সুধা গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, কোথায় যাব আমি? ওই বুঝি বলতে হয়? বলতে হয়, অস্তি কস্তি মুনিম্ মাতা, ভগিনী বাসুকী যথা, জরৎ-কারু মুনিঃ পত্নী মনসাদেবী নমস্ততে।"

সুধার সংস্কৃতের ভুল বুঝিবার ক্ষমতা শিবুর ছিল না, সুতরাং শিবু হার মানিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই গো তাই। কিন্তু আমার যে বড্ড ঘুম পেয়েছে। চল্ রান্নাঘরে যাই। ভাত হয়েছে ত খেয়ে ঘুমোই গে।"

তাহারা এতক্ষণ বাহির-বাড়ীর দাওয়ায় শুইয়াছিল। সুধা টুক্‌রীটা এবং শিবু মাদুরটা টানিতে টানিতে ভিতর-বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল। শুইবার ঘরের কোলে ঢাকা বারান্দা, তাহার পর উঠান, উঠানের ওপারে রান্নাঘর। উঠানের মাঝখানে মস্ত একটা পেয়ারা গাছ, দুই দিকের বারান্দার পর্দার কাজ করে। রান্নাঘরের খোড়ো বারান্দার তলায় উবু হইয়া বসিয়া মা ও পিসিমা ছেলেদের ভাত বাড়িতেছিলেন। পেয়ারা গাছের আড়ালে হারিকেন লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় তাঁহাদের মুখ ভালো করিয়া দেখা যায় না। মা'র মাথার কাপড়টা পড়িয়া গিয়াছে, মস্ত খোঁপাটা উঁচু হইয়া আছে, পিসিমার স্বল্পকেশ মাথার উপর থান কাপড়ের ঘোমটা। বাতির আলোয় তাঁহাদের মাথার ও খোঁপার গঠনের বড় বড় কালো ছায়া সুধার চোখে ভারি সুন্দর ঠেকিতেছিল। সত্যকারের মায়ের সৌন্দর্যের চেয়ে এই ছায়াময়ী মা'র রূপই যেন তাহার মনের রূপতৃষ্ণাকে বেশী তৃপ্ত করিল। মা'র হাতনাড়ার সঙ্গে ছায়ার হাত নড়িতেছে, মা হাতা হাতে উঠিতে বসিতে ছায়াও উঠিতেছে বসিতেছে, সুধা মুগ্ধ হইয়া তাহাই

দেখিতেছিল। সুধা বায়োস্কোপ কখনও দেখে নাই, কিন্তু দেখিলেও তাহাতে ইহার চেয়ে বেশী আনন্দ বোধ হয় সে পাইত না।

শিবু নাকিসুরে বলিয়া উঠিল, "দিঁদিঁ, মাকে ডাক না। আঁর আমি বসতে পা'চ্ছি না।"

সুধা চমকিয়া ডাকিল, "মা গো, শিবু যে ঘুমিয়ে পড়ল, ভাত কখন দেবে?"

মা মহামায়া মাটির হাঁড়ি হইতে হাতা করিয়া ভাত তুলিয়া শালপাতার উপর পরিবেষণ করিয়া কালো হাঁড়িটা রান্নাঘরের উঁচু তাকে বিঁড়ার উপর তুলিয়া রাখিলেন। তারপর এদিকে আসিয়া শিবুর চোখে জলহাত বুলাইয়া তাহাকে টানিতে টানিতে ভাত খাওয়াইতে লইয়া চলিলেন।

পিসিমা হৈমবতী মোটাসোটা ভারী মানুষ। তাঁহার চালচলন কিছুই মোলায়েম নয়। গলার আওয়াজটা পুরুষের মত মোটা, কথা বলেন ধমক দিয়া, হাঁটেন দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা অন্য রকম। কর্তব্যবোধের তাড়নায় তিনি মানুষের সেবা-যত্ন করেন, কি মমতার আধিক্যে করেন, তাহা তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া কেহ বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার সেবার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার উপর খুশী থাকে।

শিবু ভাত খাইতে খাইতে সুধার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িতেছিল, চোখ দুইটি তাহার তখন সন্ধ্যার পদ্মের মত মুদিত হইয়া আসিতেছিল। মহামায়া তাহার ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়া নাড়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী সোনা আমার, একবারটি সোজা হয়ে ব'সে এই ক'টা গরাস খেয়ে ফেল, তারপরেই ঘরে গিয়ে শোবে।" কিন্তু কে বা শোনে তাঁহার কথা? শিবু সুধার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। হৈমবতী ঝোলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া দুম্‌দাম্ করিয়া শিবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া মোটা গলায় তাড়া দিয়া বলিলেন, "ও ছেলে! ভাত ভাত ক'রে অস্থির ক'রে শেষে এক কাঁড়ি ভাত নষ্ট করতে বসেছিস্? দাঁড়া আমি পরাণ মোড়লকে ডেকে দিচ্ছি এখ্খুনি; তার বাঁকা মুখটা নিয়ে তোকে এসে এক কামড় দেবে।"

শিবু তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। পরাণ মোড়লকে ভয় না

করে এমন ছেলে এ তল্লাটে একটিও ছিল না। বিশেষতঃ রাত্রে তাহার নাম শুনিলে ত ছেলেদের বাবাদেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। মসীকৃষ্ণ পরাণ *বয়সকালে মস্ত পালোয়ান ছিল, এখনও তাহার শৌর্যবীর্যের বিশেষ অভাব হয় নাই। কিন্তু শুধু এই কারণেই যে ছেলেরা তাহাকে ভয় করিত তাহা নয়।* একবার মৌবনীর শালবনে শালগাছ কাটিতে কাটিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়ায় পরাণ বুনো ভালুকের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। যুদ্ধে সে ক্রুদ্ধ ভালুককে হার মানাইয়া নিজের প্রাণটি লইয়াই ফিরিয়াছিল, কিন্তু হিংস্র ভালুকের নখরাঘাতে তাহার নাক মুখ চোখ কোনওটাই আর পূর্ববৎ যথাযথ স্থানে ছিল না। ঘা সারিয়া উঠিবার পর তাহার যা কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হইল, তাহাকে ভালুকের চেহারার চেয়েও অনেক বেশী ভয়াবহ বলা যাইতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় এ অঞ্চলের ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য তখন হইতে আর কাল্পনিক জুজুর আবাহনের প্রয়োজন হইত না। একবার পরাণ মোড়ল বলিলেই হইল! ছেলের মনে পিসির কথায় হয়ত আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া মহামায়া তাড়াতাড়ি কথাটার স্বর ফিরাইয়া বলিলেন, "ভাত ক'টা চট্ ক'রে আদায় ক'রে নে শিবু, আমি আজ তোর পাশে শুয়ে অমূল্যরতন শাড়ীর সমস্ত গল্পটা বলব।"

খোকা বলিল, "তুমি রোজ রোজ ভুল ক'রে অন্য অন্য রকম বল। ও আসি শুনতে চাই না।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "তুই ভুল দেখলেই শুধরে দিবি, তাহলেই ত হবে?"

ভিতর-বাড়ীর পাঁচিলের পিছন হইতে অগণ্য জোনাকির আলোকে উজ্জ্বল ময়ূরের পেখমের মত একটি সুডৌল বন্য কুলগাছের মাথা সুধাদের ভাত খাইবার আসরের দিকে তাহার সহস্র চক্ষু মেলিয়া যেন তাকাইয়া ছিল। সুধা মুখে ভাত তুলিতে তুলিতে বলিল, "মা, জোছ্‌না রাতে এত জোনাক কোথায় চ'লে যায়?"

হৈমবতী রাগিয়া বলিলেন, 'মামার বাড়ী যায়! তোকে কবিয়ানা করতে হবে না, ভাত খা দিখি, হাবা মেয়ে।"

সুধা মুখ নামাইয়া ভাতে মন দিল। হৈমবতীর ছেলে মৃগাঙ্ক হাই স্কুলে পড়ে। সে নীরবে এক মনে স্তূপীকৃত অন্নরাশি শেষ করিবার চেষ্টায়

লাগিয়াছিল, হৈমবতী তাহার পাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মুখে কি রা বেরোয় না?" শুক্‌নো ভাতের কাঁড়ি গিলছিস্—ডালটা কি ঝোলটা চাইতে পারিস না?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "একটু পোস্তর অম্বল দাও।"

"রাতে কে তোর জন্যে পোস্ত-আমড়া রাঁধতে বসেছিল?" বলিয়া হৈমবতী পাতের উপর দুই হাতা কড়ায়ের ডাল ঢালিয়া দিলেন। দিবার সময় এমন ভাবে হাত ও মুখ ঘুরাইলেন যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলেটাকে খাইতে দিতে হইতেছে। ডাল দিবার পর পরম অবজ্ঞাভরে হাতাটা বাটির ভিতর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধপাস্ করিয়া খানিকটা কুমড়ার ঘণ্ট তাহার পাতে ফেলিয়া তিনি একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

মহামায়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি, শীত ত পড়ব পড়ব করছে। আজ রাতেই কাঁথাখানা পেতে দিও, নইলে সেলাই করতে বড্ড দেরী হবে।"

ঠাকুরঝি ঘর হইতে বলিলেন, "না দিয়ে আর পার কই? তোমাদের হাড়ে ত আর ওসব হয় না। খালি লিখিপড়ি আর লিখিপড়ি।"

মহামায়া বলিলেন, "বিদ্যে বুদ্ধি ত তোমার মত নেই-ই ভাই, তার উপর কালই আবার রতনজোড়ে যেতে হবে, আর তোমাকে দিয়ে খাটিয়ে নেবার সময় কই?"

হৈমবতী কথায় জবাব দিবার আগেই সুধা চোখ বাহির করিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও মা গো, কালই মামার বাড়ী যাব আমরা? তবে ছোট পুঁটিকে যে বলেছিলাম তার সঙ্গে পুতুলের বিয়ে দেব, সে আর হবে না?"

হৈমবতী ভারী গলায় বলিলেন, "আশ্বিন মাসে বিয়ের লগ্ন নেই। তুমি ফিরে এসে অঘ্রাণ মাসে মেয়ের বিয়ে দিও।"

মামাবাড়ী যাইবার আসন্ন সম্ভাবনায় সুধার মন এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যে সে-রাত্রে তাহার চোখে ঘুমই আর আসিতে চায় না। মামাবাড়ীতে ঠিক তাহার বয়সী খেলিবার সঙ্গী সব সময় থাকে না। কিন্তু মামাবাড়ীর আদরযত্ন, সেখানকার নূতনত্ব, ইত্যাদির কথা ভাবিলে খেলার সাথীর অভাব একেবারেই মনে থাকে না। তাছাড়া বাড়ীতেও তাহার খেলার সাথী কালেভদ্রে জোটে। শিবুই প্রধান ও প্রায় একমাত্র সম্বল।

কাল সকালবেলাই তাহাদের যাত্রা করিতে হইবে। না হইলে দশ-বারো ক্রোশ শালবন, পলাশবন ও ধানের ক্ষেত পার হইয়া, পৌঁছাইতে তাহাদের সন্ধ্যা হইয়া যাইতে পারে। বছরে একবার এই মামাবাড়ী যাওয়ার সময়ই তাহাদের গরুর গাড়ী চড়া। বাকি সময় পাড়াগেঁয়ে দেশে এক জোড়া পা ছাড়া আর কোনও বাহন তাহাদের অদৃষ্টে জুটে না। গরুর গাড়ীর ছইয়ের তলায় পুরু করিয়া খড় ও তাহার উপর নীল ডোরাকাটা সতরঞ্চি পাতিয়া শুইয়া বসিয়া যাইতে ভারি মজা। কিন্তু অসুবিধাও কতকগুলা আছে। গাড়োয়ানটা কিছুতেই গাড়ীর পিছন দিকে বসিতে দিতে চাহে না। অথচ সেই দিক্ দিয়াই পার্বত্য বনের পথ, বালুকাময় ক্ষুদ্র স্বচ্ছতোয়া নদী, নীল বাঁধের জলে শুভ্র কুমুদ ফুল, সাঁওতাল পথিক, কালো কালো পাথরের অতিকায় হস্তীর মত বিরাট ঢিপি, সবুজ ধানের ক্ষেত, ইত্যাদি সবই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু লোকটা কেবলই বলে, "ওদিকে গাড়ী ভারী হয়ে যাবে গো, সামনে এসে বস।" সামনে সব কয়টা মানুষ কি একসঙ্গে বসিতে পারে কখনও? পারিলেও গাড়োয়ানের পিঠের আড়ালে বসিয়া কোনও সুখ নাই। পাশে যা একটু ফাঁক পাওয়া যায়, শিবু একলাই তাহা দখল করিয়া রাখে।

তাছাড়া গরুর গাড়ী চড়ারও বিপদ আছে। সুধার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, গত বৎসর মামাবাড়ী যাইবার সময় গরুগুলার ভয়ে সে পিছন দিক্ দিয়া গাড়ীতে চড়িতে গিয়াছিল। দুই হাতে গোল ছইটা ধরিয়া যেই না গাড়ীতে পা দেওয়া অমনি সামনের ডাণ্ডাদুটা আকাশমুখী হইয়া সমস্ত গাড়ীটা সুধাকে লইয়া পিছন দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। কাজেই তাহার পর গরুর লাথির ভয় থাকা সত্ত্বেও সামনের দিক্ দিয়াই তাহাকে গাড়ী চড়িতে হইল।

সে যাহাই হউক না কেন, মামার বাড়ী একবার গিয়া পড়িলে ও-সব ছোটখাট দুঃখের কথা আর কিছুই মনে থাকিবে না। দাদামহাশয় ত তাঁহাদের দেখিয়াই কোলে করিয়া নামাইতে ছুটিয়া আসিবেন। যেন এখনও সুধার কোলে চড়িবার বয়স আছে। এই আসছে-পৌষে তাহার ত নয় বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে। এ দিকে দাদামশায় ত বয়সে বাঁকিয়া পড়িয়াছেন। তবু তাঁহার সুধাকে দেখিলে কোলে লওয়াই চাই। হলুদে

রং-করা একটি টাকা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি আসিয়া বলিতেন, "কই রে, আমার রাঙা দিদি এলি? মোহর দিয়ে ত আর তোর মুখ দেখতে পারব না, তাই গরীব দাদা টাকাটি রাঙা ক'রে এনেছে।"

দাদামশায় যতই নিজেকে গরীব বলুন না কেন, এমন দিলদরিয়া মানুষ কিন্তু সুধা কখনও দেখে নাই। তাহারা গাড়ী হইতে নামিতে-না-নামিতে দাদামশায় তাঁহার খড়ম জোড়া পায়ে দিয়া শুধু গায়ে গলায় একটা চাদর ঝুলাইয়া ময়রাবাড়ী ছোটেন। ফিরেন যখন, তখন দুটি হাঁড়ি সঙ্গে। একটি ভর্তি গুড়ের রসের রাঙা রসগোল্লায়, অন্যটি মোটা মোটা জিলাপীতে। সুধার মনে আছে, এই দুইটি হাঁড়ির খাবার তাহারা কখনও চাহিয়া খাইত না। যতবার ইচ্ছা হইত, সুধা ও শিবু হাঁড়ির ভিতর হাত ভরিয়া যত ইচ্ছা বাহির করিয়া লইত। দিদিমা একটু হাতটান মানুষ। তিনি হাঁড়ি সিকায় তুলিতে আসিলেই দাদামশায় বলিতেন, "দু-দিনের জন্যে ছেলেরা এসেছে, তুমি ওদের পেছন পেছন টিক্‌টিক্ করবে না। ওরা যত খুশী থাক্।"

মহামায়া হাসিয়া বলিতেন, "কিন্তু পেট কামড়ে যে মরবে ভূতগুলো।"

দাদামশায় বলিতেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা আর ছোট ছিলি না, ছেলে কেমন ক'রে মানুষ করতে হয় তোদের কাছে এখন আমি শিখব। কামড়ালেই বা একদিন পেট, পরদিন উপোস দিলেই সেরে যাবে।"

দাদামশায়ের উৎপাতে এই কয়দিন বাড়ীতে শাক-ভাত রাঁধিবার উপায় ছিল না। দু-বেলাই দিদিমার রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি বলিতেন, "মুটের ডাল, আলুর দম, বেগুন ভাজা, লুচি করবে, আমার দাদা দিদিকে ডিংলা* আর কড়াইয়ের ডাল খেতে খবরদার দেবে না।" বুনো পাতালফোঁড় ছাতুর তরকারি দিদিমা রাঁধিয়া দিলে সুধার অমৃতের মত খাইতে লাগিত, নটেশাকের ডাঁটা আর কুমড়ার ঝালও ছিল তাহার খুব মুখরোচক। কিন্তু দাদামশায়ের ভয়ে রসগোল্লা, জিলাপী আর ছোলার ডাল ছাড়া তাহাদের বিশেষ কিছু খাইবার উপায় ছিল না। তাঁহার মতে এছাড়া আর সবই তাঁহার নাতিনাতনীর পক্ষে অখাদ্য।

মামীদের সাহায্যেও কোনও-কিছু যোগাড় করা শক্ত ব্যাপার। তাঁহারা তিন জনই তখন বৌমানুষ, দু-জনের ত পায়ে মল, নাকে নোলক আর

* ডিংলা = 'বিলাতী' কুমড়া।

মাথায় ঘোমটা। তাহার ভিতর ছোটমামী ত একেবারে কনে-বউ। কথা বলিলে ফিক্ করিয়া একটু হাসা ছাড়া আর কোনও জবাব দিবার সাহসও তখন তাঁহার হয় নাই। যাহাকে দেখিতেন, তাহারই সামনে একগলা ঘোমটা টানিয়া দিতেন। সবচেয়ে বেশী ঘোমটা টানিতেন ছোটমামাকে দেখিলে। কিন্তু তাহার ভিতরও একটা মজা ছিল বেশ। সুধা কতদিন দেখিয়াছে, তরকারি কুটিবার সময় হাত কাটিয়া ফেলিবার ভয়ে ছোটমামী মাথার ঘোমটাটা খাটো করিয়া লইতেন। কিন্তু যদি কোনও কারণে একবার ছোটমামার চটির শব্দ পাইলেন, ত দু-খানা হাত কাটা গেলেও বুক পর্যন্ত ঘোমটা না টানিয়া ছাড়িতেন না। সেই ছোটমামীকেই আবার রাত্রে অদ্ভুত বদ্‌লাইয়া যাইতে দেখিয়া সুধার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। মামাবাড়ীর দুতলায় ছাদের উপর একখানি মাত্র ঘর। সেটি ছোটমামীর ঘর। সুধা দুই-এক দিন রাত্রে তাঁহার সহিত উপরে গিয়া দেখিয়াছে, ঘরে ছোটমামী মামার কাছে ঘোমটা ত দূরের কথা মাথায় কাপড়ও দেন না। আবার হাসিয়া হাসিয়া কত গল্প করেন। সত্যই ছোটমামী অদ্ভুত। দিনের বেলা দেখিলে মনে হয় বোবা, আর রাত্রে এমন! সুধা এমন মেয়ে কখনও দেখে নাই। কিন্তু তবু ছোটমামীকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইত না।

মামাবাড়ীর যে কথাটাই মনে পড়ে, সেইটাই মনের ভিতর দামী পাথরের মত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া নানা আলোকপাতে দেখিতে সুধার বড় ভাল লাগিত। সারারাত্রি তাহার এমনই করিয়া পুরাতন স্মৃতির চিন্তায় কাটিয়া যাইতে পারিত, যদি না সারাদিনের দুরন্তপনার ফলে চোখ দুটি ক্লান্ত হইয়া কখন তাহার অজ্ঞাতসারেই বন্ধ হইয়া যাইত।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুধা স্বপ্ন দেখিতেছিল, দাদামশায় সুধার জন্য চন্দ্রকোণার চৌখুপী শাড়ী আনিয়া দিয়াছেন, তাহার হল্‌দে রেশমের তাবিজপাড়টি সুধার বড় পছন্দ হইয়াছে। এমন সময় মা তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন, "ওরে, কাক কোকিল উঠে গেল রে! এখুনি লখা-মাঝি* গরুর গাড়ী এনে হাজির করবে।"

*সাঁওতাল পুরুষদিগকে মাঝি বলে। এ নৌকার মাঝি নয়।

২

সুধার বাবা চন্দ্রকান্ত মিশ্র চার মাইল দূরে শহরের স্কুলে সামান্য বেতনে হেডমাস্টারি করিতেন। সেই স্বল্প আয়ে তাঁহার সংসার ত চলিতই না, অধিকন্তু স্কুলের এই প্রাত্যহিক পাখীপড়ার মধ্যে তাঁহার বহুমুখী মনের খোরাকও জুটিত না। তিনি মানুষটি ছিলেন একটু কবি-প্রকৃতির। সেকালের ব্রাহ্মণ-সন্তানদের মত চুল ছাঁটিয়া টিকি কোনও দিন তিনি রাখেন নাই, সর্বদাই ঘাড় পর্যন্ত তাঁহার কোঁকড়া বাবরী চুল দুলিত। দাড়ি-গোঁফের চিহ্ন মুখে থাকিতে দিতেন না। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেই নিজের চুল-দাড়ির পারিপাট্য সাধন করা তখনকার দিনে অতি শৌখীন লোকেও করিত না। কিন্তু চন্দ্রকান্ত ধোপানাপিতের ধার ধারিতেন না। নিজের কাপড় কাচিয়া ইস্ত্রী-করা এবং নিজের চুল মাপিয়া ছাঁটা তাঁহার শখের কাজ ছিল। সকল কাজের মাঝেই তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে স্বরচিত ও রামপ্রসাদী মিঠা গান লাগিয়া থাকিত। গানেই ছিল তাঁহার প্রাণের মুক্তি।

নিজের একটি তানপুরা লইয়া অতি প্রত্যুষে একলা বসিয়া হিন্দী ভজন গান করা ছিল তাঁহার নিত্যকর্ম। শহরের ছোট বাসা-বাড়ীতে তাঁহার ভজন-সাধন, তাঁহার কাব্যচর্চা ঠিক খুলিত না। তাই তিনি গ্রামে এই দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাঝখানে একটি নিজস্ব নীড় বাঁধিয়া তুলিয়াছিলেন। শহরের বাসা তুলিয়া দিয়া এখানেই যখন তিনি থাকা স্থির করিলেন তখন প্রত্যহ সকালে চার মাইল হাঁটিয়াই তিনি স্কুলে যাইতেন। বিকালেও তিনি অনায়াসে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার প্রসন্ন হাস্য ও শ্রান্তিহীন মুখ দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কেবল দুই-দশ পা শখের ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। এই গ্রাম্য জীবনযাত্রার সহিত এক ছন্দে চলিবার ইচ্ছায় ইস্কুল-মাস্টারির উপর ধানজমি চাষ করাও তিনি একটা আর্থিক আয়ের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান, উছলিয়া না পড়িলেও, কোনওটারই একান্ত অভাব ছিল না।

সুধা যখন বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া বাসি খোঁপায় রূপার ফুল গুঁজিয়া মাথার সামনেটা আঁচড়াইয়া বাবার কাছে বিদায় লইতে গেল, চন্দ্রকান্ত তখন বাহিরের দাওয়ায় বড় পিঁড়ির উপর বসিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত সুর করিয়া পড়িতেছেন,

"দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর।
ভুজযুগ নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত
করিকর যুগবর জানু সুলম্বিত।"

এই বর্ণনাটা শুনিলেই সুধার মনে হইত যেন তাহার বাবাকে দেখিয়াই কাশীরাম দাস ইহা লিখিয়াছিলেন। তাহার বাবার মত এমন ধনুকের মত ভুরু আর বিস্তৃত কপাল সে কখনও দেখে নাই। তাহার উপর কবি হইলেও চন্দ্রকান্ত বীরের মত বলিষ্ঠ ও সুগঠিতদেহ ছিলেন। ভোরবেলার ভজন গানের পর একজোড়া মুগুর লইয়া মালকোছা মারিয়া ব্যায়াম করিয়া তবে তিনি স্নান করিতে যাইতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক খরচ করিয়া তিনি একটি কূপ কাটাইয়াছিলেন, যাহাতে পুকুরের পঙ্কিল জলে স্নান করিয়া বাড়ীর লোকের খোস-পাঁচড়া না হয়। সেই কূপ হইতে নিজ হস্তে বালতি করিয়া জল টানিয়া প্রত্যহ প্রায় পঁচিশত্রিশ বালতি করিয়া মাথায় ঢালিয়া তিনি যখন স্নান করিতেন তখন তাঁহার সুবিস্তৃত কপাটবক্ষ; সিংহকটি ও পেশীবহুল বাহুদুটি দেখিয়া তাঁহাকে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন মনে করায় সুধার অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরব ছিল।

লখা-মাঝির গরুর গাড়ী আসিয়া হাজির হইয়াছিল। মহামায়ার সবুজ টিনের তোরঙ্গ ও বড় বেতের ঝাঁপি দুইটাই চন্দ্রকান্ত গাড়ীর ভিতর তুলিয়া দিলেন। সুধার ছোট নীলাম্বরী শাড়ীতে হৈমবতী টানা লাড়ু ও বড় বড় চিনির কদমা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন দিদিমাকে দিবার জন্য। মিষ্টি না সঙ্গে দিয়া বধূকে বাপের বাড়ী ত পাঠানো যায় না। শিবু মিষ্টির পুঁটুলিটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহামায়া আঁচলে সিঁদুরকৌটা বাঁধিয়া হৈমবতীকে প্রণাম করিয়া চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিয়া শুধু একটু হাসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। শিবু ও সুধা বাবাকে, পিসিমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকেও প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিল। চন্দ্রকান্ত তাহাদের কোলে

তুলিয়া গাড়ীর ভিতর বসাইয়া দিলেন। এই সামান্য কয়টা দিনের বিচ্ছেদ, তবু হৈমবতীর চোখে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

লখা-মাঝি গরু দুইটার ল্যাজ মলিয়া লাঠির গুঁতা দিয়া 'হেট্ হেট্' করিতেই গরু দুইটা ঢালু পথ দিয়া হড় হড় করিয়া গাড়ী লইয়া ছুটিল। চন্দ্রকান্ত তখন ঘরের ভিতর চলিয়া গিয়াছেন। হৈমবতী দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদের শেষ পর্যন্ত দেখিতেছিলেন।

দুই পাশে ঘন সবুজ শালবনের মাঝখান দিয়া এই রাঙা সিঁথির মত দীর্ঘ পথটি কি সুন্দর! বাড়ী ও পিসিমার মুখ-চোখের আড়াল হইতেই সুধা ও শিবুর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পথটি সমুদ্রের বুকের ঢেউয়ের মত ক্রমাগত উঠিয়া নামিয়া চলিয়াছে। গরুর গাড়ীর চাকাও তাহারই তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে।

লখা-মাঝির পাশেই শিবু তাহার দোলাইটি পিঠে বাঁধিয়া বসিয়াছিল। এবার পূজা দেরীতে পড়িয়াছে, ইহার মধ্যেই ভোরের বেলা শীতের হাওয়া দেখা দেয়। শিবুর পিছন হইতে সুধা কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। তাহার মা মহামায়া মেয়ের অন্ধকার মুখ দেখিয়া বলিলেন, "সুধা, তুই আমার কাছে এসে বোস্ না, মা। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, আয় আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু ঘুমোবি।"

সুধা বলিল, "না মা, আমি ঘুমোব না। আমি সারা পথ দেখতে দেখতে যাব।" সে মা'র গায়ে পিঠ দিয়া শিবুর দিকে পিছন ফিরিয়া গাড়ীর পিছন দিক দিয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল। ভোরবেলা জমিদার-বাড়ীর বৃদ্ধা হস্তিনী পিঠের দুই দিকে মোটা কাছিতে দুইটা ঘণ্টা দুলাইয়া শালবনে ডাল ভাঙিতে যাইতেছিল; কিছু সেখানেই প্রাতরাশ করিবে এবং কিছু পিঠে করিয়া লইয়া আসিবে পরের আহারের জন্য। বহুদূর হইতে তাহার জোড়া ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজ শুনিয়া শিবু ও সুধার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার রাঙা মাটি ও চন্দন-চর্চ্চিত কপালটুকু দেখিয়াই সুধা হাততালি দিয়া উঠিল, "লক্ষ্মীপিয়ারী, লক্ষ্মীপিয়ারী।"

গ্রামের দুই-চারিটি ছেলে অনেক কষ্টে ছুটিয়া হাতীর গজেন্দ্রগমনের সহিত তাল রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল; শিবু তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহাদের সহিত সমস্বরে ছড়া কাটিয়া উঠিল,

"হাতীমামা দোল্ দোল্
পান খিলিটি—খোল্ খোল্।

মহামায়া বলিলেন, "মামা কি রে? মাসী হয় যে!"

সুধা তাড়াতাড়ি মাহুতকে বলিল, "জগাদাদা, লক্ষ্মীপিয়ারীকে নমস্কার করতে বল না!"

জগা হাসিয়া বলিল, "কিছু বকশিশ কর, তবে ত নমস্কার করবে? শুধু শুধু নমস্কার কেউ করে?"

সুধা মুখটি ম্লান করিয়া বলিল, "আমার ত পয়সা নেই।"

মহামায়া আঁচল হইতে তুইটি পয়সা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। লক্ষ্মীপিয়ারী শুঁড় দিয়া পয়সা তুটি তুলিয়া লইয়া পিছনে শুঁড়টি বাঁকাইয়া জগাকে পয়সা দিল। তাহার পর তুইবার ঊর্ধ্বে শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজোচিত ভঙ্গীতে নমস্কার করিয়া সমস্ত দেহ সজোরে দোলাইয়া ঢং ঢং করিতে করিতে শালবনের পথে চলিয়া গেল।

সেদিন হাটবার। পথে তখনই লোক-চলাচল বাড়িয়া উঠিতেছে। সাঁওতালদের মেয়েরা মাথায় তিন-চারিটা ঝুড়ি উপরি উপরি চাপাইয়া, লালপেড়ে মোটা শাড়ীর চওড়া লাল আঁচল কোমরের পিছনে গুঁজিয়া, ঋজুদেহ গতিচ্ছন্দের সহিত অল্প দোলাইয়া, সারি সারি পথে বাহির হইয়াছিল। তাহাদের নিটোল কালো হাতে চওড়া শুভ্র শাঁখা, ঘন তৈল-চিক্কণ চুলে জবা কি করবী ফুল। মেয়েদের ঝুড়িতে বেশীর ভাগই চাল কি চিঁড়া, নয়ত লাউ-কুমড়া। হাটের পথিকদের ভিতর মেয়ের ভিড়ই বেশী। পুরুষ অল্পস্বল্প যা আছে, তাহারা কেহ স্ত্রীর মাথায় গুরুভার বোঝাটি চাপাইয়া কোলের শিশুটিকে নিজে বুকে করিয়া চলিয়াছে, কেহ বা বাঁকের ভারে ঘাড় হেলাইয়া ক্ষেতের বেগুন ঢেঁড়স লঙ্কা ইত্যাদি লইয়া দ্রুত তালে ছুটিয়াছে। তাহাদের কোমর জড়াইয়া পাঁচ-ছয় হাত একটা খাটো ধুতি ছাড়া সর্বাঙ্গে কোনও পোশাকের বালাই নাই, ঘর্মাক্ত পেশীবহুল হাত-পাগুলি দ্রুত চলার তালে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তুই-এক জনের মাথার বাবরী চুলের উপর নূতন লাল গামছা বাঁধা।

মাইল দশেক আসিয়া পথটি হঠাৎ অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। সেখানে পথের তুই ধারে মস্ত মস্ত তেঁতুল গাছ। সমস্ত পথ ঝাঁপালো পাতার ছত্রে

ছায়া করিয়া আছে। গাছতলায় মাঝে মাঝে গর্ত কাটিয়া তিনখানা করিয়া পাথর কি ইট বসানো: ইটের গায়ের ও গর্তের ভিতরের ঘন কালো রং ও পোড়া কাঠের টুকরা সত্ত রন্ধনের সাক্ষ্য দিতেছে। দুই পাশের বড় গ্রামগুলি হইতেই এই জায়গাটা একটু বেশী দূরে এবং এখানে নদীর জল ইচ্ছামত পাওয়া যায় বলিয়া হাটুরে ও দূর-গ্রামের পথিকেরা এইখানেই রান্না-খাওয়া সারিয়া যায়।

লখা-মাঝি বলিল, "মা, এইখানে চানটা ক'রে আমি দুটো ডাল ভাত ফুটিয়ে নেব। ঘণ্টাখানিক লাগবে। তার পর ছ' ক্রোশ আর দাঁড়াব না।"

সুধা ও শিবু বলিল, "মা. আমরাও গাড়ী থেকে নামব।"

মহামায়া বলিলেন, "বেশী দূরে যাস্ নে, একটু ঘুরে এসেই খেতে বসবি, ঠাকুরঝি তোদের জন্যে লুচিমণ্ডা ক'রে দিয়েছেন।"

সুধা বলিল, "আমি বেশী দূরে যাব না মা; শুধু লখাদা যদি আমাদের একটু কাঁচা তেঁতুল আর কচি তেঁতুল-পাতা পেড়ে দেয়, তাহলেই হবে। কি চমৎকার খেতে মা!"

শিবু বলিল, "বাঃ, দিদির কি বুদ্ধি! নুড়ি নিতে হবে না বুঝি! বোকা না হ'লে আর আসল কথাটা ভুলে যাবে কেন? যতগুলো হাঁসের ডিমের মত আর সাবানের মত নুড়ি আছে, আমি সব ক'টাই নেব।"

লখা গরু দুইটাকে খুলিয়া গাড়ীটা তেঁতুলতলার সামনে হেলাইয়া দাঁড় করাইল। ঝুড়ি ও বাঁক নামাইয়া আরও দুই-চার জন মানুষ তখনই সেখানে উবু হইয়া বসিয়া বিশ্রাম শুরু করিয়াছিল, কেহ বা উঁচু হাঁটু দুইটা দুই হাতে জড়াইয়া উপর দিকে মুখ করিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িয়াছিল। এক দল বৈরাগী, ছোটবড় নানা বয়সের, তাহাদের নাকে কপালে তিলক, গলায় ত্রিকণ্ঠি, হাতে আনন্দলহরী ও পিঠে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া চলিয়াছিল। রাস্তাটা যেখানে একেবারে নামিয়া প্রায় নদীগর্ভে পৌছিয়াছে, সেইখানে গেরুয়া ঝুলি-ঝোলা নামাইয়া সকলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ছোট ছেলেগুলির উৎসাহ বেশী, তাহারা একেবারে নদীর মাঝখানে চলিয়া গেল। বড়রা পাড়ের কাছেই অল্প জলে দাঁড়াইয়া কেহ পৈতা মাজিতে ও কেহ টপ্ টপ্ করিয়া ডুব দিতে লাগিল। ক্রমে সাঁওতাল-সুন্দরীরাও তাহাদের চালের ঝুড়ি ও ফল-তরকারির ঝুড়ি তীরে রাখিয়া জলে নামিতে শুরু করিল। সকলেরই ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি

স্নানটা সারিয়া শরীরটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দ্রুত পা চালাইয়া আগে ভাগে হাটে গিয়া পৌছায়। গরম কাল না হইলেও এত পথ হাঁটিয়া তাহাদের শরীর গরম হইয়া উঠিয়াছে।

নদীর ধার হইতে বনের ভিতর দিকে কয়েক হাত দূরে দূরে চোরকাঁটায় আচ্ছন্ন সরু সরু সাপের মত বাঁকা বাঁকা পায়ে-চলা পথ। পথগুলি বনের ভিতর দিয়া লুকাইয়া ছোটবড় নানা গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। বনের ধারে এদিকে-ওদিকে রজত-বেদীর মত শুভ্র উজ্জ্বল মসৃণ বড় বড় পাথর নদীর বালির উপর পড়িয়া আছে ; নদীগর্ভের ভিতরেও ছোটবড় এমন কত পাথরের মেলা। নদীতে যখন জল বেশী থাকে, তখন বর্ষার দিনে জলের উপর ইহাদের মাথার উজ্জ্বল চূড়াগুলি মাত্র দেখা যায়, জল মরিয়া গেলে মনে হয় যেন সারি সারি বিরাট শ্বেতহস্তী নদী পার হইবার সময় কোনও মহাতপা ঋষির নিদারুণ অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

সেদিন নদীতে বেশী জল ছিল না, হাটের পথের মহিষ ও গরুর গাড়ীগুলিও অনায়াসে নদী পার হইয়া যাইতেছিল। জলের ভিতর পাছে গরু-মহিষগুলা ভয় পায় কিংবা ভুল করিয়া অথৈ জলে চলিয়া যায়, তাই কিশোর চালকেরা সরু সরু গাছের ডাল হাতে করিয়া জলের ভিতর নামিয়া পড়িয়া অল্পবুদ্ধি বিরাটকায় পশুগুলিকে সামলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। জলের ভিতর নৈরাগী বালকদের লাফালাফি দেখিয়া তাহাদের কিশোর মনও লুব্ধ হইয়া এবং উজ্জ্বল চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এক এক গাড়ী জিনিসের ভার তাহাদের উপর, ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই।

গ্রামের মেয়েদের জল আনা তখনও শেষ হয় নাই। ঘন গাছের ভিতর হইতে সরু সরু পথে স্বচ্ছন্দগতি সাঁওতাল-কন্যারা মাথায় কলসী ও কোলে উলঙ্গ সুপুষ্ট কালো ছেলে লইয়া নদীর ঘাটে আসিতেছে। মাঝে মাঝে একটু মাজা রঙের শীর্ণকায়া বাঙালীর মেয়েও দেখা দিতেছিল। একই গ্রামে বাস, একই পথে হাঁটা চলা, কিন্তু সাঁওতাল-মেয়েদের খোলা মাথা, নিটোল আঁট গড়ন, দৃপ্ত চলার ভঙ্গী, আর বাঙালীর মেয়ের মাথার ঘোমটা, ঢিলা শরীর, ঝুঁকিয়া সলজ্জ-ভঙ্গীতে চলা দেখিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লাগে।

শিবু এত লোকের দেখাদেখি লখা-মাঝির সঙ্গে জলে নামিয়া পড়িল। স্বচ্ছ জলের তলায় নানা রঙের নুড়ি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; খুশী হইয়া সে দুই হাতে

তুলিতে লাগিল। সুধা একটি রজতশুভ্র পাথরের বেদীর উপর বসিয়া সাঁওতাল-মেয়েদের জলক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কলসীর পিছন দিক্ দিয়া অপরিষ্কার জল দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাহারা নদীর রূপালি জলে কষ্টিপাথরের মত কালো নিটোল সুচিক্কণ দেহ ভাসাইয়া তরল শুভ্র জল ও কঠিন কালো মূর্তির বিপরীত শোভায় বনভূমি স্বল্পক্ষণের জন্য আলো করিয়া এক এক কলসী জল লইয়া ঘরে ফিরিয়া চলিল।

সুধাকে দেখিয়া সাঁওতাল-মেয়েদের কৌতূহল অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল, বার বার পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঙালী বধূরাও ঘোমটা সরাইয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে একটু মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। প্রৌঢ়া দুই-এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "কুথা যাচ্ছ গো?"

সুধা বলিল, "মামাবাড়ী।"

"কুন গাঁ, কত দূর?"

সুধা বলিল, "রতনজোড়; সে অনেক দূর।"

হাটুরে মেয়েরা স্নান সারিয়া উঠিতেই সুধার মা মহামায়াকে দেখিয়া তরিতরকারির ঝুড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, "বেগুন লিবিগো, সিম লিবি গো?"

পথের মাঝে মাঝে ক্রেতা দেখিলেই তাহারা ছোটখাটো হাট বসাইয়া দিতেছে। সময়ের কোনও মূল্য নাই, যতক্ষণ খুশী, যতবার খুশী জিনিস বাছাই কর, ওজন কর, কেহ কিছু আপত্তি করিতেছে না।

মহামায়া বলিলেন, "আমার ত এখানে ঘর নয় বাছা, তরকারি নিয়ে কি করব? ফল টল থাকে ত বরং দাও।"

একজন বলিল, "কলা আছে, লিবি?"

আর একজন বলিল, "আতা আছে।"

বৈরাগীর দলও হাটের সওদা দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা চিঁড়া কিনিতেই বেশী ব্যস্ত, দুই-এক জন মোটা মোটা শশাও কিনিল। মহামায়া ছেলেমেয়েদের জন্য কলা ও আতা কিনিলেন। একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া দুইটা পয়সা চাহিতেই সকলে প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "উ নাই লিব।"

শিবু ততক্ষণ উঠিয়া আসিয়াছে; সে সিকিটার উপর সাঁওতালদের সন্দিগ্ধদৃষ্টি দেখিয়া বলিল, "মা, সাঁওতালগুলো বড় বোকা, ওরা পয়সা ছাড়া

আর সব কিছুকেই ভয় পায়। রূপোর সিকিরই ত বেশী দাম, তা নেবে না।"

অনেক কষ্টে তাহাদের দাম চুকাইয়া বিদায় করা গেল। কিন্তু লখা-মাঝি কুড়ানো পাথরের উনুন জালিয়া রান্না শুরু করিতেই আবার ভিড় শুরু হইল। তখন চন্‌চনে রোদ উঠিয়াছে, লোকগুলার মাথায় ছাতা কি একটুকরা গামছাও হয়ত নাই, মাথার চুলই রোদ হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। এততেও অনেকের বিড়ি খাওয়ার শখ পুরা আছে। সবাই বলে, "মাঝি, একটু আগুন।"

বেচারী লখা কতবার যে উনানের কাঠ বাড়াইয়া ধরিল তাহার ঠিক নাই। শেষকালে একটা খড়ের নুড়িতে আগুন ধরাইয়া পথের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া দিল, যাহার ইচ্ছা আপনি ধরাইবে।

মহামায়া বলিলেন, "বাছা, তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়া সেরে নে, রোদ উঠেছে চড়চড়ে, তার উপর এই হাটের ভিড়, এখানে আর ব'সে থাকা যায় না।"

আবার যাত্রা শুরু হইল। নদী পার হইয়া মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙ্গা জমির উপর ঝোপের মধ্যে কালো কালো হাতীর মত পাথর, মাঝে মাঝে ঘন সবুজ ধানের ক্ষেত। কোনও ক্ষেতে একটুখানি সোনার রং ধরিয়াছে, কোনওটা একেবারে কাঁচা। দূরে দূরে বাঁধের জলে অসংখ্য শালুক ফুল ফুটিয়া লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম্য পথের এমন উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া সুধার মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল। দুই চোখে দেখিয়াও আশা মিটে না। পৃথিবীটা কি আশ্চর্য সুন্দর! শিবু কিন্তু একটু পরেই কাৎ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পথের ধারের একটা গ্রামের ছেলেরা বড় বড় লাঠি লইয়া রণপা করিয়া এক এক পায়ে চার-পাঁচ হাত লাফাইয়া চলিতেছিল। তাহার সঙ্গে কি সানন্দ কলরব! সুধা বলিল, "শিবু, দেখ্‌ দেখ্‌ ছেলেগুলো কি মজা করছে।"

শিবু একবার "উ" বলিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এদিককার হাটের পথ নির্জন হইয়া আসিতেছে। অন্য হাটবারে সুধারা পথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখে, দিনশেষে ভাঙা হাটের পর পথিকেরা মহা কোলাহল করিয়া ফিরিতেছে। তাড়ির মিষ্ট তীব্র গন্ধে সমস্ত পথটা ভরিয়া যায়। মেয়েরা হাত ভরিয়া শাঁখা পরিয়া ও পুরুষেরা নূতন জামা পরিয়া পয়সা গনিতে গনিতে চলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পথে যেখানেই ডোবা দেখে

নামিয়া পড়িয়া নির্বিচারে দল বাঁধিয়া আঁজলা ভরিয়া জল খায়। গরুর গাড়িগুলি যথাসাধ্য জোরে হাঁকাইয়া বাড়ি ফিরিতে সবাই ব্যস্ত। আজ এদিকে হাট নাই, পথ জনশূন্য। শরতের নীল আকাশে টুকরা মেঘের মত এক-একটা বক মাঝে মাঝে উড়িয়া চলিয়াছে। উলঙ্গপ্রায় রাখাল-ছেলেরা দড়িতে ঢিল ঝুলাইয়া সজোরে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতেছে, যদি একটা বক মারা যায়। কোথাও বড় বড় মহুয়া, কি বট, কি আম গাছে, শ্বেতপদ্মের মত ধপ্‌ধপে এক ঝাঁক শাদা বক ডালে ডালে বসিয়া আছে। দূর হইতে মুদিত শুভ্র পদ্ম ছাড়া কিছু মনে হয় না।

শিবুর দিবানিদ্রা শেষ হইলে সে সারা পথই খাইতে খাইতে চলিল। দিদির মত ধানক্ষেত আর বক দেখার সখ তাহার নাই। পিসিমা যত খাবার দিয়াছিলেন, সব একা খাইতে পাইলেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাইয়াছে বুঝিবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আকাশে যখন মেঘের কোলে কে সাত রঙের তুলি টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহারা মামাবাড়ীর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

দূর হইতে সুধা দেখিল, সহাস্য মুখে দাদামশায় ঠিক পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার প্রশস্ত বক্ষের উপর শুধু একটি মাজা পৈতা, গায়ে জামা নাই। পায়ে কিন্তু তালতলার চটি একজোড়া আছে। গাড়িটা দেখিয়াই "মায়া, এলি মা?" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

পারেন ত সব কয়জনকেই কোলে করিয়া নামান। লখামাঝির গরু খুলিয়া দেওয়া পর্যন্তও যেন তিনি অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না।

মহামায়া কোনও রকমে নামিয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে-না-করিতেই বৃদ্ধ লক্ষ্মণচন্দ্র তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। "চল্ চল্, নমস্কার করে না এখন, হাওয়ায় একটু বসবি চল্। ছেলেগুলি এতদূর থেকে এল, দেখি জলটল কি রেখেছে সব। ও সব জামা জুতা খুলে ফেল, দাদা।"

লক্ষ্মণচন্দ্র নিজেই অপটু হস্তে শিবুর জামা জুতা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন।

মায়ামায়া হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি বুড়োমানুষ, নবাবের জুতো

জামা খুলে দেবে নাকি ? ও থাক্, ঘরে গিয়ে আমি দেব এখন। মা কেমন আছেন, দাদারা কেমন ?"

লক্ষ্মণচন্দ্র বলিলেন, "আছে সব একরকম। বেটাদের ত সাত দিনে এক দিন চোখে দেখি না। বুড়ো বাপ মরল কি বাঁচল, কে খোঁজ নেয়! ভাগ্যে তোর দিদি আছে তাই জলের ঘটিটা এগিয়ে দেয়।"

বাড়ী আসিতেই সুধারও চোখে ঘুম ভরিয়া আসিল। মামাবাড়ী দেখার এত আগ্রহও তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে পারিল না। সারা পথ একবার যে চোখ বোজে নাই।

৩

মামার বাড়ী সেকেলে ধরণের বাড়ী, রাস্তার উপরেই সারি সারি চারখানি ঘর, কিন্তু একখানি ছাড়া আর কোনওটির রাস্তার উপর দরজা নাই। বাড়ীর ভিতর দিকে চারখানি ঘরের দরজার কোলে লম্বা দালান, দালানের পর খোলা চাতাল, দালানেরই সমান উঁচু। চাতাল হইতে তুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়া রান্নাঘরের খড়ো আটচালা। রান্নাঘরে আটচালার নিকস-কালো কাঠের খুঁটিগুলির গায়ে বিচিত্র কারুকার্য, চৌকাঠের মাথায় কাঠে খোদাই এক জোড়া মকরের মুখ, দরজাগুলিতে কাঠের চৌখুপি ঘরের ভিতর বড় বড় পিতলের ফুল বসানো।

বসতবাড়ীর দালানের এক কোণে চাল রাখিবার জন্য নীচু নীচু ছোট তুটি মরাই, আর এক কোণে কালো কাঠের প্রকাণ্ড একটা গাছ সিন্দুক। সুধা এত বড় সিন্দুক তাহার নয় বৎসরের জীবনে আর কোথাও দেখে নাই। এই জন্য এই জিনিসটি তাহার বিশেষ প্রিয় ও স্মরণীয় ছিল। সিন্দুকের ভিতর থাকিত বাড়ীর পূজাপার্বণ বিবাহাদির জন্য যত নক্সাকাটা বড় বড় তোলা বাসন ; অধিকাংশই পিতলের, খানিক কাঁসাও ছিল। সিন্দুকের উপর কাঠের রেলিং-ঘেরা ছোট একটি খাটের মত জায়গা। সেই রেলিং ও সিন্দুকের গায়ে কাঠ-খোদাইয়ের কি চমৎকার লতাপাতার বাহার। সুধা সেই লতা ও ফুলের গড়ন দেখিয়া দেখিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। ছবি আঁকিবার চেষ্টা সে কখনও করে নাই, না হইলে আঁকিয়া দেখাইতে পারিত। তাহার মনের পটে সিন্দুকের ছবিটি চিরকাল আঁকা ছিল। বিধবা বড় মাসীমার তুটি বড় বড় ছেলে, বিশু আর সতু ; তাহারা এই সিন্দুকের উপরেই রাত্রে বিছানা পাতিয়া ঘুমায়। সিন্দুকের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমানো শিবুর কাছে ছিল একটা পরম লোভনীয় ও রহস্যময় ব্যাপার। আগে আগে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিত মাত্র, এবার সে বিশুদাকে আসিয়াই বলিয়াছিল, "বিশুদা, তোমার সঙ্গে আমাকে একদিন শুতে দিতে হবে।"

বিশুদা বলিল, "হ্যাঁ, রাত্রে কি কাণ্ড কর তার ঠিক নেই। শেষে পূজোপার্বণের বাসন নষ্ট হোক, আর বুড়ো বয়সে দিদিমার হাতে মার খেয়ে মরি।" শিবু অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ইহার পর আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করে নাই।

বাড়ীর যত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে অধিকাংশই ঘুমাইত সুধার দিদিমার কাছে। দালানের উল্টাকোণে একেবারে জানালার ধারে এক জোড়া খুব উঁচু পুরাতন পালঙ্ক পাতা। তাহার উচ্চতা এত বেশী যে চড়িবার একটা মই থাকিলেই ভাল হইত। মই না থাকিলেও খাটের তলায় একখানা ছোট চৌকি পাতা ছিল, তাহার উপর দাঁড়াইয়া ন্যাকড়ায় পা মুছিয়া দিদিমা খাটে উঠিতেন। খাটগুলি প্রশস্তও কম নয়, দুইখানাতে মিলিয়া বেশ একটা ঘরের সমান হইবে। খাটের মাথা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রায় এক মানুষ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে ময়ূর-মিথুন দুই দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া লতাকুঞ্জে নৃত্যে মাতিয়াছে।

প্রথম রাত্রেই দিদিমা সুধা ও শিবুকে বলিলেন, "আমার কাছে শুবি তোরা?"

শিবু মাকে ছাড়িয়া শুইতে একেবারেই রাজি নয়। সুধা যদিও কাহারও সঙ্গে শোওয়া মোটেই পচ্ছন্দ করিত না, তবু দিদিমা পাছে দুঃখিত হন বলিয়া বলিল, "হ্যাঁ দিদিমা আমি শোব।"

খাট জুড়িয়া দিদিমার চারিধারে অর্থাৎ মাথার সিথানে, পায়ের নীচে, দুই পাশে তের-চোদ্দটি ছোট ছেলেমেয়ে তাহাদের পাড়-বসানো কাঁথা ও ছোট ছোট বালিশ লইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমায়। কাহারও বা দুই পাশে দুইটা করিয়া পাশ-বালিশ। দিদিমা যেন ঠিক মা-ষষ্ঠী কি কাঁঠাল গাছ, আষ্টেপৃষ্টে ফল ঝুলিতেছে। ছেলেমেয়েগুলির বয়স সবই কাছাকাছি, কিন্তু তাহাদের এক-একজনের এক-এক ছাঁচের মুখ, এক-এক ধাঁচের গড়ন, কথা বলার ভঙ্গী, কাপড় পরা চুল বাঁধার রীতি আলাদা, দেখিতে শুনিতে সুধার ভারি মজার লাগে। তাহাদের পিতারা এই সংসারের ছেলে, কিন্তু মায়েরা ভিন্ন ভিন্ন সংসার হইতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণ লইয়া আসিয়াছে, তাই একই ঝাড়ে বিভিন্ন রঙের ফুলের মত এক খাট আলো করিয়া এত নানা ছাঁচের শিশুমূর্তি দেখিলে তাকাইয়া থাকিতে হয়। ঘুমাইবার আগে স্বল্প আলোয় দিদিমার ঘাড়ে পিঠে

চড়িয়া তাহারা যখন গল্প ছড়া ও গানের আব্দার করিত, তখন সুধা একটু দূরে সরিয়া ইহাদের রকম-সকম দেখিত, ঐ সুরে সুর মিলাইয়া আব্দার করিতে তাহার যেন লজ্জা করিত।

দিদিমা কিন্তু অত জনের ধাক্কা সামলাইয়াও সুধাকে ভুলিতেন না, তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "হ্যাঁরে সুধা, অত দূরে স'রে গেলি কেন রে, আমি কি তোর পর? এক বছরেই দিদিমাকে একেবারে ভুলে গেলি?"

এত ছেলেপিলে এক সঙ্গে দেখা সুধার কখনও অভ্যাস নাই, তাহারা দুই ভাই-বোন নির্জনে পরস্পরের সঙ্গী হইয়াই মানুষ হইতেছে। এ যেন একেবারে ছেলের হাট।

গত বৎসর যখন সুধা আসিয়াছিল, তখন ত দিদিমার ঘরে এত ছেলেপিলে দেখে নাই। বড়মামীর পাঁচটি ছেলেমেয়েই তখন বড়মামীর সঙ্গে তাঁহার বাপের বাড়ী গিয়াছিল, আর মেজমামীর খুকী তখন সবে দুই মাসের, সারা মুখে কাজল মাখিয়া মেজেয় কাঁথার উপর দুম্ দুম্ করিয়া মল-পরা পা ছুঁড়িত। মেজমামার প্রথম পক্ষের যে তিনটি ছেলেমেয়ে আছে একথা সুধা ঠিক জানিত না, কারণ ও-জিনিসটা ঠিক বুঝিত না। এবার তাহারাও এখানে আসিয়াছে; সতুদা কাল সন্ধ্যাতেই সুধাকে বলিয়াছে, "জানিস, এরা হ'ল মেজমামার প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ে, এই মেজমামী ওদের মা নন।"

সুধা তাহাদের খুব ছোটবেলা দেখিয়াছে, কিন্তু এবার চিনিতে পারে নাই। বড় ছেলেটি কিন্তু মহামায়াকে ঠিক চিনিয়াছে। সে গম্ভীর মুখ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, "ছোটপিসি, ও মা তুমি যে!" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মহামায়ার আঁচল চাপিয়া ধরিল। তাহার শ্যামবর্ণ কচি মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল; মুক্তার মত দাঁতগুলি ঝলমল করিতে লাগিল। সুধার চেয়ে সে বছর তিনেকের বড় হইবে, কিন্তু সুধার তাহাকে দেখিয়া কেমন একটা বাৎসল্যের ভাব আসিতেছিল। সুধা মানুষটা চুপচাপ ধরণের, সকলের সঙ্গে বেশী কথা কয় না, তাই কিছুই বলিল না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, ছেলেটির হাতখানা একটু চাপিয়ে ধরে। অন্য ছেলেমেয়ে দুইটি কিন্তু সুধাদের দেখিয়া সামান্য একটু কৌতুহল ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করিল না।

রাত হইয়া গিয়াছিল, আজ আর গত বছরের দেখা মামার বাড়ীটা পুনরায় অগাগোড়া দেখিয়া ঝালাইয়া লইবার সময় নাই; শালপাতায় বাড়া

ভাত, বিউলির ডাল ও পোস্তর বড়া খাইয়া সুধাদের সকাল সকাল ঘুমাইতে হইবে। দাদামশায় লুচি ভাজিতে বলিলেন, কিন্তু অতক্ষণ অপেক্ষা সুধা শিবু করিতে পারিবে না। মহামায়া তাহাদের জল খাইবার গেলাস আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এখানে সকলেই ঘটি করিয়া আলগোছে জল খায়, সুধা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছে। কি করে? শেষে বড়মাসীমার কাছে একটা বাটি চাহিয়া সুধা তাহাতেই জল খাইল।

খুব ভোরে সুধার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। চোখ মেলিয়া দেখিল, দালানের পর মেজমামীর ঘরের জানালা খোলা হইয়া গিয়াছে, একেবারে রোয়াক হইতে সদর রাস্তার লাল মাটি দেখা যাইতেছে, পথের ধারের অশথ গাছটার নূতন পাতায় আলো পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গাছের ডালে কয়েকটা লম্বা-ল্যাজ বানর লাফালাফি শুরু করিয়াছে। সুধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মনে করিয়াছিল দেখিবে, আর সকলেই ঘুমাইতেছে। কিন্তু খাট হইতে নামিয়া দেখিল, দুই-একটি কচি ছেলে ছাড়া সকলেই তাহার আগে উঠিয়া পড়িয়াছে। ইহারা কি আশ্চর্য ভোরে উঠে!

মামীরা খোলা দালানের উপর দশ-বারোটা জল খাইবার ঘটি লইয়া শালপাতা ও সরিষার তেল দিয়া মাজিতে বসিয়াছেন। মাজিতে মাজিতে সমস্ত কালিটা শালপাতার গায়ে উঠিয়া আসিতেছে এবং ফুল কাঁসার সুগোল ঘটিগুলি রূপার মত ঝক্‌ঝকে হইয়া উঠিতেছে।

ছোটমামীকে কাল রাত্রে সুধা ভাল করিয়া দেখে নাই। আজ সকালে দেখিল, ছোটমামী গত বৎসরের চেয়ে অনেক সুন্দর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার গলায় কালো একটা সুতায় একটা সোনার মাদুলি ফরসা রঙে এমন চমৎকার মানাইয়াছে যে বলা যায় না, গহনার চেয়ে অনেক বেশী ভাল। মামীদের মধ্যে ইনি সত্যই সুন্দরী। পাড়াগাঁয়ের বাঙালী মেয়ের এমন রং চোখে বড় পড়ে না।

সুধা এবাড়ীর ভিতর বড় মাসীমার সঙ্গেই একটু বেশী কথাবার্তা বলিত। তিনি কি করিতেছেন দেখিবার জন্য একবার ছুটিয়া রান্নাঘরে গেল, রাত্রে ত কথা বলা হয় নাই। দেখিল রান্নাঘর হইতে এক কাঁড়ি কাঁসা পিতলের বাসন বাহির করিয়া তিনি মাজিবার জন্য বাগদী বৌকে দিতেছেন। সুধাকে

দেখিয়া বলিলেন, "সুধা, চল না আমার সঙ্গে তামলী-বাঁধে নাইতে যাবে। তোমার জন্যে একটি ক্ষেতুরে বাটি এনে রেখেছি, চান ক'রে এসে দেব।"

বড়মাসীমা সুধাকে কখনও তুই বলিতেন না, সুধার ইহা বড় ভাল লাগিত। সুধা বলিল, "না মাসীমা, মা ত আমাকে পুকুরে চান করতে দেন না কখনও, আমি জলে দাঁড়াতে পারব না, ডুবে যাব।"

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন, "ও মা, এত বড় মেয়ে জলে দাঁড়াতে পারবে না কি রকম! মায়ার সবই অদ্ভুত! এমনি করেই ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়? মেয়েকে চিরকাল ঝি রেখে তোলা জলে চান করাবে!"

মাসীমা ছোট ছোট দুটি বাটিতে তেল ও হলুদ লইয়া ও একখানা লাল রঙের চৌখুপি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। এ তাঁহার বাপের বাড়ীর পাড়া, এখানে তিনি পথে বাহির হইলেও মাথায় কাপড় দিতেন না।

বাগদী-বৌ বাসনগুলি ঝক্ঝকে করিয়া মাজিয়া আনিয়া বড়মামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বাসন রাখব গো, বড়-খুড়ী?"

বড়মামীমা বলিলেন, "রাখ না বাছা ঐ কূয়াতলায়।" মেজমামী ঘটিতে করিয়া খানিকটা জল লইয়া বাসনের উপর ঢালিয়া ঢালিয়া সেগুলিকে আবার রান্নাঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিলেন। বড় দালানে তাঁহার পেট-রোগা খুকীটা সকাল হইতে এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে, পা দুইটি সরু সরু, পেটটা মস্ত বড়। দেড় বৎসর বয়স হইতে চলিল, এখনও এক জায়গা হইতে আর এক জায়গা নড়িয়া বসিতে পারে না। মামীর মাত্র ত দুইটি ছেলেমেয়ে। তবু ইহাকে একটু ভাল করিয়া যত্ন করিতে পারেন না, সারাদিনই এটা সেটা নানা কাজ। মেয়েটার গায়ে মুখে কেবলই মাছি উড়িয়া বসিতেছে। সুধা কোথা হইতে একটা পাখা আনিয়া তাহাকে হাওয়া করিতে লাগিল। খুকী তবুও প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল। খাওয়া, কাঁদা আর পেট ছাড়া, বেচারার জীবনে তিনটি মাত্র কাজ। বড়মামীমা পিতলের পাইয়ে করিয়া চাল মাপিয়া একটা ধামায় ঢালিতেছিলেন, রাগ করিয়া বলিলেন, "মেজবৌ, বাসন ক'খানা রেখে মেয়েটাকে ধর দেখি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে গলায় রক্ত উঠে যাবে। তোমার মেয়ের সঙ্গে ত ভাই, চিলেও পাল্লা দিতে পারে না।"

মেজমামী বিরক্ত মুখে আসিয়া মেয়ের পিঠে এক কিল বসাইয়া বাঁ হাতে তাহার এক হাত ধরিয়া ঝট্‌কা দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

বড়মামী বলিলেন, "ও সুধা, যা না মা, বাকি বাসন ক'খানায় একটু জল ঢেলে তুলে নিয়ে আয়। আমি আজ আর ছোঁব না এখন ওগুলো।"

সুধা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে মামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। মামী বলিলেন, "কি হ'ল রে? যা না চট্ ক'রে?"

সুধা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি যে কাজ করবে না তা আমাকে কেন করতে বলছ? তুমি যদি না ছোঁও ত আমি কেন ছোঁব?"

মামী বলিলেন, "বাপ্‌রে, মেয়ের বিচার দেখ! যা, ওই সাগরজল-মা'র সঙ্গে সই পাতা গে যা। সারা পথ গোবর ছড়া দিয়ে হাঁটবি।" মামী হাসিয়া উঠিলেন।

সুধা মামীর হাসির কারণ না বুঝিয়া অপমানিত হইয়া সেখান হইতে ঢেঁকিশালে চলিয়া গেল। এইখানে ঢেঁকির উপর বসিয়া গত বৎসর সে জ্ঞাতিদের মেয়ে বাসিনীর সহিত বেণে পুতুল লইয়া খেলা করিত।

আজ সেখানেও কাজের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। বাগদীদের বৌরা ঘরের চালে বাঁধা দড়ি ধরিয়া তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করিয়াছে, বাসিনীর মা 'সোনামুখীর মামী' ঢেঁকির গড়ের ভিতর ধান নাড়িয়া দিতেছেন। দু সেকেণ্ড অন্তর ঢেঁকি পড়িতেছে, তবু তারই ভিতর মামীর হাত কেমন ক্ষিপ্র চলিতেছে, আবার গল্পেরও বিরাম নাই। সোনামুখীর মামী গ'প্পে মানুষ, কিন্তু বেচারীর কপাল ভাল নয়, বাসিনীকে কোলে লইয়া আঠারো বৎসরেই বিধবা হইয়াছেন। দাদামশায়ের পাশেই তাঁহার ভিটা তাই রক্ষা, ঘরের ধানচালে পেট ভরে, আর কাপড়চোপড় হাতখরচ চলে দাদামশায়ের ঘরে ধান ভানিয়া, নদী হইতে খাবার জল আনিয়া দিয়া। দিন য' কলসী খাবার জল তিনি আনেন, মাসে তত আধুলি তাঁহাকে দেওয়া হয়। তাছাড়া ধান ভানা, মুড়ি ভাজার মজুরি আলাদা। ধানের মজুরি ধান, মুড়ির মজুরি চাল, ইহার ভিতর পয়সার হিসাব নাই।

সুধাকে দেখিয়া সোনামুখীর মামী বলিলেন, "সুধা যে গো? কাল এসেছিস বাছা, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ঘর ছেড়ে আর তোদের খোঁজ নিতে পারি নি। মা কেমন আছে তোর? শিবু ভাল ত? আর ভাই হয়েছে একটি?"

সুধা এতগুলো প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দিতে পারিল না, বলিল, "না, আর ভাই ত হয় নি।"

সোনামুখীর মামী কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন ভুলিয়া গিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "তা তোদের ঘরে হবে কেন? খেতে পরতে পাবে যে যত সব কাঙালের দোরে দোরেই ছেলের পাল এসে জমা হয়।"

সুধা চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কোনও জবাব দিবার প্রয়োজন যে নাই এবং মামী জবাব আশাও যে করেন না তাহা সুধা বুঝিয়াছিল। উঠানে বড় বড় ধানের মরাইয়ের উপর একপাল চড়ুই পাখী কিচির মিচির করিতেছিল, ঠিক যেন মানুষে মানুষে কথা কাটাকাটি হইতেছে, সুধা তাহাই দেখিতেছিল। এমন সময় দিদিমা ডাক দিলেন, "ওরে ও সতু, বিশু, সব ছেলেগুলোকে ডাক্ না রে। দুধ জ্বাল দিয়েছে, এই বেলা খেয়ে নিক, ভোর থেকে ত পেটে কিছু পড়ে নি।"

সুধা ডাক শুনিলে অগ্রাহ্য করিতে পারিত না, সে সকলের আগে গিয়া হাজির হইল। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নানা জায়গা হইতে এক-একটি করিয়া ছেলেমেয়ের পাল জমা হইতে লাগিল। চৌদ্দ পনরটা কাঁসার বাটি সাজাইয়া মস্ত এক কড়া দুধ লইয়া দিদিমা বসিয়াছেন। পিতলের হাতায় করিয়া সকলকে বাঁটিয়া দিতেছেন। তারপর মুড়ি ও গুড়, নয়ত তেলমাখা মুড়ির সঙ্গে কুচো পেঁয়াজ, সবাইকে এক কোঁচড় ভরিয়া। দাদামশায় আসিয়া বলিলেন, "কাল যে জিলাপী আনলাম তার কি হ'ল? মুড়ি দিচ্ছ কেন ছেলেদের? বছরে একবার আসে, তাও তুমি হাত তুলে দুটো দিতে পার না?"

দিদিমা বলিলেন, "দিতে আমার কি অসাধ? কিন্তু শুধু সুধা আর শিবুকে দিলেই কি হবে? এবার যে বলতে নেই—সব ক'টি একঠাঁই হয়েছে, তোমার ও জিলাপীর হাঁড়িতে কুলাবে? এখন ক্ষিধের মুখে সক্কালবেলা ওসব কাজ নেই, বিকেলবেলা সবাইকে একটা একটা ক'রে দেব।"

দাদামশায় রাগ করিয়া বৈঠকখানা ঘরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "ও মায়া, তোর গরীব বাপের ঘরে আর ছেলেদের আনিস না; গুড় মুড়ি ছাড়া কিছু খাবার এখানে জোটে না।"

দিদিমা রাগিয়া বলিলেন, "গাই বিইয়েছে, বড় বড় দুধের বাটি বার করেছি, ভর্তি ক'রে দুধ দিলাম তবু তোমার মন ওঠে না। গেরস্তর ঘরে ছেলেপিলে আবার কত খাবে?"

পাড়ার মেয়েরা পুকুরঘাটে যাইবার পথে আজ সবাই এ বাড়ি উঁকি মারিয়া যাইতেছে, কাল যে মহামায়া আসিয়াছেন। কেহ বলিতেছে, "ওলো মায়াদিদি, দেখি না লো কেমন আছিস্, এক বছর যে দেখি নাই।" কেহ বলিতেছে, "ওলো ছোট-মাসি, ছেলেপিলে ডাগর হয়েছে, এবার ওদের পিসির কাছে রেখে বেশীদিন থাক্ না এখানে।"

দূর হইতে শুনিয়াই সুধার চোখে জল আসিয়া গেল। মাকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে একদিনও যে কোথাও থাকা যায় তাহা সুধা কল্পনা করিতে পারিত না। মা আর বাবা তাহার সমস্ত জগৎ আলো করিয়া আছেন, মা না থাকিলে অর্ধেক জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইবে যে!

মেয়েদের হাতে বেশীর ভাগেরই মোটা মোটা পালিশ-করা রূপার বালা, দুই-চারজনের হাতে এক গোছা করিয়া রূপারই চুড়ি। সুধার মা সোনার চুড়ি পরিতেন বলিয়া সুধা একটু কৌতূহলের সহিত মেয়েদের আভরণ দেখিতেছিল। একটি মহিলা হাসিয়া বলিলেন, "কি দেখছিস্ বাছা, তোর মা বড়লোকের পরিবার, সোনার গয়না পরে, সকলের কি তা জুটে?"

সুধা হাবার মত হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "বোকা মেয়েটাকে কি মাথামুণ্ডু শোনাচ্ছ? ও ত বড়লোক গরীব লোক সব জানে।"

মহামায়াকে দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এক বৎসরে তাঁহার সংসারে কি কি নূতন খবর জমিয়াছে জানিবার জন্য। মহামায়া গত বৎসরে সুধা ও শিবুকে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ বৎসরও সেই দুইটিই; নূতন আর একটি আনিতে পারেন নাই, ইহাতে সঙ্গিনীরা বড়ই নিরাশ হইয়া গেলেন। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এই ত পৃথিবীর খবর, পৃথিবীর নূতনত্বও ইহাই লইয়া। মহামায়ার সংসারে বিবাহের বয়স এখন কাহারও নাই, মৃত্যু—সে যেন শত্রুরও না হয়, জন্মই একমাত্র সুখবর ছিল, তাহা হইতেও যেন মহামায়া সকলকে বঞ্চিত করিলেন।

লোকসমাগম দেখিয়া সোনামুখীর মামী কাজ সারিয়া আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হ্যা গ্যাখ, সনাতনের মায়ের গেল বছর এক খোকা হ'ল, আবার এ বছরেও একটি হয়েছে। সাতটি ছেলেমেয়ে ঘরে, কিন্তু খেতে দেবার পয়সা নেই।"

বড়মামী বলিলেন, "আর আমাদের উমিরও ত তাই। ফি বছরই একটি।"

মহামায়া বলিলেন, "সুধা, যা দেখি এখান থেকে। যত সব বাজে গল্পের মাঝখানে ব'সে থাকতে হবে না।" সুধা চলিয়া গেল।

একজন পড়সী বলিলেন, "ও ত কেবল মেয়েই বিয়োচ্ছে, এর মধ্যে পাঁচটা হয়ে গেল। শাশুড়ী বলে—ঘটা ক'রে ছেলের সকাল সকাল বিয়ে দিলাম। কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই, বৌ এর মধ্যে পাঁচটা মেয়ে বিইয়ে দিলেন।"

মহামায়া বলিলেন, "উমার মেয়েগুলিকে আমি দেখছি, আহা, কি সুন্দর দেখতে, যেন ফুলের ডালি।"

সোনামুখীর মামী বলিলেন, "অমন সুন্দরের নাম কি ভাই? কেবল মেয়ের পাল; ওর মধ্যে দুটো বেটাছেলে মিশাল থাকত, তবে না সাজন্ত হত। শাশুড়ী মাগী বড় দজ্জাল, উঠতে বসতে গঞ্জনা দিচ্ছে—মেয়ে-বিয়ুনী ব'লে। উমি বলে—এবার মেয়ে হ'লে আমি গলায় দড়ি দেব।"

বিনোদা বলিল, "মায়া-দিদি, ওঠ্ না লো, চান করতে করতে গল্প হবে, তেল গামছা নিয়ে আয়।"

মহামায়া বলিলেন, "চল্ যাচ্ছি, আমি ঘাটে ব'সে তেল মাখতে পারব না, শুধু গামছা হ'লেই চলবে।"

সোনামুখীর মামী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, দিনে দিনে একেবারে মেম হয়ে উঠছিস, এবার একটি ঘাঘরা প'রে আসিস্।"

মহামায়া বলিলেন, "দোকানে কিনতে পাঠিয়েছিলাম, পাওয়া গেল না, নইলে এইবারেই প'রে আসতাম।"

বিনোদা বলিল, "মায়া-দিদি, এত রঙ্গও জানিস্। তোর সঙ্গে পারা ভার। তবে তোর যা রং ভাই, এমনি সুন্দর চেহারাতেই ঘাঘরা মানায়। আমাদের প্রিয়বালার মা, ওই যে কাটিকেষ্টবাবুর বৌ, পাড়ায় পাড়ায় বাইবেল নিয়ে বেড়ায় আর সেলাই করায়, ওর রং নয়ত হাঁড়ির কালি, রূপ যেন শ্যাওড়া গাছের পেত্নী, কিন্তু ঘাঘরাটি ঠিক পরা চাই।"

কুমুদা বলিল, "তা যা বলিস্ ভাই ছোটমাসি, ওরা আমাদের চেয়ে ভাল। এই আমাদের শৈবলিনী কালো মেয়ে, তবু বাপমার সখ হ'ল কুলীনে করতে হবে। জামাইও হয়েছে তেমনি, যেন ঠিক বাউরী কি কাওরা। গেল

বছর দেখলি ত মেয়ে জামাইকে, এবার ছোঁড়া আবার দুটো বিয়ে করেছে বললে বলে—কাল-পেঁচী মেয়ে, ওকে নিয়ে যে আমি ঘর করব না, তা ত তোমরা জানই। টাকা দিতে পার, ফি বছর একবার আসব।"

বিনোদা বলিল, "লাভ ত বড়! এখন মেয়ে পুষছে; এর পর নাতি-নাতনীও বছর বছর পুষবে। তার চেয়ে সত্যি খ্রিষ্টান হলেই সুখ ছিল।"

মহামায়া অল্পদিনের জন্য বাপের বাড়ী আসিতেন, আর তাঁহার স্বামী ছিলেন এ বাড়ীর অন্য সব জামাইদের চাইতে একটু পণ্ডিতধরণের মানুষ। এই বয়সেই লোকসমাজে তাঁহার নামডাক হইয়াছিল, তাছাড়া মহামায়া বাপমায়ের কোলের মেয়ে, এই জন্য বাপের বাড়ীতে তাঁহার আদর একটু বেশী ছিল। পিতা লক্ষ্মণচন্দ্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য দিনে দশবার ঘরবাহির করিতেন, মা মুখে কিছু না বলিলেও সমস্ত মনটা তাঁহার মায়ার কাছেই পড়িয়া থাকিত, ভাজেরাও শ্বশুর-শাশুড়ীর মন বুঝিয়া এবং কতকটা আপনা হইতেই মহামায়াকে একটু খাতির করিতেন, বিধবা দিদি ত তাঁহাকে এক মুহূর্ত কাছ-ছাড়া করিতে চাহিতেন না।

মহামায়া বাপের বাড়ী আসিলে তাঁহার চারিপাশে অষ্ট প্রহরই যেন মজলিশ লাগিয়া থাকিত। খাইতে শুইতে বসিতে সাত জনের সাতশ গল্প লাগিয়াই আছে। সে যে কত রকমের গল্প তাহার ঠিক নাই।

ছোট ভাজ মৃণালিনী যতদিন নূতন বৌ ছিলেন কথা বলিতেন না, এখন তিন-চারি বৎসর বিবাহ হইয়াছে, একটি সন্তানেরও সম্ভাবনা, এখন সকলের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ভাজেদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী, তাঁহার কাঁচা সোনার মত রং, মেঘের মত চুল, একটু কটা কটা চোখের রং, বেশ নরম-সরম গোলগাল গড়ন; তাঁহার গল্পের বিষয়ও ছিল মানুষের রূপ। সকল গল্পেই শেষ পর্যন্ত বক্তব্য গিয়া দাঁড়াইত তাঁহার নিজের রূপের শ্রেষ্ঠতায় ও আর পাঁচজনের রূপহীনতায়। সুধার চোখে তাঁহাকে দেখিতে খুব ভালই লাগিত; কিন্তু তিনি যে এবার প্রথম কথাই সুধার রূপ লইয়া পাড়িয়াছিলেন ইহাতে সুধা তাঁহার কাছে যাইতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তিনি সুধার সামনেই মহামায়াকে বলিলেন, "হ্যাঁ, ছোট ঠাকুরঝি, তোমার ভাই এমন রূপ, ঠাকুরজামাই এত সুন্দর, মেয়ে এমন কি ক'রে হ'ল? বাপমায়ের রূপে ঘর আলো আর মেয়ের এই ছিরি, তোমার মেয়ে ব'লে যে লোকে স্বীকার করবে না।"

সুধার মনটা মুসড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কথাগুলা সুধার কানে যে অমৃত বর্ষণ করিতেছে না ইহা কাহারও খেয়ালই হইল না। মৃণালিনী বলিলেন, "ওকে মাগুর মাছের কান্‌কো বেঁটে মাখিও। আমার ছোট বোনের রং কালো ছিল, তাই বিয়ের আগে মা তাকে এক বছর ধ'রে রোজ ছাদের চিলের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাগুর মাছের কান্‌কো বাঁটা সর্ব্বাঙ্গে মাখাতেন। সত্যি সত্যি মেয়েটার রং বদলে গেল।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভাই সুন্দরী মানুষ, তোমার সারাক্ষণ রূপের ভাবনা। আমার মেয়ের এখন বিয়ের বয়স হয় নি, এখনই অত রং চেকনাই করবার দরকার নেই।"

মৃণালিনী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, কাশ্মীরী কোন্ জাতকে বলে জান?"

মহামায়া বলিলেন, "জানি মানে চোখে হয়ত দেখিনি, তবে বইয়ে পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি; বোধ হচ্ছে কলকাতায় একবার একটা কাশ্মীরী শালওয়ালা দেখেও থাকব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তাদের বুঝি খুব সুন্দর রং? আমার ছোটবেলায় পাড়ার লোকেরা বলত, 'এ মেয়ে ঠিক কাশ্মীরীর মতন।' বিনিকে যে দেখত সেই বলত, 'এক মায়ের পেটে দুটি এমন দুরকম জন্মাল কি ক'রে?' বাবাঃ, দশ বছর বয়স না-হতেই আমার কত জায়গা থেকে যে সম্বন্ধ এল তার ঠিক নেই।"

মহামায়া বলিলেন, "তা বেছে বেছে গরীবের ঘরটিতেই তোমার বাপ মা দিলেন কেন?"

মৃণালিনী একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আহা, তা যেন আর জান না? তোমার ভাই যে ধনুকভাঙা পণ করেছিলেন!"

বড়ভাজ দেখিতে চলনসই ছিলেন, রোগা, লম্বা, শ্যাম বর্ণ রং; কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। তাঁহাকে শত কাজের ভিতরেও অপ্রসন্ন মুখে বড় দেখা যাইত না। তাঁহার কোলের ছেলে একেবারে কচি ছিল না বলিয়া কাজকর্মের ভিতরেও লোকের সহিত রঙ্গ-রস করিতে তিনি ভালবাসিতেন। মৃণালিনী রূপের গল্প শুরু করিলে বড় জা পার্বতী বলিতেন, "আমরা ভাই কালো কুচ্ছিত মানুষ, আমাদের সঙ্গে ছোটবৌয়ের গল্প জমে না।

হাজার হোক, মেয়েমানুষের মন ত? একজন কেবল রূপের দেমাক করলে মনে একটু খোঁচা লাগে বইকি! আমাদের বাপ মায়ে ধ'রে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, কেউ দেখে গড়াতে গড়াতে আসে নি; কিন্তু তবু ত ঘর চলছে, এখনও ত বার ক'রে দেয় নি।"

মৃণালিনী একটু লজ্জিত হইয়া বলিতেন, "বড় দিদির যেমন কথা! আমি নাকি দেমাক করছি, কথায় কথা উঠল তাই বললাম। ছেলেবেলা মা আমাকে মোটে আয়নায় মুখ দেখতে দিত না, সিঁথি কেটে চুল বাঁধতে দিত না, পাছে রূপের গুমোর শিখি।"

বড় জা বলিতেন, "আচ্ছা, ঠাকুরপোকে বলব এবার আয়নায় ঘর মুড়ে দিতে। প্রাণের যত রকম সাধ আছে মিটিয়ে নিস্; যুগল রূপের ছায়াও মন্দ দেখাবে না।"

সুধা সেইখানেই পিঠ ফিরাইয়া বসিয়া খেলিতে খেলিতে সকল কথা শুনিত আর ভাবিত, 'ভগবান্ আমাকে সুন্দর করেন নাই তাহাতে কাহার কি ক্ষতিটা হইল?' আবার ভাবিত, 'আমি সুন্দর হ'লে আমার মা বাবা যে এত সুন্দর তা বুঝতে পারতাম না। আমার মত সুন্দর বাপ মা কারুর নেই।"

মামার বাড়ীতে যখনই মেয়েদের জটলা হইত, তখনই দেখা যাইত, খানিকক্ষণ হাসি-তামাসা ও ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের গল্পের পর গল্পের ধারা অকস্মাৎ মোড় ফিরিত। মেয়েদের গলা নীচু হইয়া আসিত, দূরের সঙ্গিনীরা অনেকটা কাছে আগাইয়া বসিতেন, বোঝা যাইত এইবার গল্পটা সব কয়জনেরই সমান চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুধা-শিবুর কাছে এইবারেই তাহা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িত। সুধা বুঝিতে পারিত, থাকিয়া থাকিয়া কোনও একজন পুরুষের কথা উঠিতেছে, যাহার নামটা বারংবার উচ্চারণ করিতে মেয়েদের একটু ভয় আছে। না-জানি কে শুনিয়া ফেলিবে। আকারে ইঙ্গিতে কিন্তু সব গল্পটাই হইয়া যাইত। মানুষটা কি একটা ঘোরতর অন্যায় কাজ করিয়াছে, নীচু গলায় চোখ বড় বড় করিয়া সকলে তাহারই গল্প ঘোরালো করিয়া তুলিত। কিন্তু এত বড় অন্যায়ের আলোচনায় সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় সকলেই থাকিয়া থাকিয়া মুচকিয়া হাসিয়া উঠিত। মানুষের অপরাধের ভিতর আনন্দরস কোথা হইতে আসে ভাবিয়া সুধা কত সময়

অবাক্ হইয়া মাসী ও মামীদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত কিন্তু তাহার উপস্থিতিটাকে বিশেষ কেহ গ্রাহ্য করিত না, কেহ ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইতও না। মাঝে মাঝে মহামায়া এক-একবার বলিয়া উঠিতেন, "সুধা, যা দিকি এখান থেকে, বুড়োদের কথা যত হাঁ ক'রে গিলতে হবে না। বিশ্বের ছাইভস্ম!"

মানুষের বয়স বাড়িলে এই জাতীয় বুড়োমি গল্প যে পৃথিবী জুড়িয়া অধিকাংশ লোকেই করে, তাহা সুধা তখনও বুঝিতে শিখে নাই। সে মনে করিত, জগতের যত সামাজিক অপরাধ তাহার মামার বাড়ীর পাড়ায় বিশেষ কয়েকটি লোকই বোধ হয় করিয়া থাকিবে, তাই এই বাড়ীতে এই অপরাধের এত আলোচনা। তাহার ইতিপূর্বে ধারণা ছিল, সামাজিক আইন সম্বন্ধে শিশুরাই অজ্ঞ, তাই তাহারা না জানিয়া কাহাকেও আঙুল দেখায়, কাহাকেও মুখ ভেঙায় কিংবা কাহাকেও বা পথে শোনা দুই-একটা গালাগালি উপহার দিয়া বসে। বয়স্ক লোকে জানিয়া শুনিয়া সমাজের কাছে একসঙ্গে অপরাধী ও হাস্যাস্পদ কেন হইয়া বসে ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইত না। বয়সে মানুষের বুদ্ধি তাহা হইলে বাড়ে না।

বড়মামী পার্বতীর একটু বিশেষত্ব ছিল, সর্বদা গল্পগুলিকে এই পথে টানিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতায়। ছোটমামীর যেমন রূপের অহঙ্কার ছিল, বড়মামার তেমনই ছিল শালীনতার। যখন তখন তাঁহার মুখে পাড়ার মেয়েদের নামে শোনা যাইত, "মেয়ের ভাবন দে'খে আর বাঁচি না।" "ভাবুনী"দের তিনি দু-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাই বোধ হয় নিজে কখনও একখানা ভাল কাপড় কি গহনা পরিতেন না। চুলটা মাথার উপর উবু ঝুঁটি করিয়া বাঁধিয়া মোটা একখানা শাড়ী জড়াইয়া সকাল-সন্ধ্যা তাঁহার কাটিত। মুখে হাসির অভাব কখনও দেখা যাইত না, কিন্তু আর কোনও ভূষণের ধার তিনি ধারিতেন না।

পাড়ার নর্মদাদিদির স্বামীর গল্প মহিলা-মজলিশে প্রায়ই হইত। সে যে ঠিক কি করিয়াছিল, সেটা ভাষায় কেহ ব্যক্ত করিত না বলিয়া সুধা অপরাধটা বুঝিতে পারিত না; তবে মানুষটার মত মন্দ লোক পৃথিবীর ভদ্রসমাজে আর যে নাই এ-বিষয়ে সুধা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিল। কিন্তু লোকাচার সম্বন্ধে সুধার জ্ঞান সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া গেল, যেদিন সে দেখিল যে নর্মদাদিদির স্বামী উপেনবাবু

পূজা উপলক্ষ্যে শান্তিপুরে ধুতি চাদর পরিয়া ফুলবাবুটি সাজিয়া বাড়ী বাড়ী প্রণাম করিয়া বেড়াইতেছেন। বড়মামীসুদ্ধ তাঁহাকে কত ঘটা করিয়াই না অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। অন্য মামীরা জামাইয়ের সামনে মুখে ঘোমটা দিলেও সাতদিক্ হইতে সাতজন সন্দেশ জল পান যোগান দিতে লাগিলেন। যে বড়মামী সেদিন হাত ঘুরাইয়া বলিতেছিলেন, 'ঝাঁটা মার ঐ উপেনটার মুখে', তিনিই ত আসন পাতিয়া 'এস বাবা, বস বাবা' করিতে লাগিলেন সবার আগে।

বড়মাসীমা কিন্তু ভারি মজার ছিলেন। তিনি কখনও মেয়েদের এই নিন্দার মজলিশে বসিতেন না। যাহার উপর রাগ হইত তাহাকে ধরিয়া তখনই দশ কথা খুব শুনাইয়া দিতেন এবং যাহাকে ভাল চিনিতেন না তেমন লোককে ভাল না লাগিলে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিতেন। নর্মদাদিদির স্বামীকে দেখিয়া মাসীমা ত ঘর ছাড়িয়াই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বড়মামীরা ঘরে আসিয়া বলিলেন, "জামাই তোমায় প্রণাম করতে চাইছে, ঠাকুরঝি!"

মাসীমা বলিলেন, "প্রণামে কাজ নেই, এইখান থেকেই আশীর্বাদ করছি, ভগবান্ ওকে শুভমতি দিন।"

বড়মামী কিন্তু উপেনবাবুর কাছে বলিলেন, "ঠাকুরঝির বড় গায়ে ব্যথা হয়েছে, আজ আর এদিকে আসছেন না। কিছু মনে ক'রো না।"

মহামায়ার দিদি সুরধুনী তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতেই বড় ভালবাসিতেন। বাপের বাড়ী আসিলেই তিনি মহামায়াকে তাঁহার ঘরে শুইবার জন্য লইয়া যাইতেন। বিধবা মানুষ, একলা বারোমাস থাকেন, কাহারও সঙ্গে দুইটা মনের কথা বলিবার জো নাই। বাপের বাড়ীতে চিরকাল বাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাপ-মায়ের কাজেও তিনিই সকলের চেয়ে বেশী লাগেন, কিন্তু তবু দুইটা ছেলে লইয়া বুড়ো বাপের গলায় পড়িয়াছেন বলিয়া বাপের বাড়ীতে অন্য মেয়েদের মত তাঁহার আদর নাই। বাপ-মা কাজের সময় ডাকেন, ফাইফরমাস করেন, কিন্তু তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার কথা শুনিবার বয়স কি অবসর তাঁহাদের নাই, বলিবার ইচ্ছাও সুরধুনীর হয় না। ভাজেদের চালচলন অন্য রকম, পরের বাড়ীর মেয়ে সব, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে তিনি পারেন না। তাছাড়া বিধবা মানুষ সংসারের গলগ্রহ, যদি ভারিক্কি হইয়া না চলেন, নিজের রসহীন শুষ্ক জীবনের করুণ ক্রন্দন তাঁহাদের কানে ঢালেন,

তবে বয়সে ছোট এই ভাজেরা তাঁহাকে মানিবে কেন? বাপেরই না-হয় তিনি খান পরেন, কিন্তু ভাজেরা এখনও তাঁহাকে গুরুজন বলিয়া সমীহ করিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের কাছে রুক্ষতার বর্ম তাঁহাকে পরিয়া থাকিতেই হইবে। নিজের ছেলেরা একে বয়সে অনেক ছোট, তাহাতে পুরুষ মানুষ, সর্বোপরি মা'র বৈধব্যটাকে মায়েরই একটা অপরাধ বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইয়াছে, সুতরাং মনের যোগ তাহাদের সঙ্গে ত হইবার উপায় নাই।

কিন্তু বোনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই আলাদা, একই পিতৃ-মাতৃরক্তধারা ভাইবোন সকলের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু একটা বয়সের পর ভাইরা যেন সে প্রবাহের মাঝখানে কোথায় একটা বাঁধ তুলিয়া দেয়, তাহারা যেন হইয়া যায় সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, কিন্তু বোনেরা দূরে চলিয়া গেলেও সেই অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী একের অন্তর হইতে আর-একজনের অন্তরে একই ভাবে বহিয়া চলে। বহুদিন পরে যখন বোনে বোনে মিলন হয় তখন যেন স্রোতস্বিনীতে বর্ষার বান ডাকিয়া যায়।

সুরধুনীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হইয়াছে, কিন্তু ভিতর ও বাহিরের আচরণে তাঁহার বয়স সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। কুড়ি বৎসর বয়সেই দুইটি শিশুপুত্র কোলে লইয়া তিনি স্বামীকে হারাইয়াছেন, তখন হইতে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর প্রাচীনা গৃহিণীর মত পিতৃসংসারের সারথি হইয়া কঠিন হস্তে রশ্মি টানিয়া আছেন। পিছনে কত নাট্যের পর নাট্য ঘটিয়া চলিয়াছে, কত শিশু যৌবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার খেলায় দেহমন সঁপিয়া দিয়াছে, কত যৌবনের জয়গান থামিয়া গিয়া বার্ধক্যের হতাশা ও অতৃপ্তি মাত্র শেষ দিনের প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে, সুরধুনী সেদিকে পিছন ফিরিয়া কখনও তাকান নাই, কখনও তাহাদের সেই জীবন-নাট্যলীলায় আপনাকে জড়াইয়া ফেলিতে চাহেন নাই ; তিনি সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল এই রথচক্রের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। সেখানে তিনি যেন অর্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা লইয়াই জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, তেমনই ভাবেই চলিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু আর এক জায়গায় তাঁহার সেই প্রথম যৌবনের বিংশতি বৎসরের কোঠা আজও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণচন্দ্র প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন পিতৃমাতৃহীন এক কিশোর বালকের সঙ্গে। সংসারের মাথা কেহ ছিল না বলিয়া সুরধুনী পনের-ষোল বৎসর বয়সের আগে শ্বশুরবাড়ী যান নাই। তিনি হিন্দু ঘরের মেয়ে, ছেলেবেলা হইতেই শ্বশুরবাড়ীর বিভীষিকা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা তাঁহার অভ্যাস, ভয়ে ভয়েই শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন, অবশ্য মনের কোণে অল্পদিনের দেখা কিশোর স্বামীটির সম্বন্ধে একটা কৌতুহল-মিশ্রিত অনুরাগের রশ্মি লইয়া যে যান নাই, তাহা নহে। গিয়া দেখিলেন, স্বামী তাঁহার জন্য একেবারে সতী-স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সে স্বর্গে মন্দার পারিজাত অপ্সরা কিন্নরী গন্ধর্ব ছিল না, ছিল ছোট্ট একখানি গৃহ—উপরে নীচে আশেপাশে অতীতে বর্তমানে স্বামীর অনুরাগ দিয়া মোড়া। নীলাম্বর তাঁহার জীবনের এই প্রথম আপন জনটিকে কেমন করিয়া

কোথায় রাখিবেন, কি করিয়া তাহার কাছে আপনার মনের নিবিড় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন ভাবিয়া পাইতেন না। জীবনে কাহারও ভালবাসা পাওয়া কি কাহাকেও ভালবাসা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। এই সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতায় তিনি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সযত্ন সেবার ভিতর দিয়া ইহা প্রকাশ করিবেন বলিয়া, ছোট্ট মেয়েটিকে কোনও কষ্টই পাইতে দিবেন না বলিয়া, বিছানা পাতা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানো সব কাজই নীলাম্বর সুরধুনীর আগে করিতে ছুটিতেন। সুরধুনীর মনে মনে অত্যন্ত হাসি পাইত, এ কি রকম পুরুষমানুষ, কর্তা সাজিয়া দুটো ধমক চমক দিয়া কাজ আদায় করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজেই স্ত্রীর পরিচর্যা করিতে বসিল! কিন্তু নববধূ লজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেন না, ঘোমটার ভিতর হইতে হাসিতেন। নীলাম্বর তাঁহার মাথার কাপড়টা পিছন হইতে টানিয়া খুলিয়া দিয়া বলিতেন, "বেশ বউ ত তুমি, আমি এত ক'রে খেটেখুটে তোমার জন্যে সংসার সাজাচ্ছি আর তুমি একটু মুখ খুলে দেখবেও না?" সুরধুনী বলিতেন, "দেখব কি? ও দেখতেই লজ্জা করে। তুমি ব'সে দেখ, আমি করি, দেখবে কেমন মানায়।"

শেষকালে রফা হইত আধাআধি। দু-জনেই কাজ করিবে, কিন্তু কেহ নিজের কাজ করিতে পাইবে না। স্নানের আগে সুরধুনী যদি নীলাম্বরের মাথায় তেল দিয়া দিতেন ত স্নানের পর নীলাম্বর গামছা লইয়া আসিতেন সুরধুনীর এক মাথা ঘন কালো চুলের জল মুছিয়া দিতে। সুরধুনী ভাত বাড়িলে নীলাম্বর পিঁড়ি পাতিতে, জল গড়াইতে ছুটিতেন। সুরধুনী খুশী হইলেও লজ্জায় আকণ্ঠ লাল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "তুমি অমন মেয়েমানুষের মত আমার সেবা করলে আমার যে পাপ হবে! ছেলেবেলা থেকে স্বামীকে ঠাকুরদেবতা ব'লে পূজো করতে শিখে এলাম আর তুমি শেষে আমার সব শিক্ষাদীক্ষা উল্টে দিতে চাও? আজ থেকে তোমায় কিছু করতে দেব না।"

নীলাম্বর দুষ্টামি করিয়া বলিতেন, "ঠাকুরদেবতার স্ত্রীরা কি সারাদিন উনুন নিকোয় আর ঘর ঝাঁট দেয়? তাঁরা কি করেন তোমার ওই হরগৌরীর পটে দেখ। গৌরী ত অষ্ট প্রহর মাথায় মুকুট প'রে বেচারী ভিখিরী শিবের কোলটি জুড়ে ব'সে আছেন, পতিসেবা ত কই করছেন না!" বলিয়া নীলাম্বর সুরধুনীকে দুই হাতে কোলের ভিতর জড়াইয়া ধরিতেন।

হাসিয়া স্বরধুনী বলিতেন, "যাও, তোমার ঠাকুরদেবতা নিয়েও ফাজলামি!"

নীলাম্বর বলিতেন, "সত্যি কথা বললেই ফাজলামি হয়! শ্রীকৃষ্ণ রাধার পদসেবা পর্যন্ত করেছেন, পায়ে ধ'রে না সাধলে মানিনী ত সাড়াই দিতেন না। তোমরা আমাদের দর বাড়িয়ে এখন সব উল্টে দিয়েছ।"

পাঁচ বৎসর স্বরধুনী স্বামীর ঘর করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দুইটি সন্তানের জন্মকালে দুইবার বাপের বাড়ী যাওয়া ছাড়া আর কখনও এক দিনের জন্যও তিনি স্বামীকে ছাড়িয়া থাকেন নাই। সেকালে বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর একাত্মতা বিষয়ে বক্তৃতা কখনও শোনেন নাই, নরনারীর সমান অধিকারের কথাও জানিতেন না, কিন্তু এমন করিয়া মনে-প্রাণে স্বামীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহাদের দুজনের ভাবনাচিন্তা কাজ সবই যেন একই উৎস হইতে উৎসারিত হইত। প্রেমকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া বিরহ ও মিলনের নানা পর্যায়ের ভিতর দিয়া তাহারই রঙের চশমায় জগৎকে নানারূপে দেখিবার ও আপনার মনের ভাবধারার প্রকারভেদকেও নবনব রূপে দেখিবার অবসর তাঁহার হইত না, স্বামীর অনুরাগ ও স্বামীর প্রতি অনুরাগে তাঁহার মনোলোক ও বহির্জগৎ এমনই নিরেট করিয়া ঠাসা ছিল। তাছাড়া তখন দেনা-পাওনার জোয়ার চলিয়াছে দুইটি তরুণ উচ্ছল জীবনস্রোতেই, তখন আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া দূর হইতে আপনারই নানা রূপ দেখিবার বয়স হয় নাই। দানের জোয়ার যখন সরিয়া যায় তখনই সুরু হয় দেখা কোথায় কি রত্ন সে-স্রোত রাখিয়া গেল, কোথায় কি বা লইয়া গেল, কোথায় বা ভাঙন ধরাইয়া দিল।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেখিলেও স্বরধুনীর জীবনবীণার সকল তন্ত্রীই যে নীলাম্বরের মোহন স্পর্শে অনুক্ষণ রণিত হইত, কোথাও মরিচা পড়িবার জো ছিল না, তাহা তিনি এই আনন্দ-নাট্যের যবনিকা পড়িবার পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেমন করিয়া কি ভাষায় তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত হইয়াছিল, পরকে তিনি বলিতে পারিতেন না হয়ত; কিন্তু দিল্লীর দেওয়ানী-আমের গায়ে স্বর্ণাক্ষরে যেমন লেখা আছে "মর্ত্ত্যে যদি স্বর্গ থাকে—তাহা এই, তাহা এই"—তেমনই, তাঁহারও অন্তরের মণিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা ছিল 'মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ কোথায় জান? তাহা এই মাটির ঘরে, নীলাম্বরের অনুরাগ-উজ্জ্বল দৃষ্টিতে, মুগ্ধ হাসিতে, সপ্রেম স্পর্শতেই।'

সুরধুনীর সে সুখস্বর্গ অকালে অন্ধকার করিয়া দিয়া নবীন বয়সেই নীলাম্বর অন্য স্বর্গের সন্ধানে যাত্রা করিলেন। পাঁচটি মাত্র বৎসরের ইতিহাস স্বামীর ভিটা হইতে বুকে করিয়া যখন তিনি আবার পিতৃগৃহে নামিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, সমস্ত জীবনকে অতীতে ফেলিয়া আজ তিনি অন্য একটা অপরিচিত পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লইয়াছেন; তাঁহার দেহমনপ্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পৃথিবীর রূপ রস স্পর্শ এতদিন প্রাণবায়ুর মত বিচরণ করিত সে পৃথিবীর স্মৃতির সৌরভটুকু মাত্র এখানে আছে, আর কিছু নাই। সত্যই তিনি নবজন্ম লাভ করিয়াছেন; নহিলে কোথায় গেল সেই সুরধুনী, যাহার দৃষ্টিতে হাসিতে কথায় স্বামী-সৌভাগ্যের গৌরব ঝলকিয়া উঠিত? কোথায় আজ সেই অভিমানে-স্ফুরিত-অধরা সুরধুনী, স্বামীর এক মুহূর্ত্তের আনাদরে যাহার ডাগর চোখে ছিন্নসূত্র মুক্তামালার মত জলবিন্দু টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অঝোরে ঝরিয়া পড়িত? মনে এতটুকু বেদনার আঘাত লাগিলে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া যে শিশুর মত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিত, একমাত্র তাঁহারই সান্ত্বনায় যাহার অশ্রুধৌত মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত, সেই গরবিণী স্বামীসোহাগিনী সুরধুনী আজ কই?

পিতার ভিটায় দাঁড়াইয়া সুরধুনীর মনে হইল, যেন স্বামীর সঙ্গে আপনাকেও সে সেই শ্বশুরবাড়ীর শ্মশানে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছে। আজ পৃথিবীর দিকে যে সুরধুনী চোখ তুলিয়া চাহিয়াছে, পিতৃহীন দুইটি সন্তানের সকল ভার লইয়া যে দাঁড়াইয়াছে, সেই সর্বহারা ভিখারিণী ত অন্য মানুষ, অন্য পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। নহিলে পৃথিবীর মানুষগুলার হাঁটা-চলা তাহার নিকট ভোজবাজি কেন মনে হইতেছে? কেন মনে হইতেছে, শ্মশানভূমি হইতে দলে দলে নশ্বর মানব-দেহ দুই-দশ মিনিটের ছুটি লইয়া পথে বাহির হইয়াছে, এখনই গিয়া চিতায় শয়ন করিবে, তাহাদের ওই সযত্নরচিত বেশভূষা প্রসাধনের সহিত ওই নশ্বর দেহ জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইবে। কি আশ্চর্য! এই মানুষগুলা জানিয়া শুনিয়াও কেমন হাসিতেছে, অঙ্গের আভরণ ঘুরাইয়া দেখিতেছে, চুলের নখের দেহের পারিপাট্য সাধন করিতেছে। কিন্তু এক পক্ষ আগে যে-সুরধুনীকে সে দেখিয়াছিল, আজ যাহার চিহ্নমাত্র নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে-সুরধুনীও ত এমনই ছিল। রাঙাপাড় শাড়ী আর হাতভরা চুড়ি পরিয়া আরসির সামনে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কত ছাঁদে কবরী বাঁধিত যে সে[illegible]জানিত পৃথিবীতে সবই নশ্বর, তবু ত তাহার এই তুচ্ছ প্রসাধনে

আনন্দের অবধি ছিল না। এই সামান্য শাড়ীর পাড়, চুলের ফিতা, খয়েরের টিপ, খোঁপার ফুল, এই লইয়া কত রাতের পর রাত সে স্বামীর সঙ্গে আদর-আব্দার মান-অভিমান করিয়া কাটাইয়াছে, তখন তো এগুলা তুচ্ছ মনে হয় নাই।

তবে আর কেমন করিয়া বলা যায় যে সেই সুরধুনী আর তাহার জগৎ আজও এই সুরধুনী ও তাহার জগতের ভিতরই রহিয়াছে। প্রেমপ্রদীপদীপ্ত আপন অন্তরের মণিকোঠায় কঠিন লৌহঅর্গল আঁটিয়া দিয়া নূতন সুরধুনী তাহার নূতন জীবন সুরু করিল। এ-জীবনে শুধু কাজ, শুধু কর্ত্তব্য, শুধু দায়িত্ব। এখানে শ্রান্ত মাথা কাহারও বুকে দুই দণ্ড রাখিয়া জুড়াইবার ঠাঁই নাই, এখানে ক্ষুধিত হৃদয় দুই বাহু তুলিয়া কাহারও কণ্ঠলীনা হইতে যায় না, এখানে দিনশেষে কেহ সুরধুনীর কালো চোখের ভিতর চাহিয়া তাহার নবযৌবনে ঢলঢল মুখখানি মুখের কাছে টানিয়া লয় না।

সুরধুনী চুল ছাঁটিয়া হাতের গহনা ফেলিয়া শুভ্র বাসে আপনার রিক্ত দেহমনকে ঢাকিয়া দিলেন। কিন্তু সেই নবযৌবনা বিংশতি-বর্ষীয়া স্বামীপ্রেম-পাগলিনী সুরধুনী সত্যই মরিল না। সে ঘুমাইয়া ছিল মাত্র। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার ঘুমের ঘোর কাটিয়া আসিতে লাগিল। গভীর রাত্রে দিনের সকল কাজের শেষে আপনার শূন্য কক্ষে রুক্ষমূর্তি কর্মনিপুণা স্বল্পভাষিণী সুরধুনী যখন বিশ্রাম করিতে আসিতেন, তখন আকাশের তারার আলোর ভিতর হইতে তাঁহার নীলাম্বরের নীল নয়নের দৃষ্টি ডাকিয়া তুলিত সেই রূপ-যৌবন-গর্বিতা প্রেমতৃষিতা কলভাষিণী তরুণী সুরধুনীকে। দূর মাঠের প্রান্তে সাঁওতাল পথিকের করুণ বাঁশীর ডাকের ভিতর হইতে ডাকিতে থাকিত নীলাম্বরের কণ্ঠ, এই চিরবিরহিণী স্থিরযৌবনা ঘুমন্ত সুরধুনীকে। জাগিয়া উঠিত তাহার অন্তরের চিরকিশোরী রাধিকা ; যে-প্রেমযমুনায় দেহমন নিঃশেষে সঁপিয়া সে অবগাহন করিয়াছিল, সেই যমুনার মৃদু তরঙ্গ বুকের ভিতর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত, তাহার শীতল গভীর স্পর্শ রাত্রির নিস্তব্ধতার সহিত তাহাকে ঘিরিয়া ধরিত ; কিন্তু অনুভূতি যত স্পষ্ট হইয়া উঠিত স্মৃতি সজাগ হইয়া তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর প্রেমলীলা চোখের উপর তুলিয়া ধরিত, মন ততই হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। হায় রে রিক্ত নারীর মন, শুধু স্মৃতির সুবাসে এই দীর্ঘ দিনের অগণ্য মুহূর্তগুলি যে কিছুতেই ভরে না! দিন আসে দিন যায়,

রাত্রির পর রাত্রি পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে, পৃথিবীর যেখানে যাহা ক্ষয় হইতেছে সবই ভরিয়া উঠিতেছে নূতন সৃষ্টিতে, শুধু শূন্য বিরাট গহ্বর হইয়া পড়িয়া আছে সেই তরুণী সুরধুনীর তৃষিত মন।

প্রেম তাঁহার জীবনে মুকুলিত হইয়াছিল, হইয়া ফলসূচনায় ছিন্নদল পুষ্পের মত ঝরিয়া পড়িবার অবকাশ পায় নাই। তাঁহার বয়সী আর দশজন মেয়ে যৌবনের ভরাবর্ষণের পর শরৎকালের মেঘের মত আপনি হাল্কা হইয়া পৃথিবীর সাত কাজে স্বচ্ছন্দে মাতিয়া আছে। শুধু তাঁহার মনে প্রেমভারানত ঘন মেঘপুঞ্জ বুক জুড়িয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়া গিয়াছে, তাহার ঝরিয়া পড়িবার ক্ষেত্র নাই।

তাই এখনও এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর পরেও এক জায়গায় সুরধুনীর বয়স বাড়িতে পায় নাই। সেই অল্পবয়সের পরিচয়টা মহামায়া ছাড়া আর কেহ বড় পাইতেন না। এবারেও যখন মহামায়া আসিলেন তখন রাত্রে ছেলেপিলে বাপ-ভাই সকলকে খাওয়াইবার পর সুরধুনীর মনটা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, পাছে শ্রান্তিতে মহামায়া ঘুমাইয়া পড়েন। ঘরে ঢুকিয়াই সুরধুনীর গলার স্বর বদ্‌লাইয়া যাইত।

"ও মায়া, ঘুমুলি নাকি রে? তোর সঙ্গে দুটো কথা যে বলব সারাদিনে তার সময় পাই না ভাই।" দিদি যে সারা বছর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে ছেলেমান্‌ষী গল্প করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন এ-কথা মহামায়া খুব বুঝিতেন, তিনি ঘরে ঢুকিয়াই নিদ্রার আরাধনায় মন দিতেন না।

মহামায়া বলিলেন, "না দিদি, ঘুমোব কেন? তোমার সঙ্গে কতকাল পরে দেখা, এখনই ঘুম ত দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে না যে সবার আগে ঘুমোতে বসব?"

সুরধুনী বলিলেন, "তাছাড়া তোর ভাত খেয়ে উঠেই ঘুমোবার অবসর কোথায় বল্! চন্দ্র কত রাত জাগায় রে? বারোটা একটার আগে কিছু ঘুমোস না?"

দিদির শুষ্ক মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। মহামায়া বলিলেন, "পাগল হয়েছ দিদি? এই বুড়ো বয়সে ছেলেপিলের ঝক্কি নিয়ে রাত-জাগাজাগির কথা এখন কি আর মনে আসে?"

সুরধুনী বলিলেন, "থাক্ না বাপু! আমার কাছে আর তোর বুড়ো সাজতে

হবে না। ওসব গিন্নিমি ভাজদের দেখাস্। সারাদিনের পর ছুটিতে কথা কস্ কখন তাহলে? পেট ফুলে মরিস্ না? ছিষ্টির খবর ওকে না শোনালে তো তোর ঘুম হত না। কোথায় আমার চিঠিতে কি ভগ্নীপতির কথা ছিল তা সুদ্ধ ত চন্দ্রের কানে না তুললে চলত না।"

মহামায়া বলিলেন, "বাবা, সে কি আজকের কথা? তখন ছিল সে এক দিনকাল, সারাদিনই মন উস্‌খুস্ করত এক চিন্তায়, এখন সে সব কোথায় উড়ে পুড়ে গেছে তার ঠিক নেই। ছেলে বয়সে কত পাগলামি যে করেছি ভাবলেও হাসি পায়।"

সুরধুনী ববিলেন, "জন্ম জন্ম অমনি পাগলামি কর্ এই আশীর্বাদ করি। আমাকে যতই লুকোস্, তোকে চিনতে আমার বাকী নেই। হ্যাঁ রে, গয়না কাপড় এখনও সব ওর হুকুমমত করিস্? পুরুষ মানুষের পছন্দ তোর পছন্দ হয়? এই ত নূতন চুড়ি গড়িয়েছিস্ দেখছি, কার পছন্দ এটা?"

মহামায়া বলিলেন, "বিয়ের পর দু'চার বছর সব পুরুষমানুষই স্ত্রীর গয়না কাপড় বাছতে বসে, এটা পর সেটা পর ক'রে অস্থির করে, তা বলে চিরকালই কি আর সেই ধরণ বজায় থাকে? এখন আমি থাকি আমার ধান্দায়, তিনি থাকেন তাঁর ধান্দায়, সারাদিনে কে কার খোঁজ রাখে?"

সুরধুনী বলিলেন, "মন যাদের এক সুতোয় বাঁধা থাকে, তাদের মন-জানাজানি হতে এক লহমাও লাগে না। চোখের ভিতর একবার তাকালে কার মনের কি সাধ তা কি আর জানতে বাকী থাকে?"

মহামায়া মনে মনে ভাবিলেন রক্তমাংসে গড়া স্বামীটি কৈশোর-লীলা শেষ করিয়া সংসারের বৈচিত্র্যময় কর্মক্ষেত্রে নামিবার পূর্বেই বিদায় লইয়াছেন বলিয়া দিদি পুরুষমানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্ত্রীর স্থান কোন্‌খানে তাহা এত বয়সেও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সারাদিনের হাঙ্গামে চোখ আছে কি নেই তাই তাদের মনে থাকে না, তার আবার চোখের ভিতর তাকাচ্ছে। সবাই বেঁচব'র্তে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, এইটুকু খবর ছাড়া আর বেশী খোঁজ নেবার সময় কি আর সদাসর্বদা হয়?"

অবশ্য স্বামীকে যতখানি নীরস ও নিরাসক্ত করিয়া দিদির কাছে মহামায়া চিত্রিত করিলেন তাঁহার স্বামী ঠিক তাহা ছিলেন না। দিনান্তে স্ত্রীর নিকট একবার করিয়া প্রেমঅর্ঘ্য দিতে তিনি আসিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন-

যাত্রাপথে সঙ্গিনীর সান্নিধ্যটা তিনি সর্বদাই অনুভব করিয়া চলিতেন। দিনশেষে তাঁহার এই পথচলার গান মহামায়াকে না শুনাইলে তাঁহার পথচলা সার্থক হইত না। কাব্যচর্চাই হউক কি অধ্যয়ন-অধ্যাপনাই হউক, সকল বিষয়েই তাঁহার চিন্তার ধারা যেদিকে প্রবাহিত হইত এবং কার্য্য-প্রণালী যেভাবে চলিত তাহা তিনি মহামায়াকে বলিয়া যাইতেন, যেন আত্মচিন্তাকে ধ্বনিতে রূপ দিতেছেন এই ভাবে। সকল কথাই যে মহামায়া ঠিক স্বামীর মাপকাঠিতে মাপিয়া বুঝিতেন তাহা নয়, তবু মহামায়ার মুখের ভাবে প্রশংসা ও স্বামীগৌরবের দীপ্তি দেখিলেই চন্দ্রকান্ত তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু এ সকল নিজেদের অন্তরঙ্গ জীবনের কথা দিদিকে বলিতে মহামায়ার লজ্জা করিত। তাছাড়া দিদি স্বামী বলিতে এখনও পুরুষমানুষের অপরিণত বয়সের একটা যে বিশেষ রূপকে চিনিতেন এবং তাহাকেই আপন মনের প্রেমঅর্ঘ্য দিয়া সাজাইতেন, মহামায়ার স্বামী পুরুষ-জীবনের সে অবস্থার পর অনেকখানি পরিণতি লাভ করিয়াছিলেন। বিস্মৃতপ্রায়, ছায়াময় এবং অনেকখানি সুরধুনীর স্বরচিত নীলাম্বরের পাশে এই পরিণতবুদ্ধি, জীবন্ত ও সর্বতোমুখী-প্রতিভাবান্ চন্দ্রকান্তকে দাঁড় করাইলে সুরধুনী ঠিক দুজনের ওজন বুঝিবেন কিনা মহামায়ার সন্দেহ হইত।

দিদিকে তিনি নিজের চেয়ে অনেখানি ছেলেমানুষ এই দিক্‌টায় ভাবিতেন। যদিও দিদি এত বড় একটা বিরাট সংসারের কর্ত্রী, এবং দুইটি বয়স্ক ছেলের মা, তবু দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা নবপরিণীতা কিংবা অবিবাহিতা কিশোরীর মত।

সুরধুনী একটু নিরাশ হইয়া বলিলেন, "মায়া, তুই সেদিনের মেয়ে আর আমি বুড়ো বুড়ো ছেলের মা। কিন্তু তোরই বয়স বেড়েছে, আমার মনে এ জন্মে আর পাক ধরবে না। আগে বছরকার সময় তোর আশাতে থাকতাম, কিন্তু এখন দেখছি তুই আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছিস্। পৃথিবীতে আমি এখন একেবারে একা।"

সুরধুনীর সহিত গল্প করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, বাহিরে ঝিঁঝিঁর তীক্ষ্ণ ডাকও ক্রমে মৃদু হইয়া আসিতেছে, বহু দূরে দুই-একটা শিয়াল কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া এখন নীরব হইয়া গিয়াছে। মহামায়ার দুই চোখে ঘুম ভরিয়া আসিয়াছে, এমন সময় মায়ের ডাক শুনিতে পাইলেন, "ও মায়া, ও সুরো, তোরা ঘুমোলি বাছা?"

সুরধুনী আগেই উঠিয়া বসিয়া ভীত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "এত রাত্রে মা কেন ডাকাডাকি করছেন? পুরনো ফাটা বাড়ী, সাপখোপ বেরোল নাকি কে জানে? রাজ্যের ছেলে মেয়ে ত শুয়েছে চারপাশে।"

বলিতে বলিতেই ঘরের কোণের অর্দ্ধনির্বাপিত হারিকেন আলো এবং দেয়ালে-ঠেসানো একটা পেয়ারা গাছের ছড়ি লইয়া তিনি ছুটিলেন।

মহামায়াও দ্রুত দিদির পিছনে চলিলেন। ভুবনেশ্বরীর ছাপর খাটে বিচিত্র ভঙ্গীতে কুণ্ডলী পাকাইয়া এ উহার ঘাড়ে পা দিয়া ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেবল সুধা ও আর একটি মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় চোখ বাহির করিয়া ভীত বিস্মিত মুখে উঠিয়া বসিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে প্রদীপের আলোতে বড় বড় ছায়া পড়িয়া ঘরটা রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর মাথার কাছে কাঠের ময়ূর-মিথুনের গা স্বল্প আলোতেও চকচক করিতেছে। যেন শিশুদের ভীতি দেখিয়া তাহারাও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সুরধুনী মাতার মুখের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "কি হয়েছে মা? অমন ডাকাডাকি করছিলে যে? স্বপনটপন কিছু দেখেছ বুঝি? শোও শোও, এখনও অনেক রাত।"

মা শুইয়া রহিলেন, কোনও জবাব দিলেন না।

মহামায়া কোলের কাছে ঘেঁসিয়া মার মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কথা বল মা! কি হয়েছে তোমার, অসুখ করেছে?"

মা বলিলেন, "ছেলেপিলেগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যা, আর তোর বাপকে একবার ডেকে দে।"

মহামায়া বলিলেন, "তা নয় ডাকলাম, কিন্তু কি হয়েছে আগে বল।"

মা বলিলেন, "শরীরটা ভাল লাগছে না, একটা পাশ অবশ হয়ে এসেছে। আমার বোধ হয় আর দেরী নেই।"

"কি যে বল মা, তার ঠিক নেই" বলিয়া স্থরধুনী বৈঠকখানা ঘরে লক্ষ্মণচন্দ্রকে ডাকিয়া তুলিতে গেলেন। তাঁহার ডাকাডাকিতে পাশের ঘরে ভাই-ভাজদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বড়বৌ ও মেজবৌ অর্দ্ধমুদিত চক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বড় ভাই কোমরের কাপড়টা আঁটিতে আঁটিতে গর্জাইতে গর্জাইতে বাহির হইলেন, "দুপুর রাত্রে সব হৈ হৈ লাগিয়ে দিয়েছে, ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়ীতে? আচ্ছা হ্যাঙ্গাম! খেটেখুটে এসে একটু ঘুমোবার জো নেই।"

স্থরধুনী বলিলেন, "মা'র অসুখ করেছে দেখতে পাচ্ছ না? শুধু শুধু কি আর তোমাদের কাঁচা ঘুমে বাগড়া দিতে গিয়েছিলাম?"

মেজ ভাই বলিলেন, "কি হয়েছে মা? আবার বুঝি ঐ ছাইভস্ম গুগলিফুগলি খেয়ে পেট নামিয়েছে! যত বারণ করি যে বুড়ো বয়েসে ওসব জঞ্জালগুলো গিলো না, তত তোমার ওই দিকেই লোভ।"

মহামায়া বলিলেন, "না দাদা না, পেট নামায় নি, তার চেয়ে বেশী অসুখ। গায়ে হাত দিয়ে দেখ। একটা দিক্ যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। কবরেজ মশায়কে ডাকলে হত।"

বড় ভাই বলিলেন, "এই তিন পহর রাতে তাঁকে আনা কি সহজ? কাল সকালবেলা ডেকে আনব'খন। রাতটা চুপচাপ ক'রে কোনও রকমে কাটিয়ে দাও।"

লক্ষ্মণচন্দ্র ততক্ষণে শিয়রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্থরধুনী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, রাত কাটানো টাটানো কোনও কাজের কথা নয়। তুমি যেমন ক'রে হোক একবার খবর দাও।"

অগত্যা মেজ ছেলে গোপাল গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া লণ্ঠন লইয়া জনহীন পথে অগ্রসর হইলেন। গৃহিণী ভুবনেশ্বরী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কবরেজের বড়িতে আমার কিছু হবে না গো। আমার ডাক এসেছে, আজকের তিথিটা দেখ আর তুমি একবার পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে দাও, তোমার কাছে জ্ঞানে অজ্ঞানে কত দোষ করেছি ক্ষমা ক'রো।"

লক্ষ্মণচন্দ্র ভুবনেশ্বরীর মাথার কাছে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি ঘসাকাচের মত বর্ণহীন স্থির হইয়া গেল, লোলচর্ম যেন মুহূর্তে আরও ঝুলিয়া পড়িল। স্ত্রীর একখানা হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করবার মালিক কি আমি, ভুবন? তোমার কাছে আমি নিজেই কত অপরাধ করেছি তার লেখাজোখা নেই। শান্ত হও, ওসব কথা ভেবে মনকে অকারণ কষ্ট দিও না।"

গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ আসিতে আসিতে ভোরের মুক্তাস্বচ্ছ আলো ফুটিবার উপক্রম করিল। নাড়ী দেখিয়া তিনি একটাও কথা বলিলেন না, ঘরের বাহিরে আসিয়া একটা বড়ির ব্যবস্থা করিয়া নিঃশব্দে তখনই চলিয়া গেলেন। সুরধুনী চোখে আঁচল দিয়া অশ্রুরোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে-মৃত্যু প্রথম যৌবনে তাঁহার সুখস্বর্গের নন্দনকানন দুই পায়ে বিদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই মৃত্যু আজ আবার শিয়রের কাছে হানা দিয়াছে, যে-গৃহে প্রথম পৃথিবীর আলো চোখে পড়িয়াছিল, যে-গৃহে মৃতপ্রায় প্রাণ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়াছিল, সে-গৃহের মূলও আজ যমরাজ উপাড়িয়া লইয়া যাইবেন। ভুবনেশ্বরীকে যাইতে হইবে, আর দেরী নাই। মহামায়ার প্রাণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কিছু একটা কর। আর কিছুদিন, অন্ততঃ কিছুক্ষণ যাতে ধ'রে রাখা যায় তার উপায় করা যায় না? এই বড়ি ছাড়া আর কিছুই কি করবার নেই?"

অকস্মাৎ কালপ্রবাহের তুচ্ছ মুহূর্তমালার প্রত্যেকটি গ্রন্থি যেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পলায়নপর প্রাণশক্তিকে তাহারাই যে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই সুদীর্ঘ অতীতকাল ধরিয়া যে-জীবন এতবড় গোষ্ঠীর প্রত্যেক ছোট-বড়র কাছে মহাসত্য ছিল, এই কয়েকটি মুহূর্তের পর ভবিষ্যৎ কালপ্রবাহে সে চিরদিনের জন্য মিথ্যা হইয়া যাইবে। যত দিন যাইবে, ততই তাহার স্মৃতির কণা পর্যন্ত অতীতের অতল অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাইবে। এই যে কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র প্রাণময়ীকে চোখে সত্য বলিয়া দেখা যাইতেছে, স্পর্শে সত্য বলিয়া অনুভব করা যাইতেছে, কর্ণে সত্য বলিয়া শোনা যাইতেছে, ইহার পরেই সব মিথ্যা! এই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে অতীত স্মৃতির ও বর্তমানের সমস্ত সত্য পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূল্যের কি তুলনা আছে?

ভুবনেশ্বরী স্বামীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে পুত্রকন্যাদের মুখের দিকে সস্নেহ স্থিরদৃষ্টি তুলিয়া চলিয়া গেলেন। কন্যারা কাঁদিয়া মায়ের বুকের উপর শিশুর মত আছড়াইয়া পড়িল। মায়ের তুষারের মত কঠিন শীতল দেহ এই বুকফাটা বিলাপে কোনও সাড়া দিল না। ছেলেরা মাথার কাছে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণচন্দ্র ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার জীবনের অবসান যেন তিনি চোখে দেখিতে লাগিলেন। জীবনের পঞ্চান্নটা বৎসর যে সূত্রে এই মুহূর্ত পর্যন্ত বর্তমানের সহিত গাঁথা হইয়াছিল তাহা ছিঁড়িয়া অতীতের গহ্বরে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু কই, জীবনে যাহা-কিছু করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহার অনেক কিছুই ত করা হইল না! আর সময়ও ত নাই। ভবিষ্যতের তুচ্ছ কয়েকটা দিন মাত্র এখন জীবন বলিয়া চোখের সম্মুখে ঊর্ণনাভের জালের মত দুলিতেছে। কত সাবধানতা, কত যত্ন, কত হিসাব করিয়া যে-জীবনকে এতদিন ধরিয়া রাখা হইয়াছে, আজ এক মুহূর্তে মনে হইতেছে এই সাবধানতা, এই আগলানো, এ কি অদ্ভুত হাস্যকর ছেলেমানুষী! এই ক্ষণভঙ্গুর কাচের মত জীবন-পাত্র দুই-চার মুহূর্ত বেশী থাকিলেই বা কি, কম থাকিলেই বা কি! অনন্ত অতীতের সমাধিতলে সেই কমবেশীর মধ্যে তারতম্য কিছু আছে কি? কত সহজে কত অনায়াসে সকলের জাগ্রত দৃষ্টির পাহারার উপর দিয়া মৃত্যু তাহার পাওনা নিঃশব্দে অদৃশ্য হস্তে লইয়া গেল। কেহ ত বাধা দিতে পারিল না!

মেয়েরা ভুবনেশ্বরীর সীমন্তে সিঁদুর ঢালিয়া রাঙা করিয়া দিল, চরণে অলক্তক লেপিয়া দিল। ছোটবড় শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলে পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গৃহলক্ষ্মীকে মহাযাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিল। বেদনায় সকলের মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বিস্ময়ে ভয়ে শিশুদের কচিমুখে ডাগর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সুধা মায়ের আঁচল চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মা গো, দিদিমাকে কোথায় নিয়ে গেল? আর দিদিমা ফিরে আসবে না?”

মহামায়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “না মা, আর কেউ আসে না; স্বর্গে চ’লে গেলেন যে!”

সুধা বিস্মিত চক্ষে পথের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, ‘এই কি স্বর্গের পথ? এত সহজ! এই যারা দিদিমাকে স্বর্গে পৌছাতে যাচ্ছে, তারা ত

আবার আসবে, তবে কেন দিদিমা আসবেন না ?' কিন্তু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না।

চন্দ্রকান্ত লিখিয়াছেন,

"মাকেই বিশেষ ক'রে দেখতে গিয়েছিলে, মা ত তোমাদের ফেলে চ'লে গেলেন। ওখানে তোমাদের মন টিঁকছে না জানি। তবে বাবার আর দিদির মুখ চেয়ে কয়েকটা দিন থাকতেই হবে। তারপর তোমরা চ'লে এস। মায়ের সঙ্গে নাড়ীর প্রথম বন্ধন ; তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী যে অন্ধকার লাগবে, জীবনটা অর্থহীন পরিহাস মনে হবে, এ ত বলাই বাহুল্য। কাছ থেকে মৃত্যুকে অনেক দিন দেখ নি, কিন্তু জান ত, প্রত্যেক মুহূর্তেই মানুষ দলে দলে যমযাত্রা করছে। অনাত্মীয়ের মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুর সর্বনাশা রূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে দেখতে হলে যতখানি মমতা নিয়ে দেখা দরকার, ততখানি ত আমাদের নেই। পরের শোক-দুঃখ দেখবার সময় আমাদের চোখের উপর এমন একটা আবরণ টানা থাকে যে তার সমগ্র রূপটা আমরা কিছুতেই দেখতে পাই না। আজ যখন শিয়রের কাছে মৃত্যু হানা দিয়ে বলছে—যেতে হবে, এমনই ক'রে এই মায়া-মমতা-ভরা সংসার, শিশুর মধুর হাসি, প্রিয়জনের গভীর একাত্মতার বন্ধন, সমস্ত ফে'লে চ'লে যেতে হবে, তখন বুঝতে পারি, একটি মাত্র প্রাণ চ'লে যায় কত মানুষের অসংখ্য দিনের কত ছোট-বড় সংসার-রচনাকে একদিনে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে। দীর্ঘদিন ধ'রে শৈশব যৌবন কৈশোরের কত ঘটনা, কত চিন্তা, কত কার্য্যের মধ্যে দিয়ে পলে পলে আপনাকে এবং পারিপার্শ্বিক জগৎকে যে গ'ড়ে তুলছি, শত্রুমিত্র সকলের অন্তরে যে আপনাকে প্রতিদিন সৃষ্টি ক'রে চলছি, আবার আপনার মাঝখানে জগৎকে যে প্রতিদিন নানারূপে গ্রহণ ক'রে সঞ্চয় ক'রে চলেছি, পার্থিব জগতের সঙ্গে এই আমার সুবিস্তীর্ণ সম্পর্ক কালের একটি ফুৎকারে শেষ হয়ে যাবে।

"তোমাকে বেশী কথা বলব না, আজ তুমি আমার চেয়ে বেশী স্পষ্ট ক'রে সত্য ক'রে পার্থিব জীবনের মূল্য বুঝতে পারছ। জগতের বিরাট প্রাণ-প্রবাহের কত ছোট ছোট এক-একটি প্রাণ-স্পন্দন মাত্র যে আমরা, তা ত সমগ্র মন

দিয়ে আজ অনুভব করছ। যে মা আজ নেই, তিনি যেন কোনও দিনই ছিলেন না, পৃথিবীর নিয়মে অচিরে সেইটাই বড় সত্য হয়ে উঠবে। এর চেয়ে বড় দুঃখ সন্তানের পক্ষে কি আছে?"

এবার পূজায় বাপের বাড়ী যাইবার সময় হইতেই মহামায়ার শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। ননদ হৈমবতী বলিয়াইছিলেন, "বৌ, এবার তোমার ওখানে গিয়ে কাজ নেই। শরীরটার ভাবগতিক দিন কতক বুঝে নাও, তারপর এক সময় গেলেই হবে।"

কিন্তু মহামায়ার কেমন মনের ভিতরটা ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, তিনি না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। যাইবার সময় হৈমবতী তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় বলিয়া দিলেন, "বৌ, তুমি ছেলেপুলের মা, তোমাকে ত সাত কথা ব'লে বোঝাবার দরকার নেই? নিজের অবস্থা আন্দাজ ত করেছ খানিকটা, সাবধানে চলাফেরা করবে। যেন একটা কিছু বাধিয়ে ব'সো না।"

কিন্তু খুব সাবধানে চলাফেরা করা সম্ভব হইল না। মায়ের এরকম আকস্মিক মৃত্যুতে সংসার হঠাৎ যেন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। একে বহুকালের নিয়মে বাঁধা সংসার, এবং তদুপরি দিন আসিলে দিন যাইতেই বাধ্য হয়, কাজেই একরকম করিয়া দিন কাটিতেছিল। কিন্তু সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া ছিলেন ভুবনেশ্বরী এবং দাঁড় ছিল সুরধুনীর হাতে। ভুবনেশ্বরী ত চলিয়াই গেলেন, সুরধুনীর দৃষ্টিও এই আকস্মিক কঠিন আঘাতে তুচ্ছ বর্তমান হইতে সরিয়া সুদূর অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতে প্রসারিত হইয়া গেল। কর্মের জগৎ হইতে এক নিমেষে চিন্তার জগতে তিনি চলিয়া যাওয়াতে সংসার কেবলই টাল খাইয়া চলিতে লাগিল। তাহার উপর অশৌচের নিয়ম পালন।

মহামায়া ও সুরধুনী বিবাহিতা কন্যা। তাঁহাদের নিয়মভঙ্গ চার দিনেই করা যায়, কিন্তু সুরধুনী বলিলেন, "এক বাড়ীতে ব'সে ভাইয়ের এক রকম, বোনের এক রকম চলবে না। মা কি আমাদের কম মা ছিলেন? আমাদের সব নিয়ম একসঙ্গেই ভঙ্গ হবে।"

চার দিনের দিন মৃণালিনী বলিলেন, "ছোট্‌ঠাকুরঝি, তুমি এয়োস্ত্রী মানুষ, আজ দুটো মাছভাত মুখে দিতে হয়।"

মহামায়া বলিলেন, "না ভাই, তোমাদের সঙ্গে সব করলে আমার পাপ হবে না। আজ আমার ওসবে কাজ নেই।"

শীত অল্প অল্প পড়িয়াছিল, একতলার ঘরের মেঝে বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা। মেজছেলে গোপাল বলিলেন, "এই সময় মাটিতে শুয়ে সবাইকার যে বাত ধ'রে যাবে। খাটের উপর একখানা ক'রে কম্বল পেতে শুলে ত হয়।"

শুনিয়া লক্ষ্মণচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মা'র জন্যে এ জন্মে আর ত কিছু করবার রইল না, দশটা দিন মাটিতে শুতেও কুলপাবনরা পারবে না? আমি মরলে ঠ্যাঙে দড়ি দিয়ে ফে'লে দিস্। কিন্তু আমার চোখের উপর তাঁর কাজে কোনও ত্রুটি আমি ঘটতে দেব না।"

মাটিতে খড় পাতিয়া তাহার উপর কম্বল বিছাইয়া সকলের শুইবার ব্যবস্থা হইল। চিরকাল সুখশয্যায় অভ্যস্ত শরীর অত্যন্ত কাতর বোধ করিতে লাগিল। গায়েও কম্বল ছাড়া দিবার কিছু জো নাই, কিন্তু সকলের জন্য কম্বল ত জুটে নাই, কেহ পাতিবার কম্বলখানাই ঘুরাইয়া আধখানা গায়ে দিলেন, কেহ আঁচল মুড়ি দিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আপনার শরীরের সাহায্যেই শরীরের তাপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। সুরধুনী ও মহামায়া একখানা কম্বলের তলাতেই আশ্রয় লইলেন। ছোট ছেলেদের অত নিয়মের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এমন একটা দুর্ঘটনার পর সুধা ও শিবু যে মাকে ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। তাহারাও সেইখানেই আসিয়া আশ্রয় লইল। সারারাতই শিবু 'শীত' 'শীত' করিয়া মায়ের গায়ের কাপড় ধরিয়া টানাটানি করে। পাছে সুরধুনীর গা আল্‌গা হইয়া যায় কি ঘুম ভাঙিয়া যায়, এই ভয়ে মহামায়া নিজে প্রায় অনাবৃত থাকিয়া শিবুকে কম্বল চাপা দিয়া রাখিতেন।

শীতের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়া আপনি শুষ্ক হইয়া উঠে, তাহার উপর গায়ে মাথায় তেল নাই। পুকুরঘাট হইতে স্নান সারিয়া ভিজে কাপড়ে আসিতে আসিতে মুখ-হাত-পা যেন চড় চড় করিয়া ফাটিয়া উঠিত, এমন কি গা-টায় পর্যন্ত জ্বালা ধরিয়া যাইত। ফাটাগায়ে রাত্রে কম্বলের রোঁয়াগুলা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিত। মহামায়ার গা-হাত-পা ফাটার ধাত আর সকলের চেয়ে বেশী, তাঁহার মনে হইত সর্বাঙ্গ যেন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। ঘুম নয় ত, নরকযন্ত্রণা! থাকিয়া থাকিয়া তিনি

বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেন। দুই হাতের তেলোয় মুখখান রাখিয়া যতখানি ঘুমানো যায়, অনেক সময় তাহার চেয়ে অধিক ঘুম অদৃষ্টে ঘটিত না। সেই অর্ধ ঘুমের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া মা'কে মনে পড়িয়া দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন বহিয়া যাইত। মহামায়াকে কাঁদিতে দেখিয়া সুধা ও শিবু ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিত। মায়ের চোখে জল দেখা তাহাদের অভ্যাস নাই। অন্ধকার রাত্রে নীরবে সুধা ধীরে ধীরে মায়ের গায়ে হাত বুলাইত আর নিরুপায় হইয়া ভাবিত, "কেন মা'কে আমি দুঃখ ভোলাতে পারছি না। ভগবান এমন নিষ্ঠুর কেন যে দুঃখের প্রতিকারের কোনও উপায় রাখেন না?"

শিবু জাগিয়াই মা'কে সজোরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিত, যেন বলিতে চাহিত, "আমি ত রয়েছি তোমার আশ্রয়। ভুলে যাও আর সব দুঃখ।" কিন্তু ভাষায় এ-কথা ব্যক্ত করিবার শক্তি তাহার ছিল না। তবু ঘুমে জাগরণে সারারাত্রি সে এক হাত দিয়া মহামায়াকে ধরিয়া রাখিত।

ভুবনেশ্বরীর শ্রাদ্ধের পর মহামায়া যখন ছেলেমেয়ে লইয়া উদাস মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন দরজার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হৈমবতী তাঁহাকে দেখিয়া ত অবাক্। মহামায়া মুখ নীচু করিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, মুখ নীচু করিয়াই ঘরে ঢুকিলেন, কাহারও দিকে এই শোককাতর ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতে তিনি পারিতেছিলেন না। যে-ভাষায় তিনি স্বীয় ঘরসংসারের নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন, সেই ভাষা আজ ত মুখ হইতে বাহির হইবে না!

হৈমবতী বিনাইয়া বিনাইয়া কথা বলিতে পারিতেন না, সোজা গিয়া মহামায়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এ কি বৌ, এ কি হয়ে গিয়েছ কি? এই রকম চেহারা মানুষের হয়?"

মহামায়ার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার চোখের জল দেখিয়া বিব্রত হইয়া আপনার দুর্বলতাকে চাপা দিবার জন্য আরও শক্ত করিয়া হৈমবতী বলিলেন, "মা ত সকলেরই যায়; আমাদেরই কি যায় নি? তাই ব'লে তোমার মত দশা ত কারুর হতে দেখি নি। এস, এস, ঘরে এসে ব'সে জিরিয়ে নিয়ে মুখে দুটো দাও, ঘরসংসারের দিকে তাকাও। মা সতীলক্ষ্মী তোমাদের সকলকে রেখে, বাবাকে রেখে, তাঁর কোলে মাথা দিয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে গিয়েছেন, তাঁর জন্যে মুখ কালি ক'রে চোখের জল ফেলছ কেন? এর চেয়ে ভাল ক'রে কি কেউ যেতে পারে? এই দেখনা আমার দশা, ঠেঁটি প'রে ভাতে ভাত গিলছি; এই বাঁচা কি বড় সুখের বাঁচা হ'ল? কত মরণ দেখেছি, কত আরও দেখব, তিনি কিছুই দেখলেন না, তাঁর মত পুণ্যের জোর কার আছে? যমের মুখের কাছে কলা দেখিয়ে গিয়েছেন।"

মহামায়া হৈমবতীকে চিনিতেন, তাঁহার এই রুক্ষ ভাষাই যে অনেক অশ্রুসজল সান্ত্বনার বাণী অপেক্ষা বেশী স্নেহকোমল উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহা তিনি জানিতেন। মনে একবার তবুও খোঁচা লাগিল, মা যতই

ভাগ্যবতীর মত যান, তবু তিনি যে চিরদিনের মত চোখের আড়াল হইয়া গেলেন, মরজগতে তাঁহার কোনও চিহ্ন রহিল না, ইহা কি কম দুঃখ!

হৈমবতী কিন্তু মহামায়াকে সহজ না করিয়া ছাড়িতে চাহেন না। জিনিসপত্রগুলা অর্ধেক নিজেই টানিয়া ঘরে তুলিয়া বলিলেন, "নাও গাড়ীর কাপড়খানা ছাড় দেখি! যা বলেছিলাম তাই ত ঘটেছে দেখছি। আমার চোখে কিছু এড়ায় না; এমনি অবস্থায় না খেয়ে না ঘুমিয়ে শরীরের যা হাল করেছ তাতে পেটের কাঁটাটা বাঁচলে হয়। এত অসাবধান কেন? টের পাও নি কিছু?"

মহামায়া এতক্ষণে কথা বলিলেন, "পেয়েছি, কিন্তু অমন সময় কি মানুষের হুঁশ থাকে?"

হৈমবতী বলিলেন, "হুঁশ যে পেয়াদায় থাকাবে শেষকালে? শরীর কেমন আছে বল দেখি সত্যি ক'রে?"

মহামায়া অগত্যা বলিলেন, "ভাল আর কই আছে? সমস্ত বাঁ দিক্‌টা একটানা ব্যথা হয়ে রয়েছে, একবারও ছাড়ে না।"

হৈমবতী গালে হাত দিয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে! ও-ব্যথা কি আর আজ ছাড়বে? ও এখন রইল সাত মাসের মত শরীর জুড়ে। সব ব্যথা একসঙ্গে শেষ হবে।"

পুরাতন আবেষ্টনে ফিরিয়া আসিয়া মহামায়া অনেকখানি প্রকৃতিস্থ বোধ করিতেছিলেন, সংসারের যত কাজকর্ম তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সকলে যেন ভিড় করিয়া আসিয়া বলিতেছে, "মৃত্যুর চেয়ে জীবনের দাবী বেশী। অবসর কালে রাত্রির অন্ধকারে তুমি মৃত্যুর মুখ চাহিয়া কাঁদিতে পার, কিন্তু এখন জীবনকে প্রতি মুহূর্তে তাহার পাওনা মিটাইয়া দিতে হইবে। মৃত্যু দস্যুর মত এক মুহূর্তে তাহার সমস্ত লুণ্ঠন শেষ করিয়া লইয়াছে, কিন্তু জীবন সুদখোর মহাজনের মত পলে পলে তাহার সুদের হিসাব মিটাইয়া মিটাইয়া অগ্রসর হয়। তাহাকে এতটুকু ফাঁকি দিবার উপায় নাই। যেখানে দুই দিনের দেনা জমিয়াছে সেখানে সুদের হারে তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত বলিতেন, "তোমার মন ক্লান্ত, শরীর অসুস্থ, তুমি এত কাজের বাঁধনে নিজেকে জড়াচ্ছ কেন?"

মহামায়া ভাবিতেন, "কাজে আমি কি সাধ ক'রে জড়াই? এ বয়সে কাজের সহস্র বাহু হয়, সে আপনি আমাকে জড়িয়ে তার গহ্বরে পুরে নিচ্ছে, আমার মুক্তি কোথায়? জীবনে যে-কাজের বীজ বপন করেছি, তার ফসল কাটা পর্যন্ত কাজ আমায় ছাড়বে কেন?"

গৃহিণীর ক্লান্ত শরীরমন দেখিয়া চন্দ্রকান্তের মন দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হইত; কিন্তু আবার তিনিই হয়ত আসিয়া বলিতেন, "ছেলেটার বড় সর্দির ধাত হচ্ছে, ওকে স্নানের সময় ভাল ক'রে রোদে ব'সে তেল মাখিও। সুধা বড় হয়ে উঠল, এখন একটু লেখাপড়া ত শিখতে হবে। যখন আমি বাড়ী থাকব আমিই দেখব, অন্য সময় তুমি রোজ যদি ওকে একবার বইখাতা নিয়ে না বসাও ত সব ভুলে যাবে।"

মহামায়া হাসিতেন, বলিতেন, "আমার বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছ। এইবার শরীর ঠিক সারবে।"

চন্দ্রকান্ত নিজে একহাতে সংসারের সমস্ত কর্তব্য করিতে পারেন না বলিয়া মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেন।

মহামায়ার কাজ কমিবার বদলে প্রত্যহই বাড়িয়া চলিত। সংসার আছে, স্বামী আছেন, দুইটি পুত্রকন্যার শরীরমনের সকল অভাব মোচন আছে, তাহার উপর তৃতীয়টির অভ্যর্থনার জন্যও ত কিছু আয়োজন করা প্রয়োজন আছে!

সমস্ত দিনের কাজের শেষে বাক্স আলমারী ঘাঁটিয়া কোথায় কত ছোট ছোট বিস্মৃতপ্রায় জামা-কাপড় আছে, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া মেরামত করিয়া আলাদা একটি ছোট বাক্সে জমা করা চলিত। একটার ছেঁড়া হাত কাটিয়া, আর একটার হাত জুড়িয়া, লাল কালো সাদা কাপড়ের তালি দিয়া কত বিচিত্র পোশাকই তৈরি হইত, অবশেষে সবগুলি সেই ক্ষুদ্র বাক্সে গিয়া আশ্রয় লইত।

এত বয়সেও মহামায়া ভাবী সন্তানের জন্য আয়োজন ননদের চোখের সম্মুখে করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। আপনার ঘরের কোণে লুকাইয়া একান্ত একলার তাঁহার ছিল এ সমস্ত কাজ। হৈমবতী মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িলে তিনি বাক্সের ডালা ফেলিয়া দিয়া যেন অন্য কাজে মাতিয়া যাইতেন।

তাঁহার সঙ্কোচকে অগ্রাহ্য করিয়া হৈমবতী বলিতেন, "বৌ, এই শরীরে

রাত জেগে জেগে কি ফকিরের আলখাল্লা সব সেলাই হচ্ছে? ওসব কেন মিছে করছ? ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ছেলে জন্মালে কোনও দুঃখ নেই, তার উপর সব করা যায়। কিন্তু ভগবান না করুন, যদি বিপদ আপদ কিছু হয় তখন ত ব'সে ব'সে ঐ সব পোশাক কোলে ক'রে কাঁদতে হবে! ও দূর ক'রে ফে'লে একটু গা মে'লে শোও দিখি।"

মহামায়া ননদের মুখের উপর জবাব দিতে পারিতেন না, কিন্তু রাত্রির নীরবতার আড়ালে প্রত্যহই তাঁহার নূতন ও পুরাতন কাপড়ের ভাণ্ডার বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ছোট ছোট কাঁথা, ছেঁড়া শালের টুকরায় শাড়ীর পাড় বসাইয়া ঢাকা, মোজা, টুপি জামা, কোনওটাই একেবারে বাদ পড়িল না।

সুধা কত রাত্রে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিয়াছে, মা ছোট ছোট পুরানো জামার পিঠগুলা চিরিয়া দুই ফাঁক করিয়া পাশ মুড়িয়া রাখিতেছেন। কি একটা আসন্ন সুখ কি দুঃখের চিন্তায় মা যেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন। তাহা যে কি, ভাল না মন্দ, ভয়ের না আনন্দের, তাহা মা'কে কিংবা আর কাউকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হয় না। এই বয়সেই সুধা বুঝিতে পারে, মায়ের এই একান্ত একলার নীরব কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে তাহার শিশুসুলভ কৌতূহলকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়ত শোভন নয়।

একদিন ভোর বেলা উঠিয়া সুধা ও শিবু দেখিল, বাড়ীতে অকস্মাৎ রাতারাতি কিসের যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উৎসবের আয়োজন বলিয়া ত মনে হয় না। সকলেরই যেন কেমন চিন্তিত-মুখ, সশঙ্ক দৃষ্টি, অতি-ব্যস্ততার ভাব। সব কথায় সকলে তাহাদের দুই ভাইবোনকে বেশী করিয়া বাদ দিয়া দূরে ঠেলিয়া চলিতেছে। কতকটা যেন দিদিমার মহাযাত্রার দিনের মত।

সুধা তবু অনেক ভয়ে ভয়ে একবার পিসিমার কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, মা কোথায় গেল? কি হয়েছে বল না?"

হৈমবতী অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করিয়া বলিলেন, "মায়ের শরীর একটু খারাপ, ওঘরে আছে, তোমরা তার হাড় জ্বালাতে যেও না, খেলা কর গিয়ে।"

সুধার বেশী করিয়া দিদিমার কথা মনে পড়িয়া গেল। মায়ের শরীর খারাপ? মা তাহাদের ফাঁকি দিয়া অমনই করিয়া পলাইবে না ত? সকলের এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখিয়া তাহাই ত মনে হয়। দিদিমা যেদিন

চলিয়া যান, এমনই মুখই ত সকলের সেদিন হইয়াছিল। সুধা পিসিমার বকুনির ভয় সত্ত্বেও বলিল, "খুব কি অসুখ? একবারটি দে'খেই চলে আসব। আমি একটু যাই।"

পিসিমা এক তাড়া দিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষের গিন্নিগিরি না করলেই নয়? তুমি দেখে কি অসুখ সারিয়ে দেবে? যাও এখান থেকে বলছি, কথার অবাধ্য হবে না।"

সুধা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সমস্ত মনটা মা'কে ঘিরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকালে উঠিয়া একবারটি মাকে দেখিতে পাইল না, এমন কি অসুখ মায়ের করিয়া থাকিতে পারে? দূর হইতে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল, ছোট ঘরের জিনিসপত্র টানিয়া পিসিমা বড় ঘরে আনিয়া জড় করিতেছেন। পেয়ারা-তলার কাছে একটা কাঠের উনান জ্বালিয়া মস্ত এক হাঁড়ি গরম জল চড়িয়াছে। বাবাও রাত থাকিতে কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছিলেন, বেলা করিয়া এক বোঝা ওষুধ বিষুধ লইয়া ফিরিতেছেন। তিনিও আজ সুধার সঙ্গে কথা বলিলেন না। তাহাকে সামনে দেখিয়া এমন করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া বাবা ত কখনও চলিয়া যান না। আজ যেন সকলের কি হইয়াছে, সকলেই সব কথা তাহাদের লুকাইতেছে।

সমস্ত দিন মনের অস্থিরতায় সুধা বাহিরে খেলিতে পারিল না। বাড়ীরই আশেপাশে মুখ চুন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, যদি কোথাও দিয়া কোনও প্রকারে মাকে দেখা যায়! একবার অনেক কষ্টে জানালা দিয়া দেখিল, মা অস্থির ভাবে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছেন, আবার যেন অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁকিয়া পড়িয়া জানালার গরাদ ধরিয়া কোনও প্রকারে সাম্‌লাইয়া লইতেছেন। মায়ের মুখ দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে সুধার মুখ সাদা হইয়া গেল। সুধাকে দূর হইতে দেখিয়া মা ক্ষীণ হাসির চেষ্টা করিয়া হাত-নাড়িয়া তাহাকে দূরে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সুধা সরিয়া গিয়া বাহিরের বারান্দায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাড়ীর ঝি করুণা সুধাকে কাঁদিতে দেখিয়া কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "ভয় কি সুধা-দিদি, কাঁদছ কেন? মায়ের অসুখ ওসব কিছু না, তোমার নূতন ভাই হবে দে'খো এখন।"

সুধা বিশ্বাস করিতে পারিল না; জন্ম, সে ত নূতন আনন্দের আবির্ভাব,

তাহা কি এমন করিয়া ভয়-ব্যাকুলতার বিভীষিকায় সমস্ত সংসারকে অন্ধকা
ছাইয়া ফেলিতে পারে? মা'র হাস্যচঞ্চল সুকুমার মুখে ওই যে মর্মান্তিব
যন্ত্রণার কঠিন ছায়া, ওই কি নূতনের আগমনের সূচনা? মানুষ কি এমনই
মিথ্যা দিয়া মানুষকে ভুলায়, না সৃষ্টি এমনই বেদনার ফল?

করুণা সুধা ও শিবুকে কোনও রকমে স্নান আহার করাইয়া বাহিরে বেড়াইতে লইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "দিদি, ছেলেমেয়েগুলো মুখ চুন ক'রে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ দেখলে কি রকম লাগে। এখন থেকে জীবনের এমন পরিচয় ওদের পাবার দরকার নেই। ওদের কোথাও পাঠিয়ে দাও।"

হৈমবতী তাহাই করিলেন। বাড়ীতে করুণার অনেক প্রয়োজন ছিল, তবু তিনি ভাইয়ের কথাই রাখিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রান্ত হইয়া ছেলেমেয়েরা যখন ফিরিয়াছে, তখন নানা খেলাধূলার গল্পে মা'র কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। ভাত খাইয়া দুই ভাইবোনে পাশাপাশি বিছানায় শুইয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নিজেরাই জানিতে পারে নাই।

অকস্মাৎ অতি পরিচিত কণ্ঠের তীব্র করুণ আর্তনাদে সুধার স্বপ্নমধুর সুখনিদ্রা আছড়াইয়া-পড়া কাচের বাসনের মত যেন সরবে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেল। এ কি হইল? পৃথিবীতে এমন জিনিসের কল্পনা ত সে কখনও করে নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবনে মা'কেই সে সর্ব্বদুঃখহারিণী বলিয়া জানিত; মা'ই ত ছিলেন সকল শোকের সান্ত্বনা, সকল বেদনার প্রলেপ! সেই মা তাঁহার সকল শক্তি হারাইয়া সকল সংযম ভুলিয়া এমন করিয়া অসহায়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্তিভিক্ষা করিতেছেন কাহার আছে? কি সে অমানুষিক ব্যথা যাহা তাহার সর্বংসহা আনন্দরূপিণী মাকেও কাঁদাইতে পারে, কে সে এমন শক্তিশালী মানুষ যে এমন বেদনা হইতেও মানুষকে মুক্তি দিতে পারে? সে কি বিধাতার চেয়ে শক্তিমান্?

বিস্ময়ে বেদনায় সুধার ফুলের মত পেলব নধর শরীর যেন লোহার মত কঠিন হইয়া উঠিল। সে ক্ষুদ্র দুই মুঠি শক্ত করিয়া চোখ বড় করিয়া বিছানার উপর খাড়া হইয়া বসিল। মায়ের যন্ত্রণা যেন তাহার বুকে তীক্ষ্ণ বিষ-বাণের মত আসিয়া বিঁধিল। সুধা আর সহ্য করিতে পারে না। মৃত্যুবেদনা ত

মা'কে এমন পাগল করে নাই! শিশুকাল হইতে চোখের জল পরের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা তাহার অভ্যাস। কিন্তু আজ সে-কথা ভুলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসীমা কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সিপাহীর মত শক্ত হইয়া কঠিন মুখে কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সুধার ব্যাকুল কান্নার সুরে এঘরে ছুটিয়া আসিলেন। দুই ঘরের মাঝের দরজাটা একটু ফাঁক হইয়া গেল। ওঘরের অতি উজ্জ্বল আলো এত রাত্রে পল্লীগ্রামের অন্ধকার ঘরে শাণিত ছুরির ফলার মত চোখের সম্মুখে ঝলকিয়া উঠিল। পরদা ও দরজার ফাঁক দিয়া অপরিচিত মানুষদের জুতো-পরা পায়ের ব্যস্ত চলাচল দেখা যাইতেছে। সুধা বুঝিল, এক জোড়া পুরুষের পা, এক জোড়া স্ত্রীলোকের। পুরুষটি ত ডাক্তার, কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে? এত জনে মিলিয়া মা'কে কি কাটাকুটি করিতেছে? মা তাহার বাঁচিবেন ত? সুধার ভাবনাকে বাধা দিয়া হৈমবতী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সুধা, এত রাত্রে কান্নাকাটি করছ কেন? মায়ের অসুখ, তুমি তার মধ্যে কেঁদে মা'কে ব্যস্ত করছ! ছিঃ, এত বড় মেয়ে, তোমার লজ্জা করে না?"

সুধা চুপ হইয়া গেল। হৈমবতী মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া মায়ের গলার একটা গোঙানির শব্দ এখনও কানে আসিয়া সুধার বুকে একটা অস্বাভাবিক দোলা দিতে লাগিল। দুঃস্বপ্নময় নিদ্রা ও অস্বস্তিকর জাগরণের মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল।

ভোরবেলা কিন্তু সুধা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকালের রৌদ্র যখন বিছানার চাদরের উপর পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, তখন করুণা আসিয়া সুধাকে ডাকিয়া জাগাইল। ঘুম ভাঙিতেই কি একটা বেদনার স্মৃতি বুকের ভিতর ভারের মত চাপিয়া ধরিল, কিন্তু তাহা ঠিক যে কি, সুধা মনে আনিতে পারিল না। শিবু পাশে নাই, অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে, বাবার বিছানায় কেহ শুইয়াছিল বলিয়াই মনে হইতেছে না। সুধা বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইল। করুণা হাসিয়া বলিল, "ওঠ ওঠ সুধা দিদি, ছোট খোকাকে দেখবে চল।"

ছোট খোকা? সুধা বিস্ময়ে চোখ আরও বড় করিয়া করুণার দিকে তাকাইল। করুণা বলিল, "তোমার ভাই হয়েছে জান না?" সত্য? তবে ত করুণার কথাই সত্য। সুধার কাল রাত্রের সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল।

মায়ের কথা মনে পড়িয়া ভাইকে তাহার আর দেখিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু করুণা তাহাকে প্রায় টানিয়াই লইয়া গেল।

মা খাটের উপর সাদা চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। সমস্ত ঘর ঔষধের তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে ভরপূর। গন্ধ শুধু নয়, ঘরের ব্যবস্থা, জিনিসপত্র, সবই যেন কেমন নূতন ও অচেনা বলিয়া বোধ হয়। একটা নূতন বিছানায় মা'র ডানদিকে ছোট ছোট বালিশের মধ্যে ছোট্ট লেপ গায়ে দিয়া ন্যাড়া-মাথা পুতুলের মত ছোট্ট একটি মানুষ দুই মুঠা বন্ধ করিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া ঘুমাইতেছে। যে-কর্মময়ী মাকে চিরদিন ভোর হইতে গৃহকার্যে ব্যস্ত দেখা অভ্যাস, দিনের আলোয় যাঁহাকে সে কোনও দিন শুইতে দেখে নাই, বিছানায় এমন ভাবে তাঁহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখাও ত নূতন। সুধা শিশুর দিকে তাকাইবে না মনে করিয়াছিল; কিন্তু অতটুকু মানুষ ইতিপূর্বে সে কখনও দেখে নাই। তাহার কেমন যেন কৌতূহল হইল। মাও হাসিয়া বলিলেন, "আয় না রে, দেখ্ কেমন ভাই হয়েছে।"

সুধা মায়ের হাসি দেখিবে আশা করে নাই। মায়ের মুখ একদিনে শীর্ণ ও সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু তাহাতে কি মিষ্ট হাসি! যে এত যন্ত্রণা মা'কে দিয়াছে তাহার উপর মা'র ত কোন রাগ নাই। মা পরম স্নেহভরে হাসিয়া ছোট লেপখানা একটু সরাইয়া দিলেন। মুখে আলো ও গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিতেই চোখ মুখ আরও সঙ্কুচিত করিয়া শিশুটি কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল। দেখিলেই সমস্ত মনটা আনন্দে ও মমতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সুধা ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহার দুইটি স্বচ্ছ নরম কচি রাঙা মুঠি ধরিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, "থাক্ থাক্, অত জোরে নয়, লাগবে যে ওর!" মা সুধার হাত দুইটা সরাইয়া দিলেন। সুধার কেমন একটা অভিমান হইল, মাগো মা, এরই মধ্যে ওর উপর মা'র এত টান! আমি যে মা'র এতকালের মেয়ে, সারা রাত্রি একলা শুয়ে কাঁদলাম, তার খোঁজ ত মা কই একবারও করলেন না; আর রাক্ষুসে ছেলেটাকে একটু ছুঁয়েছি ব'লেই এত সাবধানতা!

মহামায়া সুধার অভিমান বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "তুই আমার কাছে আয় এদিকে; শিবু কোথায় গেল? কাল থেকে তোদের দুটিকে দেখি নি, বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াস্ নে। পিসির কথা শুনে চলবি, বাবার কাছে শুবি।"

সুধা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহামায়া বুঝিলেন, বলিলেন, "মাও যা বাবাও তাই; ছোট ভাই মা'র কাছে থাকল, তোমরা না-হয় বাবার কাছে রইলে।" সুধা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু দুই হাত কঠিন করিয়া মায়ের বাহু চাপিয়া ধরিল, যেন নীরবে মাকে ভৎর্সনা করিতেছে, "তুমি আমাদের ভালবাস না, তাই মিথ্যে বোঝাচ্ছ।" সুধার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

দরজার পরদাটা ঠেলিয়া শিবু ঘরে ঢুকিয়া একেবারে এক লাফে মায়ের খাটে উঠিয়া পড়িল। মহামায়া "কি করিস্, কি করিস্" বলিতে না বলিতে সে খোকাকে ঠেলিয়া দুই হাতে মা'র গলা জড়াইয়া চুম্বনে মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, "তুমি ত আমার মা।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিই ত।"

শিবু বলিল, "ও পিসিমার কাছে শোবে। ওকে নামিয়ে দাও খাট থেকে।"

শীতের দিনে একটা বেতের দোলার ভিতর অয়েল ক্লথ ও কাঁথা পাতিয়া নূতন খোকাকে বারাণ্ডার রৌদ্রে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকালবেলা বারাণ্ডার থামের মাঝে মাঝে খিলানের ভিতর দিয়া কিউবিষ্ট চিত্রকরের ছবির মত বাঁকা বাঁকা রোদের টুকরা আসিয়া পড়িয়াছে। একটা টুকরাতে খোকার দোলা, আর একটা টুকরাতে দড়ির খাটিয়ায় মহামায়া শুইয়া, পাশে একটা ছোট বেতের মোড়া লইয়া চন্দ্রকান্ত বসিয়া আছেন। হৈমবতী কাছে নাই দেখিয়া মহামায়া স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "পাঁচ মাস ত কবে হয়ে গেল, আমি কি আর উঠব না? তোমার ডাক্তারের কথা কই ফল্‌ল?"

চন্দ্রকান্ত স্ত্রীর শীর্ণ হাতের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সব সময় কি মানুষের কথা মত শরীর চলে? এবার তোমার শরীর দুর্বল ছিল, তাই সারতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে অকারণ দুর্ভাবনা না ক'রে মনে করছি একজন বড় ডাক্তারকে একবার এখানে নিয়ে আসব।"

মহামায়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, অমন ক'রে টাকার শ্রাদ্ধ করতে হবে না। একটা ডাক্তারকে এখানে আনতে যা খরচ হবে তাতে আমাদের সকলের কলকাতা যাওয়া হয়ে যাবে। অনেক ভাল চিকিৎসাও হ'তে পারবে।"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কলকাতা গেলে টাকার সাশ্রয় কিছু হবে না, বাড়ীভাড়া চাকর-বাকর সবই বেশী খরচের ব্যাপার, কিন্তু চিকিৎসা ভাল হবার সম্ভাবনা আছে, সেটা ঠিক। আচ্ছা, খোকা আর একটু বড় হোক, তাই যাওয়া যাবে। টাকার অভাবের জন্য কখনও জীবনে কোনও কাজে পিছপা হই নি, সামান্য টাকা হ'লেও কাজের সময় টাকা সর্বদাই কুলিয়ে গিয়েছে।"

দোলার ভিতর খোকার মাথাটা নড়িয়া উঠিল, কদমফুলের কেশরের মত সোজা সোজা নূতন চুল গজাইয়া মাথাটি ভারি চমৎকার দেখিতে

হইয়াছিল। খোকা মুখভঙ্গী করিবার সূচনা করিতেই মহামায়া বলিয়া উঠিলেন, "এইবার ত সিংহ গর্জন করবে? ওরে ও সুধা, খোকার কাঁথাটা বদ্‌লে দিয়ে যা না মা; নইলে মহারাজের মেজাজ ঠাণ্ডা করতে সারাদিন লাগবে।"

সুধা ঘরের ভিতর হণ্টলি পামারের একটা বিস্কুটের টিনে তাহার কাচের ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসিয়া খোকার ভিজা কাঁথা বদ্‌লাইয়া নূতন কাঁথা পাতিয়া দিল। মহামায়া স্বামীকে ঠেলিয়া নীচু গলায় বলিলেন, "সুধার হাত নাড়বার ভঙ্গী দেখেছ! দশ বছরের মেয়ে কাপড়চোপড় পাতছে যেন কত কালের পাকা গিন্নী!"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানের রাজ্যে মানুষ যেমন ক'রে হোক আপনার পাওনা কিছু আদায় ক'রে নেয়। তোমার কাছে পাওনা নিয়ে খোকা এসেছে, তুমি ত অর্ধেক ফাঁকি দিচ্ছ বেচারীকে। তাই মায়ের হাতের সেবাটা দিদিই মিটিয়ে দিচ্ছে।"

মহামায়া একটু বেদনাহত স্বরে বলিলেন, "ঐ হাত চেনাই ভাল, ভগবান হয়ত ঐ কচি হাতেই সব ভার তুলে দেবেন। আমি কি আর এ যাত্রা উঠব?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "যা ঘটবার তা ত ঘটবেই। তাই ব'লে অমঙ্গলকে ডেকে আগে থেকে দুঃখ পাবার কি কিছু দরকার আছে?"

সুধা দোলার ভিতর খোকাকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইয়া চাপড়াইয়া তাহার গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়া আস্তে আস্তে দোলাটা নাড়িতে লাগিল। খোকাকে লইয়া তাহার নাড়াচাড়া পুতুল-খেলারই মত আনন্দদায়ক ছিল। সে ইহারই ভিতর যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হাওয়াভরা বেলুনের মত খোকার মসৃণ চকচকে গাল দুটি কি পরিষ্কার! একটা মাছিও উড়িয়া বসিতে ভয় পায়। হাত-পায়ের তেলোগুলি গোলাপ ফুলের মত রঙীন, নরম যেন রেশমে তুলায় গড়া, মুঠি দুটির ভিতর আঙুল চালাইয়া যতবারই খুলিয়া দিতে চেষ্টা করে, ততবারই আঙুলের উপরেই মুঠি বন্ধ হইয়া যায়। লোভী ছেলের দুধ খাইবার লোভ দেখিলে হাসি পায় সব চেয়ে বেশী! মা কোথায় তার ঠিক নাই, চোখ বুজিয়া আপন

মনেই গোলাপী ঠোঁট দুটি নাড়িয়া দুধ টানিয়া যাইতেছে। আবার স্বপ্ন দেখিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদে! ওমা এক মুহূর্ত পরেই আবার হাসি!

মহামায়া ডাকিয়া বলিলেন, "সুধা যা রে, এবার খেল্‌গে যা, সারাক্ষণ ওকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকতে হবে না। তোর খেলাধুলো পড়াশুনো সব জলে গেল, তুই শেষে কি ছেলের ধাই হবি?"

চন্দ্রকান্ত ও মহামায়ার ইচ্ছা ছিল ছেলেমেয়েকে এমন করিয়া মানুষ করেন যে তাহারা যেন বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে। বিবাহিত জীবনে কায়মনঃপ্রাণ দিয়া স্বামী ও সন্তানের সেবাই ছিল মহামায়ার ব্রত। তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা ও আনন্দের স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়ের গৌরব লইয়া। ছেলে-মেয়েরা আর একটু বড় হইলে নিজেদের সামান্য সম্বল দিয়া কলিকাতায় গিয়া কেমন করিয়া তাহাদের সকল বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন ইহা ছিল তাঁহাদের স্বামীস্ত্রীর অতি প্রিয় গল্পের বিষয়।

কিন্তু ছোটখোকা হইবার কয়েক মাস পরেও যখন মহামায়ার শরীরের কোনও উন্নতি দেখা গেল না, বাঁদিক্‌টা কেমন যখন-তখন ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া অবশ বোধ হইতে লাগিল, তখন তাঁহার মনও অচিরাগত একটা ভয় ও নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। শরীরের অবসাদ কি গ্লানি একটু বাড়িলেই সমস্ত মন দুশ্চিন্তায় ছাইয়া যাইত। অবোধ সন্তানদের ফেলিয়া হয়ত তাঁহাকে অকালে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নয় চিররুগ্ন ভগ্ন পঙ্গু দেহ লইয়া তাহাদের অযত্নবর্ধিত দেহমনের দুর্গতি প্রতিনিয়ত দেখিয়া বেদনা পাইতে হইবে। যাহাদের এখনও সকল দিক্ দিয়া চারা গাছের মত সংসারের ঝড়ঝাপটার আড়ালে বাড়িতে দিবার কথা; তাহারাই সমস্ত ঝঞ্ঝাট মাথায় করিয়া দুর্বল হস্তে তাঁহার খঞ্জের যষ্টি ধরিয়া বেড়াইবে। অবশ্য তাঁহার দেবতুল্য হৃদয়বান্ স্বামী আছেন, ইহা একটা মস্ত সান্ত্বনার কথা। কিন্তু স্বামী তাঁহার জীবনে শ্রেষ্ঠ সহায় ও গুরু হইলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বামীকে তিনি শিশুর মতই অসহায় মনে করিতেন। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ ও মন থাকা সত্ত্বেও সংসারের কাজে তিনি কোনও দিন মহামায়ার সাহায্য করেন নাই, করিতে ভয় পাইতেন বলিয়া। ছোট শিশুকে কোলে করিতে গেলে তাঁহার দুই হাত আড়ষ্ট হইয়া যাইত, ঝি-চাকরের ঝগড়া নালিশ শুনিলেই তিনি বলিতেন, "ওদের মাইনে চুকিয়ে দাও, ওরা বাড়ী যাক,

আমি ঝগড়ার বিচার করতে পারব না।" রন্ধনে তাঁহার এত ভয় ছিল যে স্ত্রী কি ভগিনীর অসুখ করিলে তিনি শুধু দুধ মুড়ি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন। তাই মহামায়া শরীর অসুস্থ বোধ করিলেই আজকাল জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলেমেয়েরা কেহ ছাদ হইতে পড়িয়া মাথা ভাঙিতেছে, কেহ না খাইয়া শুকাইয়া যাইতেছে, কেহ মাসি-পিসির দরজায় ক্ষুধাশীর্ণ দেহ ও স্নেহবঞ্চিত হৃদয় লইয়া কাঙালের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত মহামায়ার ভাবনা বুঝিতে পারিতেন। তিনি চিন্তার ভারটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য প্রায়ই বলিতেন, "এত ভাবছ কেন? তোমার সুধা শিবু ত মস্ত বড় হয়ে গিয়েছে, ওরা খোকাকে ঠিক মানুষ করতে পারবে। বুড়ো হয়ে আমরা অথর্ব হব, ওরা শক্তিমান্ হবে, এই ত পৃথিবীর ধর্ম।"

মহামায়া বলিতেন, "আমাকে কেন ছেলে ভোলাচ্ছ, আমি সবই ত বুঝছি।"

চন্দ্রকান্ত একদিন বলিলেন, "মানুষের কোনও দুর্ভাগ্য নিয়েই বেশী কাতর হওয়া ভাল নয়; যদিও আমার নিজেরই যখন ও দুর্বলতাটা আছে তখন তোমাকে উপদেশ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু পৃথিবীতে কোনও জিনিসই ত স্থিরনিশ্চয় নয়, তোমার এই সাময়িক অসুখ যে সারবে না, একথাই বা কেন তুমি ভাবছ? আমাদের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব আমরা ক'রে দেখি না, হয়ত সেরে যেতে পারে।"

মহামায়া বলিলেন, "আমরা গরীব মানুষ, অবস্থার অতিরিক্ত করতে তোমায় আমি দিতে পারি না। তাহলে ভবিষ্যতে ছেলেপিলের দশা কি হবে? তুমি কাজকর্ম ফে'লে ত কলকাতা যেতে পার না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "আমি কলকাতাতেই একটা কাজ পেতে পারি, এটুকু যোগ্যতা আছে আমার। আজ থেকে সেই চেষ্টা করব। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্যে আমাদের একবার কলকাতায় ত কিছুদিন থাকতেই হবে, কতকালের থেকে কথা ছিল। দেখি সে চেষ্টা ও ইচ্ছাগুলো সফল হয় কি না। তবে হয়ত কিছু দেরী হয়ে যেতে পারে।"

মহামায়া অভিমান করিয়া বলিলেন, "তোমার চেষ্টা সফল হতে আমি যাব ম'রে। তারপর 'মা ম'লে বাপ তালুই, ছেলে হবে বনের বাবুই,' ওই আমার কপালে লেখা আছে।"

৯

শরীর আর কিছুতেই ভাল হয় না। হৈমবতী একলা সমস্ত সংসারের কাজ পারিয়া উঠেন না। লুচি ভাজিতে গেলে বেলিয়া দেয় কে? মাছ কুটিতে গেলে উনানের আগুন উস্কায় কে? কাজকর্মে বড় বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। সুধা প্রায় এগার বছরের মেয়ে হইল, তাহাকে কাজকর্মে টানিয়া আনিলে তবু হৈমবতীর অনেকখানি সুরাহা হয়; কিন্তু ছোট খোকার পিছনে অষ্টপ্রহর ছুটিতে ছুটিতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়, সে হৈমবতীকে সাহায্য করিবে কি করিয়া? খোকা এক বছর পার হইয়া গিয়াছে, টলিয়া টলিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলা ও সংসারের সমস্ত জিনিস উন্মত্ত ভৈরবের মত দুই হাতে টানিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করাই তাহার কাজ। সংসারটা পাছে একলাই সে রসাতলে পাঠাইয়া দেয় তাই সতর্ক প্রহরীর মত সুধা এই ক্ষুদ্র কালাপাহাড়কে বন্দী করিবার ফন্দীতে দিনরাত ব্যস্ত।

আজ সে খাট হইতে পড়িয়া গিয়া ন্যাড়া মাথাটা আমের আঁটির মত ফুলাইয়া বসিয়া আছে, তাই সুধা তাহাকে লইয়া বড় বিব্রত। পিছন পিছন দৌড়াইতে সুধা খুব পারে, কারণ সেটা যেমন খোকাকে আগলানো তেমন সুধারও একটা খেলা। কিন্তু এই দুর্দান্ত দস্যু ছেলেটাকে সারাদিন কোলে করিয়া বেড়ানো কি তাহার মত ছেলেমানুষের সাধ্য? খোকা কোলের ভিতরই এমন জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়া খাড়া হইয়া উঠে যে দাঁড়াইয়া থাকিলে সুধাসুদ্ধ সেই ধাক্কায় পড়িয়া যাইবার যোগাড় হয়। অথচ ঐ তালের মত ফোলা মাথাটা লইয়া উহাকে আজ ত আবার দস্যিপনা করিতে দেওয়া যায় না?

সুধা হৈমবতীর শরণ লইল। "পিসিমা, খোকনকে যদি তুমি রাখ, তাহলে তোমার সব কাজ আমি করে দেব। ওর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আর আমি পারছি না।"

পিসিমা বালিসুদ্ধ ভাঙা খোলা উনানে বসাইয়া তাহার উপর কুচি দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া খই ভাজিতেছিলেন। তপ্ত খোলায় শুভ্র বেলফুলের

মত মোটা মোটা খইগুলা ভোজবাজির মত এক মুহূর্তে রাশি রাশি ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহারই মধ্যে বাঁ হাতে লোহার চোঙাটা ধরিয়া পিসিমা তাঁহার ভারি গাল দুটি আরও ফুলাইয়া উনানে ফুঁ পাড়িতেছিলেন। কাঠের উনানের ধোঁয়ায় ও আগুনের তাতে তাঁহার মুখখানা গোলাপ ফুলের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সুধার কথা শুনিয়া পিসিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমাকে আর আমার কাজ করতে হবে না। তুমি যাবে ত কলকাতায় মেমসাহেব হতে! এই বুড়ী পিসির সঙ্গে খই ভাজতে কি তোমার বাপ মা তোমায় এখানে রেখে দিয়ে যাবে?"

ছোট খোকা কোল হইতে ছাড়া না পাইয়া তখন সজোরে সুধার ঘন চুলের মুঠি ও কানের পার্শি মাকড়ি দুই হাতে ধরিয়া টানিতেছে। এক হাতে চুল ও কান ছাড়াইতে ছাড়াইতে সুধা বলিল, "কোথায় যাবে সবাই, পিসিমা?

পিসিমা আধপোড়া খড়ের বিঁড়ার উপর ধপাস করিয়া গরম খোলাটা নামাইয়া বলিলেন, "আসর ঘরে মশাল নেই ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া! তোমার বাপ এই পাড়াগাঁয়ের চালই চালাতে পারছেন না, বৌ এক বছর শয্যেশায়ী।" এখন চলেছেন ছেলেমেয়েকে ইংরেজীয়ানা শেখাতে। কে সেখানে সংসার ঠেলবে বাপু? খেয়ে প'রে ছেলেপুলেগুলো বেঁচেছিল সেইটাই বড়, না না-খেয়ে ইংরেজী শেখা বড়?"

সুধা বিস্মিত হইয়া পিসিমার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের কলিকাতা যাইবার কথা একটা আব্ছা আব্ছা কিছুদিন হইতে সে শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া শুনে নাই। যাই হোক, পিসিমা যখন এত রাগ করিতেছেন তখন নিশ্চয় তাঁহার মনে বেদনা লাগিবার মত কিছু হইয়াছে।

সুধা ভয়ে ভয়ে বলিল, "তা গেলেই বা কলকাতায়। আমি ইস্কুলে ভর্তি হলেও কাজ করতে পারব। তুমি আমায় একটু একটু ক'রে সব শিখিয়ে নিও। ভাত নামাতে ত আমি শিখেছি। মা না পারেন, আমরা দুজনেই কাজ করব।"

হৈমবতী সরোষে বলিলেন, "আমি যাব কিনা সেখানে তোমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে? আমি যে এখানে তোমাদের আঁধার ঘর আলো ক'রে ব'সে থাকব।"

সুধার মনটা বড় মুষড়াইয়া গেল। সে বলিল, "কেন পিসিমা, তুমি যাবে না কেন?"

হৈমবতীর স্বর হঠাৎ নরম হইয়া আসিল। খই ভাজা রাখিয়া শিল-নোড়া হলুদ সরিষা টানিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, "সবাই ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গেলে চলে কি মা? এখানে যে সাতভূতে আড্ডা ক'রে নরক গুলজার ক'রে তুলবে। এত দিনের গড়া সংসার অমন ক'রে কি কেউ জলে যেতে দেয়? এই আগলে যক্ষি হয়ে আমায় ব'সে থাকতে হবে।"

পিসিমার উত্তরে সুধার মন খুশী হইল না। সংসারে তাহারাই যদি কেহ না রহিল তবে সে-সংসারকে এত করিয়া বুক দিয়া আগলাইয়া বজায় রাখিবার কি প্রয়োজন? সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার বুদ্ধি সুধার তখনও হয় নাই। সে মনে করিল এটা পিসিমার এ-সংসারের প্রতি মমতা মাত্র। মমতা তাহারও আছে কিন্তু প্রাণহীন ঘরদুয়ারের প্রতি মমতার জন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রিয়জনদের সে ছাড়িতে পারে না। নহিলে আজন্মের পরিচিত এই স্নেহনীড় ছাড়িবার কথা শুনিয়া তাহারই কি বুকের শিরা উপশিরায় টান লাগিতেছে না? জন্ম অবধি এ-গৃহের আবেষ্টন যে তাহার দুই চোখে মায়া-অঞ্জন পরাইয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া ইহাকে ফেলিয়া সে নূতন জগতের মাঝখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে? এ ত বছর-বছর পূজায় মামার বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া নয়! এ এক লোক হইতে অন্য লোকে প্রয়াণ! ছোট খোকাকে দুই হাতে কোলের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া সুধা বলিল, "পিসিমা, আমরা বুঝি আর এ-বাড়ী ফিরে আসব না!"

হৈমবতী হলুদমাখা হাতখানাই মুখের উপর তুলিয়া তর্জ্জনী উঁচাইয়া বলিলেন, "ষাট্, ষাট্, ও কথা কি বলতে আছে? বাড়ী এক-শ বার আসবে। তবে চন্দ্র যে কলকাতাতেই চাক্‌রি নিয়ে বসেছেন। এখন কি আর হট করতেই ঘরে এসে বসা যাবে? পরের গোলাম, ছুটি না পেলে এক পা বাড়াবার সাধ্যি নেই। তার উপর তোমার মায়ের চিকিচ্ছে, তোমাদের ইস্কুলমিস্কুল কত কি! বুড়ী পিসিকে কি তখন আর মনে পড়বে যে দু-বেলা দেখতে আসবি?"

হৈমবতী এমন স্নেহকোমল স্বরে ত কখনও কথা কহেন না? তাঁহার কথা শুনিয়া সুধার চোখে জল আসিয়া গেল। সে চোখের জল সামলাইয়া লইয়া

বলিল, "আমি জলখাবারের পয়সা জমিয়ে তোমায় নিয়ে যাব পিসিমা তুমি মাঝে মাঝেও কি যেতে পারবে না ?"

ছোট খোকা কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া অন্যমনস্ক হৈমবতীর শিল হইতে এক খামচা হলুদ তুলিয়া লইয়া বলিল, "পাব্বে।"

সুধা খোকার পিঠে সাদরে মৃদু একটা চড় দিয়া হাসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মনের ভিতর তাহার হাসিটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। সে মনটাকে হাল্কা করিবার জন্য শিবুর খোঁজ করিতে লাগিল। তাহার মনের অল্প বয়সের গাম্ভীর্যটাকে হাসি ও খেলার মলয়হিল্লোলে উড়াইয়া দিবার জন্য ছোট ভাই শিবু ছাড়া আর ত তাহার দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল না।

মহামায়া সংসারের কাজে ক্রমশঃই অপটু হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার ভারটাই বেশী করিয়া নিজে টানিয়া লইতেছিলেন। সুধা যতক্ষণ ছোট খোকার দৌরাত্ম্য লইয়া ব্যস্ত থাকে, মহামায়া ততক্ষণ শিবুর মানসিক উন্নতির চেষ্টায় মন দেন। খাওয়াদাওয়ার পর খোকন শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে সুধা তাহার বালি কাগজের খাতা, আখ্যানমঞ্জরী, উপক্রমণিকা, সুতাতোলা রুমাল ও মিহি চুলের দড়ি ইত্যাদি লইয়া মায়ের কাছে আসে। হয়ত আজ এতক্ষণে শিবুর পড়া হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া সুধা আসিয়া দেখিল, মেঝের উপর 'বোধোদয়' ও 'নব ধারাপাত' গড়াগড়ি যাইতেছে, শিবু শ্লেটখানা বুকের উপর চাপিয়া চিৎ হইয়া মা'র কোলে মাথা রাখিয়া হাঁ করিয়া তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। মা শিবুকে গল্প বলিতেছেন। বুড়ো ছেলের এখনও মা'র কোলে শুইয়া গল্প শোনার সখ মিটে নাই।

সুধা ছোটখোকাকে মেঝেতে ছাড়িয়া দিয়া দূর হইতে শুনিতে লাগিল, গল্প ত নয়, মা কি সব ছড়া বলিতেছেন :—

"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাস হ'ল দড়ি
আয় রে ভাই সাগরজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"
"ভাত কড় কড় ব্যঞ্জন বাসি দুধ বিড়ালে খায়,
তোমার খেলাবার সাথী উপবাসী যায়।"

মা কেন আজ এই সব ছড়া বলিতেছেন ? সুধা মনে করিয়াছিল মা হয়ত শিবুকে সাত বউয়ের গল্পের

"সাত বৌয়ের সাত আসকে, খড়কের আগায় ঘি
খুঁত খুঁত খুঁত করছ কেন খেতে লারছ কি ?"

ছড়া শুনাইতেছেন। তাহা ত নয়, মা'রও মন চঞ্চল হইয়াছে, তাই এই সব বিচ্ছেদব্যথার করুণ সুর তাঁহারও মনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। হৈমবতী সুধার খেলার সাথী নন, তবু সুধার মনে হইল তাহারা যখন তাঁহাকে এই শূন্যগৃহে ফেলিয়া দিয়া দূরে চলিয়া যাইবে, তখন আন্‌মনা পিসিমার ভাত ব্যঞ্জন এমনই অবহেলায় পড়িয়া নষ্ট হইবে, তিনি উপবাসী বসিয়া মানসচক্ষে সুধা শিবু খোকার প্রিয় মুখগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিবেন। সদ্যমাতৃবক্ষচ্যুতা শিশুবধূর মত তাঁহারও প্রিয়জনবিরহে সাগরজলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিবে।

এই করুণ সুর সুধার আর ভাল লাগিল না। সে বলিল, "মা, খোকনের ঘুম এসেছে, ওকে তুমি একটু দেখো। শিবু, চল মুখুয্যেবাঁধের ধারে অনেক চকমকি পাথর দেখে এসেছি, কুড়িয়ে আনি গে।"

শিবু তড়াক্ করিয়া মা'র কোল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বই দুইটা ঘরের ছাত পর্যন্ত ছুঁড়িয়া দিয়া আবার লুফিয়া লইল। তাহার পর সাঁওতালদের সুরে—

"বাবুদের কলাবাগানে,
ওলো আমার গোলাপকাঁটা ফুটেছিল চরণে।"

গাহিতে গাহিতে সুধাকে টানিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া শিবু সানন্দে সুধার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া বলিল, "দিদি, জান আমরা কলকাতা যাব ? দু-জনেই ইস্কুলে ভর্তি হব।"

সুধা গম্ভীর বিষণ্ণ মুখ করিয়া বলিল, "তোর ভাল লাগছে ?"

শিবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ভাল ? আমার ইচ্ছে করছে এখ্‌খুনি হনুমানের লঙ্কা যাত্রার মত এক লাফে কলকাতায় গিয়ে পড়ি।"

সুধা বলিল, "ভাগ্যে ভগবান তোকে লেজটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। না হ'লে তুই সাক্ষাৎ হনুমানের মত গাছের ডাল থেকে আর নামতিস না। কলকাতা যাবার জন্যে যে এত ক্ষেপেছিস, সেখানে কি এমনি আমগাছ আর পেয়ারা গাছের ডালে ব'সে থাকতে পাবি ? পিসিমা বলেছেন সে ভারী শহর, সেখানে শুধু রাস্তা, বাজার আর বাড়ী, গাছপালা কিচ্ছু নেই।"

শিবু বলিল, "আগাগোড়াই নূতন রকম দেশ, তাহলে ত আরোই মজা ”

কিন্তু সম্পূর্ণ নূতনের কল্পনায় সুধার মন ভরিল না। ভোরবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার চিরপরিচিত শিরীষ ফুলের গাছের পিছনে আকাশ রাঙা করিয়া স্বর্ণ কলসের মত সূর্যের উদয় যদি না দেখিতে পাওয়া যায়, যদি মেঘে মেঘে সাত রঙের ফাগ ছড়াইয়া সন্ধ্যার সূর্য্য ঐ ন্যুব্জপৃষ্ঠ শৈলমালার পিছনে না অন্তর্হিত হয়, তবে কিসের সে কলিকাতা ? শুক্ল পক্ষের মাঝ রাত্রে অন্ধকার ঘরে যখন ঘুম ভাঙিয়া যাইবে তখন পুকুর পাড়ের ঝাঁকড়া কালো নিম গাছের অন্তরালে থালার মত চাঁদটিকে ধীরে ডুবিয়া যাইতেও কি সেখানে দেখা যাইবে না ? দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে এই যে রূপদ্যুতি মনকে ভুলাইয়া দেয় ইহাকে ছাড়িয়া জীবনের আনন্দ যে অর্ধেক হইয়া যাইবে। সুধা ত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। তাহার কতখানি যে পড়িয়া থাকিবে এই স্থুলকাণ্ড মহুয়া গাছের ডালে ডালে শাদা বকের শোভায় আর এই পাহাড়ে পথের ধারে ভীমকায় কালো কালো পাথরে তাহা কে জানে ? এই পুকুরের পাড়ে পাড়ে চকমকি কুড়াইয়া আগুন জ্বালিয়াছে, জোড়ের ক্ষীণ জলধারায় পা ডুবাইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে যে সুধা ও শিবু কত দিনের পর দিন, তাহারা ত ঐ সকল বিগত দিনের ভিতর দিয়া এইখানেই রহিয়া গেল, তাহাদের কতটুকু যাইতে পারিবে ইহাদের ফেলিয়া ?

সমস্ত নয়ানজোড় যেন আজ ম্লান মুখে সুধার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সজীব নির্জীব সচল অচল সকলের মুখে সুধার মনের বেদনার ছায়াই ম্লানিমা আনিয়া দিয়াছে। ইহারা যে সুধার পরম আত্মীয়। কলিকাতার সৌধমালা ও তাহার সুসভ্য অধিবাসীরা কি নয়ানজোড়ের মত এই পল্লীবাসিনী ছোট্ট সুধাকে আপনার বলিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইবে ?

সুধা বলিল, "মজা ত ভারি ? ওখানকার আমরা কিচ্ছু জানি না, সবাই আমাদের পাড়াগেঁয়ে বলবে। তুই ভাই সাবধান, লোকের সামনে যা-তা ব'লে বসিস না। লোকে যদি শোনে যে আমিও তোর সঙ্গে ডাণ্ডাগুলি খেলি আর কোমর বেঁধে গাছে উঠি, তাহলে কিন্তু শহরের মেয়েরা ভয়ানক হাসবে।"

শিবু বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, "হাসল ত বয়েই গেল। যারা ডাণ্ডাগুলি খেলতে আর গাছে উঠতে পারে না তারা ত ভারি মেয়ে, তা আবার পরকে দেখে হাসবে।"

কিন্তু সুধা বুঝিয়াছিল যে শিবু যাহাই বলুক, তাহার এ বীরত্বটা শহরের নারীত্বের কাছে গৌরবের জিনিস নয়। তাহাদের অতিপ্রিয় খেলাগুলি তাহাদের নিজেদের যতই মনোহরণ করুক, বাহিরের লোকের চোখের কাছে দাঁড় করাইয়া সেগুলিকে পরের হাসির ও অবজ্ঞার বাণে বিদ্ধ করিতে সে পারিবে না। সুধা ও শিবুর ছেলেখেলার পর্ব এই নয়ানজোড়েই শেষ করিয়া যাইতে হইবে। শিবু ছেলেমানুষ, হয়ত আবার নূতন খেলায় মাতিবে, কিন্তু সুধার শৈশব তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য লইয়া এইখানেই পড়িয়া থাকিবে। অসূর্যম্পশ্যা কুলবধূর মত সে শৈশব নিজের পরিচিত গণ্ডীর বাহিরে অমর্যাদার ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত নয়ানজোড় জুড়িয়া দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তাহার শৈশব ধূলি-মাটি-জলে যে স্বর্গ তিলে তিলে রচনা করিয়াছে তাহা যে এখানে অতলস্পর্শ শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে, তাহাকে টানিয়া তোলা ত যায় না! এই যে ঘরের জানালার ধারে সবুজ ঘাসের মাঠ এ কি শুধু মাঠ? এ ত রত্নাকর অনন্ত জলধি, ওই জানালায় বসিয়া একটা ভাঙা ঘড়ির স্প্রিং লইয়া এই মহাসমুদ্র হইতে সুধা ও শিবু কত রাশি রাশি নীলকান্ত মণি ও পদ্মরাগ মণি তুলিয়া ঘর বোঝাই করিয়াছে। কলিকাতার কেহ কি এ-কথা বিশ্বাস করিবে? তাহারা শুনিলে সুধাদের পাগলা গারদের পথ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, যাহাদের মনের চোখ নাই তাহারাই অপরকে পাগল ভাবে। এই চোখের দৃষ্টি সুধাই ত হারাইয়া ফেলিবে এখান হইতে চলিয়া গেলে। সে কি আর কলিকাতায় গিয়া জানালার ধারে এই ঐশ্বর্যশালী মহাসমুদ্রকে কোনও দিন খুঁজিয়া পাইবে?

সুধা বলিল, "সেখানে ত আমরা আলাদা আলাদা ইস্কুলে ভর্তি হব। তুই আর আমি একলা আর কখন খেলব ভাই? আমাদের সব খেলা নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যদের সঙ্গে ত আর এসব খেলা হবে না। গল্পগুলো যে আমরা চালাচ্ছিলাম তার কি হবে? বিক্রম চন্দ্রেশ্বর সবাইকার কথা ত একেবারে শেষ ক'রে দিতে হবে? এখনও ওদের কত গল্প বাকি, ওরা ত মোটে বুড়ো হতে পেল না, আগেই সব ফুরিয়ে যাবে?"

বেপরোয়া ভাবে শিবু বলিল, "তাতে কি? তেমন ক'রে শেষ করব না। যত ভাল ভাল জিনিস আছে, সোনার বাড়ী, রূপোর ঝরনা, শ্বেত হস্তী, গজমোতি, সব ওরা রোজ পেতে লাগল, এই রকম ক'রে শেষ করব।"

ক্ষুণ্ণ স্বরে সুধা বলিল, "তাহলেও আমরা ত ওদের ভুলে যাব! আমরা ত ওদের আর বড় করব না, সাজাব না, কিচ্ছু না!"

উপায় নাই। সে দুঃখ মানিয়া লইতেই হইবে। শিবু তাহাতে দমিবে না।

এই বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বর সুধা ও শিবুর মানস পুত্র। ঐ সুবিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের ধারে আমগাছতলায় কালো পাথরের ঢিবির উপর তাহাদের দুই জনের প্রকাণ্ড দুই রাজ্য। চোখে দেখিতে ঐ পাথরের ঢিবিটা মাত্র, কিন্তু সে রাজ্য এত বড় যে মাপিয়া শেষ করা যায় না। ধনে ধান্যে ঐশ্বর্য্যে রাজ্য উছলিয়া পড়িতেছে। বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বরের অপ্সরার মত সুন্দরী রাণী, অশোকবনের চেড়ীর মত ভয়ঙ্করী দাসী, ভীমের মত বলশালী সেনাপতি, অর্জ্জুনের মত রূপগুণবান্ পুত্র, কিছুরই অভাব নাই। সুধা ও শিবু এই দুই রাজ্যের বিধাতা। তাহাদের আশীর্বাদে বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বরের ধন সম্পদ্ অর্থ সামর্থ্য সকলই না-চাহিতে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের জীবনধারা মহাভারতের যুগেই আবদ্ধ নয়। সুধা ও শিবু অনন্ত স্নেহে আধুনিক যুগে বিচরণ করিবার বরও তাহাদের দিয়াছে। তাহারা ইচ্ছা করিলে পুষ্পক রথে চড়ে, ইচ্ছা করিলে মোটর হাঁকাইতেও পারে। অতীত ও বর্তমান পৃথিবীর কোনও সুখ হইতে ইহাদের বঞ্চিত হইতে সুধারা দেয় নাই। 'অসম্ভব' বলিয়া কথা তাহাদের জীবনে নাই। কেবল একটি জিনিস সুধা ও শিবু তাহাদের দিতে চায় না, নয়ানজোড়ের এই বাস্তব মানুষগুলার কাছে সুধারা উহাদের বাহির হইতে দেয় না। উহারা দুই ভাই-বোন ছাড়া পাছে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি বিক্রমদের কথা শুনিয়াও ফেলে, তাই বিক্রম-চন্দ্রেশ্বরের রাজ্যের ভাষা বাংলা ভাষা নয়। সে নূতন ভাষা সুধারাই গড়িয়া দিয়াছে। কত সময় আর পাঁচ জনের কাছে এই ভাষা বলিয়া ফেলিয়া সুধারা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রক্ষা যে, কি কথা হইতেছে বাহিরের পাঁচজন তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সুধারা চুপি চুপি এ রাজ্যে প্রবেশ করে, চুপি চুপি ফিরিয়া আসে, কেহ জানিতে পারে না। কাব্যে সঙ্গীতে রূপে সে দেশ ঝল্‌মল্ করিতেছে। কিন্তু নয়ানজোড়ের এই নিভৃত আমতলা ছাড়িয়া কলিকাতার কলকোলাহলের ভিতর এ-রাজ্য কি আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পাইবে? বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বর খেয়াল হইলে আধুনিকতা করে বটে; কিন্তু কলিকাতার ভীড়ের ভিতর উগ্র সভ্যতার মাঝখানে তাহারা নূতন রাজ্য

গড়িতে চাহিবে না। এই বিপুল বৈভব সমেত তাহাদের রাজ্য দুটি এইখানেই ফেলিয়া সুধাদের চলিয়া যাইতে হইবে মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে। এই পাড়াগাঁয়ে সুধা শিবুদের অনাদরে অযত্নে তাহারা একদিন নিঃশেষে ইহলোক হইতে ঝরিয়া যাইবে। তাহাদের ভাগ্যবিধাতারাও সেদিন তাহাদের জন্য আর শোক করিতে আসিবে না।

সুধা মনে করিয়াছিল, মাঠে ঘাটে শিবুর সঙ্গে খেলা করিয়া সে তাহার নবজাগ্রত বিরহব্যথাকে ভুলিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইল না, খেলার ভিতরেও সকল কথা ঐ ব্যথার স্থানটিকেই ছুঁইয়া যায়। ইহার চেয়ে বাড়ী যাওয়াই ভাল। মনটা ত কোথায়ও স্থির হইতেছে না। অসুস্থতার মাঝখানেও মা'র কাজকর্ম ব্যবহারের ভিতর যে একটা অচঞ্চল শান্তির শ্রী আছে তাহার কাছে বসিলেও অন্যের মন শান্ত হয়।

ছোট খোকা এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মা নিশ্চয় বসুমতী-প্রকাশিত তাঁহার ছেঁড়া বঙ্কিম গ্রন্থাবলীটি লইয়া মেঝের উপর পা ছড়াইয়া পড়িতে বসিয়াছেন। দেবীচৌধুরাণী ও বিষবৃক্ষের গল্প তের-চৌদ্দবার তাঁহার পড়া হইয়া গিয়াছে, সুধারাই ত তিন-চার বার শুনিয়াছে, তবু এখনও প্রত্যহ দুপুরে সেই বইখানা লইয়া বসিতে মা'র অতৃপ্তি নাই। কাছে বসিলেই মা "ও পি, পি, প্রফুল্ল পোড়ার মুখী", কিংবা দিবা ও নিশার গল্প পড়িয়া শুনাইতে রাজি। পিসিমা মেঝের উপরেই আঁচল বিছাইয়া শুধু মাথাটুকু তাহার উপর রাখিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর একবার শুইলে তাঁহার চোখে ঘুম নামিতে দেরী হয় না।

যাত্রার আয়োজন চলিতেছে। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় আর একটু বেশী মাহিনায় একটা ইস্কুলেরই কাজ পাইয়াছেন। তাই নয়ানজোড়ের ঘরবাড়ী হৈমবতী ও মৃগাঙ্কর ভরসায় রাখিয়া দিয়া তাঁহারা কলিকাতা যাওয়াই স্থির করিয়াছেন।

মহামায়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঠাকুরঝিও বলছেন, আমারও মনে হয় এই সামান্য আয়ে কলকাতায় গিয়ে আমাদের টানাটানিতে পড়তে হবে, এখানেও দেখাশুনোর অভাবে আয় ক'মে যাবে। তার চেয়ে এখানেই একরকম ক'রে চ'লে যেত। নাইবা গেলাম।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "এমনিতেই তোমার চিকিৎসার ছু-আড়াই বছর দেরী হয়ে গেল, আর যদি দেরী করি তাহলে আমার নিজের উপর সমস্ত শ্রদ্ধা চলে যাবে। খানিকটা আলস্য আর খানিকটা অভাবে যেটা হয়েছে তার প্রতিকার যেটুকু হাতে আছে না ক'রে ছাড়তে আমি পারব না। অনিশ্চিত মন্দ আশঙ্কায় নিশ্চিত ভাল চেষ্টাটা ছাড়া উচিত নয়।"

মহামায়া কিছু বলিলেন না, রোগ সারিতেছে না বলিয়া সর্বপ্রথমে তিনিই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই জন্য মনে মনে নিজেকে স্বামীর ও সংসারের নিকট অপরাধী ভাবিয়া নীরবেই রহিলেন।

পুরাতন ঝি চাকরদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। করুণা ঝি মহামায়ার দুই ছেলেমেয়েকেই মানুষ করিয়াছিল। খোকারও অনেক কাজ সে করে। তবে মহামায়ার শরীর অসুস্থ হওয়াতে সংসারের কাজে ও তাঁহার সেবায় অনেক সময় তাহার চলিয়া যায়। এখন তাহাকে ঠিক ছেলের-ঝি আর বলা চলে না।

সুধাকে সে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসিত। সুধাকে ছাড়িয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া? কলিকাতা যাত্রার কথা শুনিয়াই সে বলিল, "সুধারাণী, রাঙাবর এসে তোমায় পাল্কী করে নিয়ে চলে যাবে আর ইঁদুরমাটিতে তোমার পা-দুখানির ছাপ নিয়ে আমরা চোখের জল ফেলব, এই কথা ভেবে আমার

বুকটা দুরু দুরু করত, কে জানত তার আগেই তুমি এমন ক'রে চলে যাবে! এ'ত রতনজোড় নয় যে গরুর গাড়ীতে যাব, তেঁতুলডাঙা নয় যে সাত কোশ হাঁটব। কলকাতার রাস্তা আমি জন্মে চিনি না, রেলগাড়ীকে বড় ডরাই।"

শিবু পিছন হইতে গান করিয়া উঠিল,

"কলগাড়ী বাতাসে নড়ে না,"

মহামায়া বলিলেন, "কলগাড়ী যাতেই নড়ুক, তুই অকারণে মানুষকে জ্বালাতন করিস্ নে।"

শিবু বলিল, "করুণা দিদি এইবার রোজ প্রাণভরে মৃগাঙ্ক-দাদার চরণামৃত খেতে পারবে, আর ত বাবা তাকে বকতে আসবেন না।"

করুণা বলিল, "পৈতে হ'লে তোমারই চন্নাম্মিত খেতাম দাদা, তা ত তুমি হতে দিলে না। এত বড় বাম্ভন-সন্তান কোথায় পেতাম?"

শিবু বলিল, "তুমি না আমার ভিক্ষে-মা হবে বলেছিলে, তবে আবার চন্নাম্মিত খেতে কি ক'রে ছেলের পায়ের?"

করুণা বলিল, "আমি গরীব তাঁতির মেয়ে, আমার কি ধনদৌলত আছে দাদা, যে অমন সাধ পূর্ণ করব?"

মহামায়া বলিলেন, "সাধ ত একদিকে পূরেইছে, ছেলেকে মা বলাতে পারলে না, কিন্তু মেয়ে ত আমার তোমায় মা'র বাড়া ক'রে তুলেছে।"

শিবু বলিল, "দিদি যা বোকা, এখনও থেকে থেকে করুণাদিদিকে মা ব'লে বসে।"

বাস্তবিকই সুধার করুণা সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা ছিল। এই খর্বাকৃতি শীর্ণকায়া তাম্রবর্ণা করুণার স্বল্পবাস মূর্তি, সুধার আজন্ম-পরিচিত বলিয়া কিনা জানি না, মাতৃমূর্তিরই একটি ছায়া বলিয়া মনে হইত! শিশুকালে করুণার হাতে ছাড়া আর কাহারও হাতে সে খাইতে চাহিত না। একদিনের জন্য করুণা বাড়ী যাইতে চাহিলে মহামায়ার ভাবনা হইত, 'মেয়েটা বুঝি না খেয়েই মারা যাবে।' হৈমবতীর হাতের ভাতের গ্রাস ঠেলিয়া দিলে তিনি রাগিয়া বলিতেন, "মেয়ের তোমার পছন্দকে বলিহারী বলি বউ, মা রইল, পিসি রইল প'ড়ে, ঐ রূপসী তাঁতিবুড়ীর হাতে ছাড়া তাঁর মুখে অন্ন রোচে না।"

শুনিয়া মহামায়া বলিতেন, "কি করব, একেই ওটার খাওয়া কম, তার

ওপর বামনাই ফলিয়ে ওকে ত শুকিয়ে রাখতে পারি না। ওর যা রোচে তাই থাক্ গে।"

হৈমবতী বলিলেন, "রুচি না আরও কিছু! সব ওই তাঁতিমাগীর বজ্জাতি। চাকরী বজায় রাখবার জন্যে মেয়েটাকে বশ করেছে। আমি হ'লে দু-দিন উপোষ দিয়েও ও বদ্‌রোগ ছাড়াতাম।"

এই তর্কাতর্কি শুনিয়া সুধা নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জা পাইত, কিন্তু তবু করুণার মায়া কাটাইতে পারিত না। বেচারী করুণা তাহার মুখে মা ডাক শুনিতে ভালবাসিত বুঝিয়াই সুধা বড় হইয়াও কত সময় লুকাইয়া তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছে। এই জন্য মৃগাঙ্ক-দাদা তাহাকে কত ক্ষেপাইত!

করুণা বলিল, "মা, সংসারে আর আমার মায়া নেই। ছেলে বল, মেয়ে বল, সবাই টাকার বশ। টাকা না দিতে পারলে ছেলেও মুখে লাথি মারবে। তাদের অচ্ছেদ্দার ভাত আমি খেতে চাইনে। তোমার ভাত এতদিন খেলাম, বাকি ক'টা দিনও যদি খেতে পেতাম তার কি ব্যবস্থা হয় না?"

মহামায়া বলিলেন, "সেখানে দুখানা আট হাত দশ হাত ঘর বাছা, তার ভেতর তোকে নিয়ে আমি কোথায় রাখব? আপনি পাশ ফিরতে জায়গা পাব না, পরকে দুঃখ দিতে নিয়ে যাব কেন?"

করুণা বলিল, "আহা, তবে কেন মা এ সোনার সংসার ছেড়ে সীতের বনবাসে যাচ্ছ?"

শিবু শুনিয়া বলিল, "মা, আমি তোমার জন্যে সাত মহলা বাড়ী ক'রে দেব। দুখানা ঘরে তুমি কথ্‌খনো থাকবে না। তুমি ঘর জোড়া খাটে যত খুশী পাশ ফিরবে।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "টাকা কোথায় পাবি রে?"

শিবু বলিল, "কেন? হাটে নোট ভাঙাতে দেব। করুণা দিদি টাকা নিয়ে আসবে।"

সুধা বলিল, "আর নোটগুলো কি গাছ থেকে পড়বে?"

শিবু হার মানিবার ছেলে নয়। সে বলিল, "ওঃ, ভারি ত নোট, অমন আমি ঢের বানাতে পারি।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "তবেই হয়েছে। একেবারে সাতমহলে মায়ে পোয়ে বন্দী হব।"

দুপুর বেলা পুরানো পাড়ের রঙীন সুতা তুলিয়া হৈমবতী বুড়া আঙুলে বাঁধিয়া পাক দিতেছিলেন। গল্পের শব্দ পাইয়া কাছে আসিয়া হৈমবতী বলিলেন, "বাসা বাড়ী কি আর বাড়ী? পরের কাছে হাত জোড় ক'রে থাকা! এ বলছে দূর দূর উঠে যেতে হবে, সে বলছে দূর দূর উঠে যেতে হবে। মানুষের মান সম্ভ্রম থাকে না ওতে। আমি আর কি বলব বল? আমার কথায় ত কেউ চলবে না? সুখে থাকতে সব ভূতে কিলোচ্ছে।"

মহামায়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "আদত দোষ ত আমার ঠাকুরঝি! তুমি অকারণ অন্যের উপর রাগ করছ কেন?"

মা যে কোনও বিষয়ে দোষ করিতে পারেন একথা মা'র মুখে শুনিয়াও শিবুর বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত মানহানি হইত। সে রাগিয়া বলিল, "মা, তুমি কিছুই জান না। অসুখ করলে কখনও কারুর দোষ হতে পারে না।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "সেটুকুন বুঝি বাছা! কিন্তু আমারই জন্যে যে সমস্ত সংসারটা ওলটপালট হতে চলল এটা কি আর দোষের চেয়ে ছোট কথা?"

হৈমবতী বলিলেন, "থাক্‌গে, ছেলেপিলের কাছে বাপ মায়ের দোষগুণ বিচার করতে হবে না। ওরা কচিকাচা, অত কথার মানে কি জানে? যা, তোরা যা দিখি, আপন চরকায় তেল দিগে যা।"

শিবু বলিল, "ও বুঝতে পেরেছি, আমি চ'লে গেলেই মাকে বুঝি তুমি বকবে?"

পিসিমা ধমক দিয়া বলিলেন, "বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপারা চক্কর, উনি এলেন আমায় শাসন করতে! কে কার নাড়ী কেটেছিল রে?"

এবার আর শিবুর সাহসে কুলাইল না। সে সেখান হইতে এক দৌড় দিয়া আমবাগানে পলাইল। গাছে কচি কচি আম ধরিয়াছে, যদি কিছু দুপুরবেলা একেলার জন্য সংগ্রহ করা যায়।

হৈমবতী ও মহামায়া করুণাকে লইয়া সিন্দুক খুলিয়া বাসন বাছিতে বসিলেন। হাল্কা দেখিয়া কাঁসা-পিতলের কিছু বাসন কলিকাতা লইয়া যাইতে হইবে। যে সকল বাসনের সঙ্গে তাঁহার মা-ঠাকুমার স্মৃতি জড়িত, সেগুলি হৈমবতী সযত্নে আলাদা করিয়া রাখিলেন, "এ সব সাত কালের জিনিস বাসাবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, কে কোথায় ভেঙে ছড়িয়ে নষ্ট করবে।"

ননদ সম্পর্কে ত বড়ই, বয়সেও অনেক বড়, কাজেই মহামায়া তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। হৈমবতী যাহা বাছিয়া দিলেন মহামায়া তাহাই করুণার হাতে দিয়া নিজের ঘরে পাঠাইলেন। নিজের পছন্দ ও মতামত প্রকাশ করিলেন না।

পাড়াগাঁয়ে কাঠের বাক্স পাওয়া যায় না, ছোটবড় ঝুড়িতে বাসনকোশন বসাইয়া কাপড়ে বাঁধা হইল। মহামায়ার টিনের ট্রাঙ্কে সুধা ও শিবুর সামান্য কাপড়চোপড় কাচিয়া কুচিয়া তোলা হইল। শহুরে দেশে কাপড়চোপড় যে বেশী লাগে এবিষয়ে মা ও পিসিমার গল্প শুনিয়াই সুধা কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহার আটপৌরে চারখানা শাড়ীর উপর আর মাত্র দুখানা ডুরে ও দুখানা নীলাম্বরী শাড়ী। একবার পিসিমা সখ করিয়া একখানা গুলবাহার শাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেইখানাই একমাত্র জমকালো শাড়ী। দাদামহাশয় তিন বৎসর আগে যে চন্দ্রকোণার চৌখুপী শাড়ী দিয়াছিলেন সেখানা সুধার ছোট হইয়া গিয়াছে। এই পাঁচখানা তোলা কাপড়ে শহরে সুধার মান থাকিবে কিনা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে মা'র চেয়ে ত সুধার মান বেশী নয়। মাও ত পাঁচ-ছয়খানা মাত্র ভাল কাপড় লইয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলিয়াছেন। তাঁতিনীরা শহরে কি আর কাপড় বেচিতে আসে না? পূজার সময় ব্যাপারীরা কলিকাতাতেও নিশ্চয় যায়। তাহাদের কাছে দুই-একখানা ডুরে কি চেলি যা দরকার বুঝিলে ঠিক কিনিয়া দিবেন। এ সামান্য জিনিস লইয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

হৈমবতী সধবাকালে এবং পরেও কিছুদিন কলিকাতা শহরে ছিলেন। সুধার কাপড়চোপড় গুছাইবার সময় তিনি বলিলেন; "দেখ বৌ, শহরে সব ঘাগরার উপর শাড়ী বেজিয়ে পরে, তাতে আবার সেপটিপিন। তোমাদের ত ঘাগরাও নেই, সেপটিপিনও নেই, লোকের কাছে খেলো হবে না ত!"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "দু-গজ কাপড় কিনে সুধার জন্যে ঘাগরা ক'রে দিলেই হবে। আমার বুড়ো বয়সে ওসবে কাজ নেই।"

হৈমবতী বলিলেন, "তবে এইখানেই ক'রে দাও না। একেবারে প'রে যাবে, নইলে সেখানে পরের দে'খে শেখার নাম হবে। আর ঐ লোহার সেপ্‌টিপিনগুলো যেন মেয়েকে পরিও না। একটা সোনার ক'রে দিও।"

মহামায়া বলিলেন, "আমাদের ছোট বউ বলছিল যে সেখানে পার্শি মাকড়ি পরার রেওয়াজ এখন আর নেই, এখন সব বল-ইয়ারিং পরে। সুধার মাকড়ি জোড়া ভারি আছে, ভেঙে দুল আর সেপ্‌টিপিন দুই হবে এখন।"

দু-গজ মার্কিন কাপড় কেনা হইল। কিন্তু মা ও পিসিমা দুইজনেই আধুনিক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ। পেটিকোটটা ঘাগ্‌রার সঙ্গে কোন্‌খানে স্বতন্ত্র তাহা তাঁহাদের জানা নাই। কিন্তু ঐ সামান্য ব্যাপারে হৈমবতী ভীত হন না, তিনি কাপড়ের টুক্‌রাটার দুই মুখ জুড়িয়া পাশবালিসের খোলের মত সেলাই করিয়া একটা কাপড়ের পাড় পরাইয়া কার্য্য সমাধা করিলেন। এই হইল সুধার আধুনিক সজ্জায় হাতে খড়ি। তবে আপাততঃ লোহার সেপ্‌টিপিনই পরিতে হইল, কারণ নয়ানজোড়ে তখন জাপানী গিল্টির ব্রোচ পাওয়া যাইত না।

সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে মহামায়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "আমাদের ত সব ব্যবস্থাই হ'ল; কিন্তু ঠাকুরঝি এই পাড়াগাঁয়ের দেশে ঐ ছেলেটাকে সম্বল ক'রে পড়ে থাকবেন, এইতেই যা ভাবনা।"

হৈমবতীর দর্পে ঘা লাগিল। তিনি যেন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আনন্দি বাম্‌নীর মেয়ে হেমি বাম্‌নী ভয় ডর কাউকে করে না। আমার মা ডাকাতের মুখে জুম্‌ড়ো ঠেসে দিয়েছিলেন, আমার ঠাকুমা বর্গীর হাঙ্গামের সময় সারা গাঁয়ে একলা ছিলেন আঁতুড়ের ছেলে নিয়ে। গাঁসুদ্ধ পালিয়ে গিয়েছিল, এক ঘটি জল দেবার লোক ছিল না, তবু তিনি ভয় পান নি।"

মা-ঠাকুরমার শৌর্যে হৈমবতী আপনার বর্ম গড়িতে চাহিলেও তাঁহার চোখের কোণটা হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

কথা ঘুরাইয়া মহামায়া বলিলেন, "তোমার সাহসের কথা কি আর জানি না ভাই? তার কথা হচ্ছে না। অসুখবিসুখের উপর ত মানুষের হাত নেই, সেই ভাবনাটাই আসল।"

হৈমবতী বলিলেন, "তোমরা নিজেদের সামলিও তাহলেই আমার অনেক উপকার হবে। আর ভাবনার কোন কারণ নেই।"

মহামায়া হৈমবতীর দুর্জয় অভিমানের পূর্বাভাস বুঝিতে পারিয়াছিলেন,

কিন্তু ননদের কাছে ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিবার সাহস তাঁহার ছিল না ; তিনি কোনও রকম দেখাইবার চেষ্টা করিলেন না, চুপ করিয়াই রহিলেন।

শাল ফুলের মধুর গন্ধে সমস্ত নয়ানজোড় ভরিয়া উঠিয়াছে, শিরীষ ফুল গাছ ভরিয়া যেন আকাশের দেবতার গায়ে চামর দোলাইতেছে, পলাশের রঙে বন আলো হইয়া উঠিয়াছে ; এমনই দিনে হৈমবতীর দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারই হাতে ঘরদ্বার সঁপিয়া চন্দ্রকান্ত স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সেই লখা মাঝির খড়পাতা গরুর গাড়ী, সেই বনের ভিতর রাঙা সিঁথির মত পথ, পথে আনন্দলহরী লইয়া বৈষ্ণব ভিক্ষুক গান করিতেছে "নিতাই আমার গৌর।"

মহামায়ার আঁচলে আজও হৈমবতী সিঁদুর-কৌটা বাঁধিয়া দিলেন, সুধাদের জন্য দিলেন কদমা ও টানালাড়ু ; কিন্তু এবার ত রতনজোড়ে মামার বাড়ী যাওয়া নয়, যন্ত্ররথের আশায় এ দূর ষ্টেশনের পথে যাত্রা। ঘরদ্বার, মরাই, পুকুর, ঘরের আসবাব, রান্নাঘরের শিলনোড়া যাঁতা সবই যেন পিছন হইতে ডাক দিতেছে,—শিবু, সুধা, ফিরে এস।

শিবু হাসিয়া সুধা কাঁদিয়া তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া গেল। পলাশের রঙে আলো বন্যপথে শিবুর হাস্যচটুল কণ্ঠের গান পিছনে রণিত হইতে লাগিল,

"জাম ফুল নাই ঘরে,
দুটো ভালুক হুঁকুর হুঁকুর করে।"

"মহামায়া বলিলেন, আর এদেশ ওদেশ করব না ; যেখানে যাব সেইখানেই খুঁটি গেড়ে বসব। কেবল গড়া আর ভাঙা, গড়া আর ভাঙা, মন এতে সায় দেয় না।"

এই কলিকাতা! এ যে একটা সম্পূর্ণ নূতন পৃথিবী! নয়ানজোড়ের সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ভিতর তাহারা সেই গোনা কয়টি মানুষ, আবার আরও কত দূরে তেঁতুলডাঙার গ্রামে তাহাদেরই আজন্ম-পরিচিত আর কয়েকটি মাত্র মানুষ! আর এখানে এ কি? মাগো, এ যে গুণিয়া শেষ করা যায় না। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন হইতে নামিবার পর গঙ্গার পোল পার হইয়া এত পথ আসিতে যতগুলা মানুষের অবিশ্রাম স্রোত দেখা গেল সুধা সারা জীবন ধরিয়াও এতগুলা মানুষ দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মানুষ তাহার এত কাছে ছিল, অথচ তাহার জীবনের সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোনও পরিচয় সে পায় নাই, ভাবিতেই বিস্ময়ে মন ভরিয়া উঠে। আর শুধু কি মানুষ? যত না মানুষ, তার দুগুণ যেন বাড়ী। সারা পৃথিবীতেই এত যে বাড়ী থাকিতে পারে তাহা সুধার ধারণা ছিল না।

স্টেশন হইতে একটা ভাড়াটে গাড়ীর মাথায় বাক্স বিছানা ঝুড়ি ঝোড়া চাপাইয়া পাড়ি দিতে হইল—সেই প্রায় খালের ধারে। কলিকাতা শহরের এক মোড় হইতে আর এক মোড় একদিনেই পার,—সুধাদের নবজাগ্রত বিস্ময় এত বড় ক্ষেত্রে যেন দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিল। একে ত গাড়ীটা ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া অর্ধেক জিনিষ চোখে পড়ে না, তাহাতে ভিতরেও বালতি কুঁজো হাঁড়িকুঁড়ির ভীড়ে নিরঙ্কুশ হইয়া বসা যায় না; শিবুর উত্তেজিত মন এত রকম বাধা ও বন্ধন মানিয়া চলিতে চাহিতেছিল না। সে বলিল, "মা, আমি গাড়ী থেকে নেমে প'ড়ে হাঁটি। দু-দিক্ ত দেখতে পাচ্ছি না। বড় তাড়াতাড়ি পথ পার হয়ে যাচ্ছে।"

মা বলিলেন, "গাড়ী থেকে একবার নামলে মানুষের তোড়ে কোথায় তলিয়ে যাবি, তোকে যে আর খুঁজেই পাব না রে! তার চেয়ে আজ গাড়ীতেই চল্, তার পর অন্য দিন হেঁটে দেখিস এখন, কলকাতা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না।"

শিবু চঞ্চল হইয়া বলিল, "না, আজকেই দেখব। অন্য দিন ত অনেক পরে হবে।"

সে দরজা খুলিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে আর কি? শিবুর চাঞ্চল্যের ছোঁয়াচ যেন ছোট খোকার মনেও সঞ্চারিত হইয়া গেল। ঘড় ঘড় করিয়া সারি সারি ট্রাম গাড়ী ঢং ঢং ঘণ্টা বাজাইয়া ছুটিতেছে দেখিয়া সে শিশি-বোতল বোঝাই বালতির ভিতরেই দুই পা নামাইয়া বঙ্কিম ভঙ্গীতে কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া নাচ সুরু করিয়া দিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "পাগলারা সব ক্ষেপে গেছে।"

মহামায়া বলিলেন, "ক্ষেপবে না? সভ্য জগৎটা ত তুমি ওদের এতদিন দেখতে দাও নি। আধমরা গরুর পাল আর নেংটিপরা সাঁওতালের ভীড় ছাড়া আর ত কিছু ওদের দেখা অভ্যাস নেই।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "সে ত ভালই হয়েছে। জন্মাবধি এই গদ্য পৃথিবী দেখা থাকলে এর ভিতর কোনও আনন্দের খোরাক খুঁজে বার করা শক্ত হত।"

গাড়ী হইতে নামিতে না পাইয়া শিবু প্রশ্নের সাহায্যেই তাহার কৌতূহলটা মিটাইবার চেষ্টা সুরু করিল। রাস্তার এ-মোড় হইতে ও-মোড় পর্যন্ত ঠাসা বাড়ী দেখিয়া সে বলিল, "মা, এখানে সব বাড়ী এমন এক সঙ্গে জোড়া দেওয়া কেন? বাগান নেই, মাঠ নেই, একটা পুকুরও নেই। লোকে চান করে না, বাসন মাজে না?"

মা বলিলেন, "সবই করে, বাসায় চল্, দেখতে পাবি। ঘরের ভিতর পুকুর তালাবন্ধ আছে।"

রাস্তার ধারে সারি সারি দোকান ঘরে চেনা অচেনা কত যে অসংখ্য জিনিস তাহার ঠিক নাই। খাওয়া পরা আর শোওয়া, মানুষের জীবনের এই ত সামান্য তিনটি উদ্দেশ্য, তাহার জন্য এমন অজস্র দ্রব্যসম্ভারের কি প্রয়োজন সুধা ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন করিয়া বোকা বনিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কাবুলীদের দোকানে স্তূপাকারে মেওয়া ও ফল, দিল্লীওয়ালার দোকানে জরির জুতা ও জরির টুপি, খেলনার দোকানে ঠিক মানুষের মত বড় বড় খোকা পুতুল, বাজনার দোকানে বড় বড় গ্রামোফোনের চোঙা, ফুটপাথের উপর নানারঙের কাচের বাসন ও অচেনা

পরিচ্ছদ, এগুলি সত্যই মানুষের জীবনযাত্রায় কোনও সাহায্য করে, না তামাসা করিয়া কেহ সাজাইয়া রাখিয়াছে বোঝা শক্ত। মেওয়া দেখা সুধার অভ্যাস নাই, ফলও সে যা দেখিয়াছে তাহা ত তাহারা গাছ হইতেই পাড়িয়া খায়, তাহার কোনটারই এমন চেহারা নয়; গ্রামোফোনের চোঙার কাছাকাছি কোনও জিনিসের সঙ্গেও সুধা-শিবুর কখনও পরিচয়ই হয় নাই। মাংসের দোকানে ছালছাড়ানো আস্ত জীবদেহ দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়া সুধার রুচি ও সৌন্দর্যবোধে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে ভবিষ্যৎ জীবনে সে কখনও মাংসের দোকানের সম্মুখে চোখ খুলিত না। কাচের বাসন দেখিয়া শিবু ত চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা দেখ, দেখ, কাচের আবার বাটি বানিয়েছে, থালা বানিয়েছে। ওতে কি কেউ খায় নাকি?"

মা বলিলেন, "সাহেবরা খায়! তোদের মত পাড়াগেঁয়েরা খায় না।"

কাঁসা পিতলের বাসন, তক্তাপোষ, বিছানা মাদুর ও কাপড় গামছার উপরে মানুষের যে আর কিছুর কেন প্রয়োজন হয় ভাবিয়া সুধা নিজের মনের কাছে কোনও সদুত্তর পাইতেছিল না। নিজেকে অজ্ঞ ভাবিতে তাহার আত্মসম্মান খুব যে ক্ষুণ্ণ হইল তাহা নয়, তবু নগরবাসীদের মস্তিষ্কের উপরে তাহার শ্রদ্ধা একটু কমিয়া গেল এই অনর্থক প্রয়োজন সৃষ্টির বিপুল বাহিনী দেখিয়া।

রাস্তাজোড়া নিরেট বাড়ীর মাঝে মাঝে ফাটলের মত সরু সরু গলি। সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "এর ভিতর দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় বাবা? ওদিক্‌টা ত দেখা যায় না।"

শিবু বলিল, "জান না? একে বলে সুড়ঙ্গ। আমার বইয়ে ত আছে।"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "না, একে সুড়ঙ্গ বলে না, একে বলে গলি।"

ক্রমে বাড়ীর উচ্চতা ও ঠাসাঠাসি একটু কমিয়া আসিল। মাঝে মাঝে দুই-চারিটা পোড়ো জমি ও জীর্ণ খোলার বস্তি দেখা যায়। আকাশ গাছপালা সবই এখন কিছু কিছু চোখে পড়ে। এ আর একেবারে চটমোড়া বড়বাজারের রূপ নয়।

এইখানেই একটা গলির মুখে গাড়ীটা দাঁড়াইয়া পড়িল। সুধা ও শিবু উদ্‌গ্রীব হইয়া বাহিরের দিকে চাহিল। প্রকাণ্ড একটা লাল রঙের বাড়ী, একদিকে বড় রাস্তা, একদিকে গলি। বাগান উঠান নাই বটে, কিন্তু রাস্তার

উপরেই প্রতি তলায় বড় বড় বারান্দা, সেখানে বসিলে সব পথটা দেখা যায়। সামনেই তিন ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, ফুটপাতের থেকে উঠিয়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় শেষ হইয়াছে। এমন পালিশ-করা পাথর শিবু কখনও দেখে নাই, শুধু এই কারণেই বাড়ীটা তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়া গেল। গাড়ী হইতে প্রায় লাফাইয়া পড়িয়া সে বারান্দাটায় চড়িয়া দাঁড়াইল। দরজাটায় সজোরে ধাক্কা দিল, বেশ নক্সাকাটা দরজা কিন্তু কেহ খুলিয়া দিল না। মহামায়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বোকা, পরের দরজা ঠেঙিয়ে ভাঙিস্ না।"

শিবু মা'র কথায় নিরাশ হইয়া প্রশ্নের সুরে বলিল, "কেন, এটা ত আমাদের বাড়ী?"

মহামায়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি যে লাখ টাকা দিয়ে কিনেছ।"

গলির দিক্ দিয়া পৈতা গলায় একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান ন্যাড়ামাথা বাহির করিয়া আসিয়া বলিল, "এই দিকে বাবু, এই দিকে। ভাড়া-ঘর এধারে।"

গলির দরজা খুলিয়া গেল; একেবারে চৌকাঠ হইতেই সোজা দোতলায় উঠিবার সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, দরজায় দুমিনিট অপেক্ষা করিবার জন্যও এক হাত স্থান নাই। এ-সিঁড়ির বাঁক আরম্ভ হইবার মুখেই একদিকে রান্নাঘর ও অপর দিকে পায়খানা, তাহারই পাশে খাবার ঘর। একটুও স্থানের অপব্যয় নাই, মানুষের শুচিবায়ুগ্রস্ত হইবার কোনও অবকাশ নাই। সামনের কালোপাড়-দেওয়া শ্বেতপাথরের বারান্দা দেখিয়া শিবু যেমন খুশী হইয়াছিল, এই অন্ধকার খাঁচা দেখিয়া তাহার মন তেমনই মুষড়িয়া গেল। মাথার উপরের ছাদ পর্য্যন্ত এত নীচু যে লম্বা মানুষ হাত তুলিয়া দাঁড়াইলে ছাদে হাত ঠেকিয়া যায়। সুধা বিস্মিত চোখে ছাদের দিকে তাকাইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চাহিল। চন্দ্রকান্ত ছোট খোকাকে মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে ছাদে ঠেকাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোমরা ভগ্নাংশের সিঁড়ির অঙ্ক শিখেছ ত? নীচে একতলা, তারপর সিঁড়ি ভেঙে দেড়তলা, তার পর সিঁড়ি ভেঙে দোতলা, বুঝলে।"

দেড়তলা হইতে সিঁড়িটা গোল থামের মত সোজা দোতলা ছাড়াইয়া একেবারে তিনতলায় গিয়া একটুখানি চাতালের উপর শেষ হইয়াছে। সিঁড়ির গায়ে দুই পাশেই মাঝে মাঝে দরজা, কিন্তু সেগুলির গায়ে সযত্নে পেরেক মারা। বুঝা যায় এই সিঁড়ি দিয়া এই সব পথে ঢোকা নিষিদ্ধ। তিনতলায়

দুইখানি মাত্র ঘর আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের ভিক্ষান্নের মত একটুখানি খোলা ছাদ। ছাদে দাঁড়াইলে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকেই ঘর দেখা যায়, কিন্তু সে ঘরগুলির অধিবাসী স্বতন্ত্র। ঘরে ঘরে জানালার কাছে ছোট বড় নানা মাপের মানুষের কুতূহলী দৃষ্টি দেখিয়া শিবু মহামায়ার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল, "এটা কাদের বাড়ী মা? এত মানুষ চারধারে। এদের সঙ্গে আমরা থাকব কি ক'রে?"

মহামায়া বলিলেন, "ও সব আলাদা আলাদা বাসা রে, কলকাতায় এই-রকমই হয়।"

সুধা ও শিবু ছাদের আলিশার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া বুড়া আঙুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের এই উপর নীচের চারখানা ঘরে যদিও দৃষ্টি আশে-পাশের সকলেরই পড়ে, তবু সশরীরে উপস্থিত হইবার নিষ্কণ্টক পথ কাহারও নাই। বোঝা গেল, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন এলাকা। এ বাড়ীর কর্তা শ্বেত পাথরে মোড়া অংশ নিজে রাখিয়া খিড়কির সিঁড়ি দিয়া কিছু অংশ ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আশে-পাশের অনেক বাড়ীতেই সেই রকম বন্দোবস্ত। সুতরাং ভাড়াটে অংশগুলি সব পরস্পরের খুব গায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তার উপর খিড়কির দিক্ বলিয়া বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটে সকলেরই শৌচাগারের ভীড় এই দিকে বেশী।

বাহিরের নূতন জগৎটা যতক্ষণ দেখিতেছিল ততক্ষণ তাহার অভিনবত্বে বিস্ময়ের খোরাক বেশী ছিল বলিয়াই তাহাতে শিবুর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু গৃহের আবেষ্টনে বিস্ময় বেদনারই কারণ হইয়া উঠিল। বাহিরে যেমন অপরিচয়েই আনন্দ, ঘরের ভিতরে তেমনই পরিচিতের স্পর্শেই শান্তি ও বিশ্রাম। যে-গৃহকে সুধারা আজন্ম বাড়ী বলিয়া জানে তাহাকে এই বিস্ময়লোকের ভিতর কোথায়ও এক বিন্দু খুঁজিয়া না পাইয়া দুইজনেরই মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। দিনের পর দিন ইহারই ভিতর তাহারা কাটাইবে কি করিয়া?

কিন্তু শিবু সহজে দমিবার পাত্র নয় বলিয়া ছোট্ট চাতালের উপর স্তূপীকৃত বিছানার গাদায় বসিয়া পড়িয়াই গান ধরিয়া দিল,

"দন্থি কলহেতার শহর, অষ্ট পহর
চলতি আছে টেরাম গাড়ী।

নামিয়ে গাড়ীর থনে ইষ্টিশানে, মনে মনে আমেজ করি,

আইলাম কি গণি মিঞার রংমহালে

ডাহার জিলায় বর্শ্যাল ছাড়ি।”

মহামায়া শ্রান্ত দেহখানি একটা তক্তাপোষের উপর ঢালিয়া দিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, “ঠাকুরঝি থাকলে এরই ভিতর একটা শৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারতেন। আমি ত একেবারে কাজের বার। সুধা, দেখ্ দেখি মা, বাচ্চাটাকে অন্ততঃ একটু কাগজ টাগজ জ্বেলে দুধটুকু গিলিয়ে দিতে পারিস্ কিনা। এর পর আবার দুধ পাব কিনা তাই বা কে জানে?”

একটা মেলিন্‌স্ ফুডের বোতলে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ ক্রমাগত গাড়ীর নাড়া পাইয়া পাইয়া প্রায় ঘোল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মাখন-ভাসা দুধটা বাল্‌তির ভিতর হইতে বাহির করিয়া সুধা বলিল, “এটা কি ভাল আছে মা? খোকনের যদি অসুখ করে এটা খেয়ে!”

মহামায়া খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “তবে দেখ্ যদি টিনের বাক্সে ফুড্ টুড্ কিছু থাকে। আমার ত বাছা পা দুটো এমন অবশ হয়ে গেছে যে টেনেও তুলতে পারছি না।”

টিনের বাক্স খুঁজিতে হইল না। সুধাদের কথাবার্তা পিছন হইতে শুনিতে শুনিতে যে প্রসন্নমূর্তি ভদ্রলোক উঠিতেছিলেন তিনি বলিলেন, “থাক্ থাক্ খুকী, আমি টাট্‌কা দুধ এনেছি। ছাতাটা খুঁজতে খুঁজতে এত দেরী হয়ে গেল যে স্টেশনে আর হাজিরা দিতে পারি নি। আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন।”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “ছাতি-হারানোর পর্ব আর আপনার এ-জীবনে মিটল না।”

সে কথার উত্তর না দিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, “নূতন বাড়ীতে উনুন-টুনুন কিছু আছে কি খুকী? দুধটা ত জ্বাল দেওয়া হয় নি!”

শিবু মাঝখান হইতে ফোড়ন দিল, “দিদির নাম ত খুকী নয়, ও সুধা।”

ভদ্রলোক বলিলেন, “বাঃ, দিব্যি ত মিষ্টি নামটি তোমার, আমার সঙ্গে মিলও আছে, আমার নাম একটুখানি বাঁকিয়ে সুধীন্দ্র। আর কাজেও আমি তোমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, ফুড্ তৈরি করতে পারি না মনে করছ? আমি ভাতও রাঁধতে পারি। একদিন তোমাদের রেঁধে খাওয়াব।”

সুধা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু নীরবে এমন করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে সেও রাজি হইল না, বলিল, "ওঃ, ভারি ত, ভাত ডাল মাছের ঝোল, কুলের অম্বল, সবই আমি রাঁধতে পারি। আপনি মাকে জিগ্‌গেষ করুন।"

মহামায়া বলিলেন, "তা ও সত্যিই বলেছে। আমি ত অকর্মার একশেষ, মেয়ে কিন্তু আমার খুব কাজের। ছেলেটাকে ত ওই মানুষ করলে।"

শিবু বিচক্ষণ বিচারকের মত মুখ করিয়া বলিল, "মেয়ে মানুষরা ত সবাই রান্না করে, কিন্তু বাবুরা ত আর করে না। বাবা ত কিচ্ছু রাঁধতে পারেন না, খালি খান।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "সত্যি, এমন অনধিকারচর্চা আমার করা উচিত নয়, তবে শিবুও বিবর্তনের কল্যাণে এ বিষয়ে পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে হয়েছে তা বলতে পারি না। সুতরাং জয়টীকাটা সুধীনবাবুরই প্রাপ্য।"

সুধা বলিল, "দুধের বাসনটা দিন, আমি কাগজ জ্বেলে গরম ক'রে ফেলি একপোয়া, নইলে খোকা ভীষণ চেঁচাবে।"

সুধীনবাবু বলিলেন, "আগুন জ্বালতে গিয়ে কাপড়ে যেন ধরিয়ে বোসো না, সাবধান!"

সুধা হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন, আমি কি কচি খুকী!"

শিবু বলিল, "দিদি বারো পূরে তেরোয় পা দিয়েছে, আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, খোকনের চেয়ে সাড়ে-ন' বছরের।"

সুধীন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুমি ত দেখছি খুব ভাল আঁক কষতে পার, না খোকা?"

শিবু বলিল, "খুব ভাল পারি না, দিদিই বেশী ভাল পারে। তবে আমি মিশ্র যোগ বিয়োগ শিখেছি, আর ইস্কুলে ভর্তি হলে আরও অনেক শিখে ফেলব। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ আমি দিদির চেয়ে ভাল করতে পারি।

'রে রে বক নিশাচর আয় রে সত্বর।
এত বলি ডাকে ভীম বীর বৃকোদর।'

আপনি মুখস্থ বলতে পারেন?"

সুধীন্দ্রবাবু ভীত মুখ করিয়া বলিলেন, "নাঃ, ও সব বিদ্যে আমার নেই। তবে খাওয়ার পরীক্ষা যদি নাও ত বৃকোদরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমিও পারি।"

সুধা একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তাহলে শিবুর সঙ্গেই আপনার নামের মিল বেশী, ও এত বেশী গেলে যে পিসিমা ওকে ভীমসেন বলেন।"

শিবু বলিল, "সে বাপু, আমি খাবই। আমি বিধবা হলে মোটেই পিসিমার মত একাদশী করব না।"

সুধীন্দ্রবাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "এইবার শিবুবাবু ঠ'কে গেছ, পুরুষ মানুষে কি বিধবা হয়?"

পরাজয়ের লজ্জায় শিবুর সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

মহামায়া বলিলেন, "ও ডেঁপো ছেলেটাকে আপনি আর আস্কারা দেবেন না। আমার ঘর-সংসারের ব্যবস্থা কি করলেন তাই আগে বলুন। আপনার উপরই ত আমার সব ভরসা। আমি ত কুটো ভাঙতেও পারি না, লোক না হলে খেটে খেটে মেয়েটার জিভ বেরিয়ে পড়বে।"

সুধীন্দ্রবাবু একটু লজ্জিত স্বরে বলিলেন, "লোক ঠিকই তৈরি আছে, আমি খবর দিতে একটু দেরী ক'রে ফেলেছিলাম তাই এখন এসে উঠতে পারল না। ভোর বেলা ঠিক আসবে। আর সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়ী থেকে আপনাদের জন্যে যৎসামান্য কিছু খাবার আসবে। ইতিমধ্যে সুধার সাহায্য পেলে বাকি কাজগুলো আমি ক'রে দিতে পারি।"

সুধাও যে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না তাহা বুঝাইবার জন্য ডুরে কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া বিছানার গাদার উপর দুই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দড়ির গিঁট খুলিতে লাগিল। বিছানার পুলিন্দার ভিতর হইতে বিছানা-পদবাচ্য নয় এমন বহুৎ জিনিস বাহির হইয়া পড়িল। ছাতা, লাঠি, ঝাঁটা, তোয়ালে, ধুতি, শাড়ী, যাহা কিছুই সঙ্কীর্ণ আয়তনের আধারে ঠাঁই পায় নাই, সবই নির্বিচারে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীর মত এখানে একাসনে বসিয়া পড়িয়াছে। সেইগুলিকে বাছাই করিয়া সুধা বিছানাগুলাকে ঝাড়িয়া তক্তাপোষের উপরে তুলিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "রন্ধনবিদ্যায় আমার অপটুতা সর্বজনবিদিত হলেও জল তোলায় আমার খ্যাতি আছে। তোমাদের শৃঙ্খলিতা গঙ্গাদেবীর কারাগৃহটি কোথায় ব'লে দাও, জল আমি সবটাই তুলে আনি।"

শিবু বলিল, "আমিও কাজ করতে পারি," বলিয়াই বাল্তির গর্ভ হইতে বাসনকোশন সব মেঝেয় নামাইয়া সে জলপাত্র জোগাড় করিতে লাগিল।

একটা শূন্যগর্ভ বালতিকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইতে গিয়া ছোট খোকা সেটাকে নিজের মাথার উপরই উপুড় করিয়া দিল। মহামায়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "ছেলেটাকে একটা খাটের খুরোর সঙ্গে বেঁধে রেখে বাপু তোমরা কাজকর্ম কর, নইলে গড়িয়ে ও ত সদর রাস্তায় গিয়ে পড়বে।"

বালতির ভিতরের অন্ধ কারাগার হইতে খোকন কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমা তুপি খুলে দাও।"

সুধীন্দ্রবাবুর সাহায্যে সেদিনকার মত আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা হইয়া গেল। তিনি বিদায় লইবার সময় সংসারচক্রের আবর্তনে যতখানি সহায়তা তাঁহার পক্ষে করা সম্ভব সবই করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া বন্ধু-পরিবারকে আশ্বস্ত করিয়া গেলেন।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকাইয়া পিসিমার কঠিন কোমল মুখখানির কথাই বার বার সুধার মনে পড়িতেছিল। মৃগাঙ্ক দাদাকে একলা ভাত বাড়িয়া দিয়া পিসিমা হয়ত আজ জলও না খাইয়া মেঝের উপরই শুইয়া পড়িয়াছেন। হয়ত শূন্য প্রায় বাড়িতে বিনিদ্র চক্ষে সুধারই মত রাত্রির প্রহর গুনিতেছেন।

ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে। অপরিচিত আবেষ্টন অন্ধকার আকাশের অতি ক্ষীণ তারার আলোকে আরও অপরিচিত অনন্ত রহস্যময় মনে হইতেছে। সুধা কি পিসিমার ঘরের মাচার উপর আজ বিছানা করিয়া ঘুমাইয়াছিল, তাহার পর একলা পাইয়া আরব্য উপন্যাসের দৈত্য, চীন রাজকুমারী বেদুরার মত ঘুমন্ত সুধাকে শয্যা সমেত আকাশপথে উড়াইয়া আনিয়াছে? অর্দ্ধ ঘুমে অর্ধ জাগরণে সমস্ত পৃথিবীর বিচিত্র পরিবর্তনশীল রূপ দেখিতে দেখিতে সুধা এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? পূর্ব দিকের আকাশের গায়ে আকাশস্পর্শী একটি স্তম্ভের মুখ হইতে ঘন কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়া প্রকাণ্ড অস্পষ্ট সরীসৃপের মত বাঁকিয়া বাঁকিয়া উর্ধ্বপথে কোথায় গিয়া মিলাইয়া যাইতেছে! এখনই হয়ত আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতই স্পষ্ট রূপ ধরিয়া সুধাকে আবার পিসিমার কোলের কাছে লইয়া গিয়া নামাইয়া দিবে, অথবা এ তাহার বিদায়-ছবি, হয়ত তাহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুধাকে রাত্রি-শেষে উঠিয়া নূতন জগতে নূতন পথ, নূতন বন্ধনের সন্ধানে ঘুরিতে হইবে।

১২

সারি সারি তেল-কলের ধূমোদ্গারী চিম্‌নির পাশে ধূম্রপঙ্কিল আকাশের নীচের এই খাঁচার মত বাড়িটিতে নূতন করিয়া সংসার শুরু হইল। চিম্‌নীর গায়ে মাঝে মাঝে দুই-চারিটি তাল ও নারিকেল গাছ দেখা যায়, আর কুলি ব্যারাকের একটা পাকা বাড়ীর সাম্‌নে একটা পুকুরে অষ্ট প্রহর মজুরদের ছেলেরা স্নান করে ও ঝাঁপাই জোড়ে। এই দুইটি জিনিসেই পুরাতন পৃথিবীর একটুখানি আমেজ লাগিয়া আছে, নহিলে ইহাকে পাতালপুরী কি নাগলোক বলিলেও সুধার অবিশ্বাস হইত না। বাসুকীর মাথার ঠিক উপরেই বোধ হয় এই কলিকাতা শহর, তাই সারাদিনরাত্রিই ঘর বাড়ী এমন থর থর করিয়া কাঁপে! পথে অহরহ যে ভারী ভারী গাড়িগুলা চলে তাহারাই যে মাতা ধরিত্রীর বুকে এমন শিহরণ তুলে তাহা বুঝিতে সুধার কিছু দিন সময় লাগিয়াছিল।

জনবিরল নয়ানজোড়ে যেটুকুও বা মানুষের সঙ্গ পাওয়া যাইত, এখানে তাহার সিকিও পাওয়া যায় না। উর্ম্মিমুখর বেলাভূমিতে বসিয়া নিঃসঙ্গ মানুষ সারাদিন সমুদ্রের বিচিত্র রাগিণী শুনিলেও যেমন তাহার ভাষা বুঝে না, এ অনেকটা সেই রকম। ভোর হইতে কত বিচিত্র শব্দতরঙ্গই যে কানের উপর দিয়া ভাসিয়া যায় তাহার ঠিক নাই, কিন্তু এ বিশাল নগরীর অষ্টপ্রহরের ভাষা বুঝিতে সময় লাগে। গলির ভিতরে বাড়ী, রাজপথের জীবনলীলা চোখে পড়ে না, কিন্তু ধ্বনি জানাইয়া দেয় একের পর এক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের পটক্ষেপ হইতেছে। ভোরবেলা ঘুম চোখ হইতে ছাড়িবার আগেই তৈলহীন রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি ও এক বোঝা বাসন আছড়ানোর মত ধাতব আর্ত্তনাদে সুখস্বপ্নের শেষ রেশটুকু মিলাইয়া যায়; তার পর নিকটে শোনা যায় পিচকারীর জলের ঝর্ঝর শব্দ আর দূর হইতে কানে আসে সুদীর্ঘ অনুনাসিক সুরে কত বাঁশির আকাশ-কাঁপানো ডাক। মহামায়া বাঁশির শব্দেই শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিতেন "ঐগো, তোমাদের শ্যামের বাঁশি বাজল।"

সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া রাজপথের অগণ্য বিচিত্র যানবাহন তাহাদের বিচিত্র ভাষায় সশঙ্কিত পথিককুলকে সতর্ক করিতে করিতে চলিয়াছে। কেহ ভারী

গুরুগম্ভীর গলায় থাকিয়া থাকিয়া বলে "ঢং ঢং", কেহ একটানা ছন্দে গাহিয়া চলিয়াছে "ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্", কেহ ক্ষীণ মৃদুতালে একটি ঘুঙুর বাজাইয়া চলিয়াছে "টুংটাং, টুংটাং," কেহ বড় মানুষের ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের মত একবার তীব্র গর্জন করিয়া ঝড়ের বেগে চলিয়া যাইতেছে, কেহ চপল বালকের মত অর্দ্ধেক ডাক অসমাপ্ত রাখিয়াই দৌড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের চলার হ্রস্ব ও দীর্ঘ তাল, তাহাদের বাণীর তীব্র ও মধুর স্বর মনে নানা ছবি জাগাইয়া তুলে কিন্তু সে তুরঙ্গগামিনী বাষ্পবাহিনীদের ত চোখে দেখা যায় না।

গলিতে রমণীর সুতীব্র কণ্ঠ ডাকিয়া বলে, "মা-আ-টি লিবি গো-ও," কিন্তু পৃথিবীতে মাটির মত সুলভ জিনিসকে এমন করিয়া হাঁকিয়া বেড়াইবার কি প্রয়োজন আছে শহরে নবাগতা সুধা বুঝে না। পুরুষের কণ্ঠ বলে, "কাপ্ড়া-ওয়ালা—আ," "বডি-জামা-সেমিজ" "জয়নগরের মোয়া।" অন্ন-বস্ত্রের কথা না বুঝিয়া উপায় নাই, বুঝিতেই হয়। হঠাৎ শুনা যায় শিশুকণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিতেছে, "নথিং, নট্ কিচ্ছু ;" তাহারা যে পৃথিবীর অনিত্যতার বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছে না এ কথা বুঝা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু তবু প্রকৃত তত্ত্ব অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলা আশেপাশের নানা বাড়ী হইতেই গানের সুর ভাসিয়া আসে। মেসের ছেলেরা গায়, "যদি এসেছ এসেছ বঁধু হে দয়া করে কুটীরে আমারি।" বাড়ীওয়ালার বাড়ী হইতে কলের সুর আসে,

"আহা, জাগি পোহা'ল বিভাবরী"
অতি ক্লান্ত নয়ন তব, সুন্দরী।"

গলির ওপারের বাড়ীর মেয়েরা ওস্তাদজীর সহিত গলা মিলাইয়া গায়, "আজু শ্যাম মোহলীন বাঁশরি বাজাওয়ে কে?" সঙ্গে সঙ্গে এস্রাজের ছড় ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। গান শুনিয়া শিবুর দিল খুলিয়া যায়, সেও গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে চড়িয়া দুই হাতে ট্যাঙ্ক পিটাইয়া মেসের ছেলেদের ভঙ্গীতে গাহিতে শুরু করিয়া দেয়,

"যদি পরাণে না জাগে সেই আকুল পিয়াসা,
পায়ে ধরি, ভালবেসো না।"

মহামায়া রাগ করিয়া বলেন, "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, আর গান খুঁজে পাস্ না? তোর বাবা যে রোজ সকালে গান করেন তার একটা শিখতে পারলি না, সবার আগে ওই মেসের ছেলেদের গানগুলো মাথায় ঢুকল!"

শিবু বলে, "ওদের গান ভেঙাতে আছে, বাবার গান ভেঙাতে নেই।"

সুধার কানে মহানগরীর বাণী দিনরাত্রি আসিতেছে, কিন্তু সে বাণীর সহিত তাহার বাণীর আদান-প্রদান নাই।

মহামায়া হাঁটিতে চলিতে কষ্ট পান, তাই পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করা হয় নাই, পাড়ার মেয়েরাও কেবল সুধার মত ছেলেমানুষকে দেখিয়া বেশী আসিবার আগ্রহ দেখায় না। সুধা গৃহিণীদের সঙ্গে কথা বলিতে ত লজ্জাই পায়; কিশোরীদেরও পাউডার-শোভিত মুখ, চওড়া রঙীন ফিতার ফাঁস বাঁধা বিনুনি এবং ফাঁপানো এলো খোঁপার পারিপাট্য দেখিয়া কাছে যাইতে ভরসা হয় না। মহামায়া বলেন বটে, "হ্যাঁরে, ইস্কুলে-টিস্কুলে ভর্তি হবি, এইসব মেয়েদের একটু জিগেস করিস্, কোথায় কেমন পড়ায়-টড়ায়?"

সুধা বলে, "সে সব আমি পারব না, তোমরা যেখানে হয় ভর্তি ক'রে দিও।"

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মেয়েকে ফিরিঙ্গি ইস্কুলে দেবে নাকি গো, খুব কায়দাদুরস্ত ইংরিজী বলতে পারবে! বাড়ীওয়ালার মেয়েরা ত যায়ই, সেই সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি।"

মহামায়া বলিয়াছিলেন, "না বাপু, আমার গরীবের অত ঘোড়া-রোগে কাজ নেই। গোছা গোছা টাকা মাইনে, পোষাক, গাড়ী ব'লে গুণবে কোথা থেকে? তুমি একটু ইস্কুলের পর পড়িও-টড়িও, তাহলেই যা সাদা-মাটা শিখবে তাইতেই আমাদের গেরস্তর ঘরে চ'লে যাবে।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "কিন্তু যে গেরস্তর বাড়ী যাবে তার যদি মন না ওঠে?"

মহামায়া বলিলেন, "না ওঠে নিজের ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে, তাই ব'লে ঋণ-কর্জ ক'রে আমি এখন থেকে পরের মন যোগাতে পারব না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "তবে ত তুমি ভারী বাঙালীর মেয়ে! মেয়ে জন্মাবার দিন থেকে বেয়াই জামাইয়ের মন বুঝে যদি না চললে তবে কলিযুগে জন্মালে কি করতে?"

মহামায়া বলিলেন, "অত গোলামী আমার দ্বারা হবে না বাপু; আমার মেয়ে আমার থাকবে, কারুর গরজ পড়ে ত সে আপনার গরজেই নিতে আসবে।"

চন্দ্রকান্তের আয় কম, মহামায়ার নজরও সেকেলে, কাজেই মেয়েকে

সাধারণ দেশী ইস্কুলেই দেওয়া ঠিক হইল। তবে এই কয়টা মাস বাড়ীতে ইস্কুলের মত গড়িয়া পিটিয়া লইয়া একেবারে ইংরেজী বৎসরের গোড়াতেই ছেলেমেয়ে দুইজনকে স্কুলে দেওয়া হইবে। সাত-আট মাসে মহামায়ার চিকিৎসাও একটু অগ্রসর হইতে পারিবে। কচি ছেলেটাকে ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া সুধা যদি সারাদিনের মত বিদ্যাচর্চা করিতে চলিয়া যায় তাহা হইলে চিকিৎসকের কথামত ত মহামায়া একচুলও চলিতে পারিবেন না। এই ত চার হাত মাচার মত বাড়ী আর এই গড়ানে সিঁড়ি, ছেলে একবার গড়াইতে শুরু করিলে মনুষ্যাকৃতি আর থাকিবে না। তা ছাড়া এক পা ত এখানে সোজা বাড়াইবার জো নাই, নাওয়া, খাওয়া, জল তোলা, ফাইফরমাস, সব কাজেতেই কেবল সিঁড়ি আর সিঁড়ি। এই ক'টা মাস যদি ভগবান একটু মুখ তুলিয়া চাহেন তখন না-হয় নিজেই কোনরকমে সিঁড়ি ভাঙা যাইবে। এখন অন্ধের হাতের নড়ি কাড়িয়া লওয়ার মত সুধাকে সরাইলে মহামায়া ত একেবারে অচল।

এখানে আসিয়া সুধা শিবুর সে শৈশব-স্বপ্ন ঘুচিয়া গিয়াছে। পুরুষ জাতি বলিয়া যে ভিন্ন জাতি আছে, তাহাদের খেলাধূলাও যে স্ত্রীজাতির খেলাধূলা হইতে ভিন্ন, শিবু কলিকাতায় আসিয়া অকস্মাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। দিদির সঙ্গে কাল্পনিক মহাসমুদ্র হইতে কাল্পনিক মুক্তা প্রবাল সংগ্রহে আর তাহার উৎসাহ নাই। গলির ভিতরেই পাড়ার ছেলেদের অতি বাস্তব একটা সাইকেল হইতে বার দশেক আছাড় খাইয়া হাঁটু ও কনুই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া একান্ত নিজস্ব একটা সাইকেল সংগ্রহ করিবার জন্য সে দিবারাত্রি মার পিছনে লাগিয়াই আছে। অবসর সময়ে হাই-জাম্প্, লং-জাম্প্ প্রভৃতি তাহার যাবতীয় নবার্জিত বিদ্যায় সে যে পাড়ার কাহারও অপেক্ষা ছোট নয় তাহাই মহামায়াকে বুঝাইতে গিয়া দিদির সঙ্গে খেলাধূলার তাহার আর সময়ই হয় না।

মহামায়া বলেন, "বাপু, ছেলেটাকে তুমি ভাঙা বছরেই ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও, হাই-জাম্প্ ক'রে ক'রে ত আমার বাক্স পেটরা সব গুঁড়িয়ে গেল, তার উপর আবার সুধীনবাবু একটা তালের মত ফুটবল কিনে দিয়ে একেবারে সোনায় সোহাগা হয়েছে। পরের দরজা জানালার কাঁচ ভেঙে যে নির্ম্মূল কচ্ছে, তার দাম দেব কোথা থেকে?"

চন্দ্রকান্ত বলেন, "নিতে ত পারি আমাদেরই ইস্কুলে; কিন্তু পাছে হেডমাষ্টারের ছেলের নমুনা দে'খে ইস্কুল সুদ্ধ বিগড়ে যায় তাই সাহস হয় না।"

মহামায়া বলিলেন, "তবে তুমি একটা ছাতুখোর পালোয়ান রেখে দাও, সকালে উঠেই সাত শ' বার কান ধরিয়ে 'উঠ্ বোস্' করাবে, তাহলে আর ছেলের এত ধিঙ্গীপনা করবার জোর থাকবে না।"

শিবু বলিল, "ডনবৈঠক ত? তা করলে ত আমার আরও জোর বাড়বে। আজই রাখ না পালোয়ান!"

মহামায়া বলিলেন, "তবে তোকে একটা ঘানি গাছে যুতে দেব, আমার পয়সাও রোজগার হবে, জিনিসও নষ্ট হবে না।"

শিবু বলিল, "আচ্ছা, তাই দিও, কিন্তু এখানে ঘানিগাছ বসাবার ত জায়গা নেই, তাহলে আবার নয়ানজোড়ে ফিরে যেতে হবে।"

বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট-পরা নূতন নূতন ডাক্তার আসিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে তাহাদের দুই-তিনটা করিয়া চামড়ার ও ষ্টিলের বড় বড় বাক্স। একঘণ্টা ধরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহারা মহামায়াকে পরীক্ষা করে, যাইবার সময় প্রতিদিন সাবান গরম জল দিয়া হাত ধুইয়া পকেটে এক মুঠা টাকা পূরিয়া অনেকগুলা দুর্বোধ্য কথা বলিয়া ও এক টুকরা সাদা কাগজে ওষুধ লিখিয়া হাস্যমুখে ব্যস্ত দ্রুত গতিতে গাড়ীতে গিয়া উঠে, কিন্তু মহামায়ার মুখ ক্রমশঃই শীর্ণ বিষণ্ণ হইয়া আসে। একজন চিকিৎসকের কথামত দুই-এক সপ্তাহ বিছানায় শুইয়া থাকিয়া তিন-চার বোতল ঔষধ শেষ করিয়াও যখন মহামায়ার কোনও বাহ্য উন্নতি দেখা যায় না, তখন চন্দ্রকান্ত ক্লিষ্ট মুখে আরও একজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া আসেন। এবারও সেই বড় বড় বাক্স, সেই হাত ধোয়া, টাকা গোনা, ঔষধ লেখা, বন্দিনী মহামায়াকে আরও বন্দীকরণ, কিন্তু কিছুই হয় না, অবশ অঙ্গ স্ববশে আসে না।

মাথায় কড়া-ইস্ত্রী-করা সাদা রুমাল বাঁধিয়া সুশুভ্র বিলাতী পোষাক-পরা নার্স দিন কতক আনাগোনা করিয়া সাদা এনামেল-করা গামলা, ডুস, রবার-ব্যাগ, স্পঞ্জ, তোয়ালেতে ঘর ভরাইয়া দিল, ক্ষুদ্র রান্নাঘরে মাস-খানেক খাওয়া-দাওয়ার চেয়ে গরম জলের আয়োজনই বেশী হইল, তবু মহামায়ার দুর্বল অঙ্গে রক্তের জোয়ার ফিরিয়া আসিল না। কালো মোটা হিন্দুস্থানী দাই চোখে

দড়ি বাঁধা চশমা ও গায়ে পেট বাহির-করা জামা পরিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যহ মহামায়াকে তৈল স্নান করাইল, ঘরের মেঝে মাদুর ও বালিশ তৈল-পঙ্কিল হইয়া উঠিল কিন্তু সেও মহামায়ার পদক্ষেপ অবাধ করিতে পারিল না। এক-খানি ঘরের একখানি মাত্র তক্তার উপর তাঁহার ওঠা-বসা, ঐ টুকুতেই তাঁহার অধিকার ক্রমে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতে লাগিল।

ছোট খোকা আসিয়া হাত ধরিয়া টানে, "মা, পা পা, চল।" মা খোকাকে টানিয়া বিছানায় তুলিয়া লন। খোকার চঞ্চল দেহের সতেজ রক্তস্রোত তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না, সে কোল ছাড়িয়া হুড়মুড় করিয়া মাটিতে নামিয়া পড়ে। মহামায়া বিছানা হইতেই তাহার জামার পিছনটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করেন, "সুধা, সুধা, ধর্ দস্যুটাকে, আমায় সুদ্ধ নইলে টেনে ফে'লে দেবে।"

সুধা ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে লইয়া যায়। মা'র ঘরে ডাক্তার নার্সের ভীড়, এদিকে ইস্কুলের বেলা বহিয়া যায়, ঠিকা ঝি উঁচু ঝুঁটি বাঁধিয়া লাল গামছা হাতে করিয়া বলে, "দিদিমণি, বাজারের পয়সা দাও না গা, বাবুর আপিসের বেলা হয়ে গেল, উনুনে এতগুলো কয়লা পুড়ে খাক হয়ে যাবে, বামুন-দি ব'কে ভূতঝাড়া ক'রে দেবে।"

পয়সা ত সুধার কাছে থাকে না, নয়ানজোড়ের মত ধানের কারবারও নাই যে যাহাকে তাহাকে এক পাই ধান ঢালিয়া দিয়া মাছটা দুধটা যোগাড় হইবে। সে গিয়া দরজার কাছে দাঁড়ায়। মহামায়া বুঝিতে পারেন কিসের প্রয়োজন, শয্যা হইতেই চঞ্চল হইয়া বলেন, "বাক্সটা ওরই হাতে বার ক'রে দাও না গা, যা পারে ওই দেবে থোবে।"

নীলের উপর সোনালী লাইন-কাটা হাত-বাক্সটা বাহির করিয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলেন, "মা মণি, এবার তুমি মা, আমারা ছেলে, খাওয়া পরার ব্যবস্থা যা হয় ক'রো।"

সুধা ঝিকে ভয়ে ভয়ে বলে, "কত দিতে হবে?" কিসের যে কত দাম সে ত কিছু জানে না।

ঝি হাত নাড়িয়া বলে, "টাকা একটা ফে'লে দাও না, যা ফিরবে তা ত আর আমি খেয়ে ফেলব না? হিসেব বুঝে নিও এখন। একটা পয়সাও যদি গরমিল হয়, তখন আমার গলায় গামছা দিয়ে আদায় ক'রো।" ঠিকা রাঁধুনী

এক গাল পান-দোক্তার রসে মুখ ভর্তি করিয়া অল্প হাঁ করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় বলে, "দিদিমণি, যাহোক একটা কিছু কুটে কেটে দাও না গা, সুক্তুনি কি ঝাল ঝোল কিছু ততক্ষণ চড়াই।"

সুধা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসে। ঝুড়ি ত শূন্য। আলু আর পেঁয়াজ ছাড়া কিছু নাই। সুধা কুটিয়া দিয়া বলে, "এইটে ততক্ষণ পোস্ত দিয়ে রাঁধ।"

রাঁধুনী ঝঙ্কার দিয়া উঠে, "হ্যা, ন'টায় ভাত দেব, আবার ব'সে ব'সে পোস্ত বাঁটব, এত আমার গতরে কুলোবে না। ও সব ছুটির দিনে হবে'খন। আজ অমনি ভাজাভুজি ক'রে দি, বাবুকে আপিসে বেরোতে হবে ত!"

সুধা ভীতভাবে বলে, "আচ্ছা, আমি পোস্তটুকু বেঁটে দিচ্ছি, তুমি শুধু ভাজা দিয়ে বাবাকে ভাত দিও না। একটুখানি কেবল খোকাকে ধর।" রাঁধুনী মুখটা ভার করিয়া বলিল, "এমন অনাছিষ্টি দেখি নি মা, আমি বামুনের মেয়ে, ছেলের ধাই হওয়া কি আমার কাজ? দাও, পোস্তটা আজ আমিই বেঁটে নি, কাল থেকে ঝি মাগীকে বাজারে যাবার আগে বাটাঘসা সব ক'রে যেতে বলবে। উনি নবাবের নাতনী ফর্‌ফর্‌ ক'রে বাজার করতে চললেন, আর আমি মরি এখানে হাত পা ছেঁচে।"

চন্দ্রকান্ত তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া ইস্কুলে যাইবার সময় বলিয়া যান, "মামণি, তোমার মাকে দেখো। আর পিসিমাকে একটা চিঠি লিখতে ভুলো না।"

চন্দ্রকান্ত চলিয়া যান, সুধা খোকাকে কোলে করিয়া জানালা হইতে দেখায়।

ঝি রাঁধুনীর তর্‌ সয় না, বলে, "দিদিমণি, নেয়ে খেয়ে নাও না গা, আমাদেরও ত মানুষের পেট, বাড়ী গিয়ে রেঁধে বেড়ে তবে ত খাব। এইখেনে এগারটা বাজিয়ে দিলে তোমার পেটে হাত বুলিয়ে কি আমাদের পেট ভরবে?" সুধা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে; সে ইহাদের ভয় করে। ইহারা যেন ঠিক বন্য জন্তু, কখন কোন্‌ দিক্‌ দিয়া কি খুঁৎ ধরিয়া যে আক্রমণ করিবে তাহার ঠিক নাই। করুণা ঝির মত মমতা ইহাদের কাছে আশা করা যায় না, কিন্তু আর একটু কম প্রখরা হইলে কি চলিত না? সুধার অবস্থা বুঝিয়া মহামায়া মাঝে মাঝে বলেন, "হ্যাগা, তোমরা সারাক্ষণ ছেলেমানুষের পিছনে টিক টিক কর কেন বল ত? তোমরা যেন মুনিব, ওই যেন ঝি!"

ঝি একহাত জিভ কাটিয়া বলে, "অমন কথা মুখে এনো না মা, কচি ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে তুলতে হবে ত, তাই বলি, নইলে কথা কিসের? আমাদের ছোট লোকের গলা, মিষ্টি কথাও ক্যার ক্যার করে।"

সুধাকে বলে, "দিদিমণি, মা'র কাছে লাগিয়েছিলে আমাদের নামে? এই কলকেতা শহরে চোদ্দ বছর গতর খাটাচ্ছি, কেউ বলতে পারবে না যে ননীর মা কারুর এক আধলা চুরি করেছে কি কাউকে গাল মন্দ করেছে। তোমাদের সংসারের মাথা নেই, তাই পাঁচ রকম কথা কইতে হয়, সেটা কি আমার দোষ বাছা?"

সুধা তর্ক করিতে ভয় পায়। দোষ যাহারই হউক, ননীর মা আর বামুনদি যদি সপ্তমে গলা তুলিয়া সকল দোষের জন্য সুধাকেই আসামী স্থির করিয়া দেয়, সুধার ক্ষীণ কণ্ঠের আপত্তি সেখানে দাঁড়াইতে পারিবে না। তা ছাড়া হাতা-বেড়ি ঝাঁটা বালতি আছাড় দিয়া তাহারা যদি সমস্বরে বলে, "দাও, আমাদের হিসেব মিটিয়ে দাও", তাহা হইলে সুধা এ সংসার ঠেলিবে কি করিয়া? বামুনদির অগ্নিবর্ষিণী দৃষ্টি আর ননীর মা'র অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু খোকনের মুখে দুধ না উঠিলে, মা'র স্নানের জল না জুটিলে, শিবুর পেটে ভাত না পড়িলে সে সহ্য করিবে কেমন করিয়া? কাজকে সে ভয় পায় না। কিন্তু এত কাজ একলা কি করা যায়? খোকনকে কোলে করিয়া বসিতে হইলেই ত পৃথিবীর সব কাজ বন্ধ? তবু ত তাহারই মধ্যে হপ্তায় এক দিন ননীর মা'র কামাই আছে; সেদিন শিবুর জিম্মায় খোকনকে দিয়া পোড়া বাসন মাজিতে সুধার হাতে কড়া পড়িয়া যায়। বামুনদি ব্রাহ্মণ-কন্যা, বাসন মাজিলে তাঁহার সম্মান থাকে না, বড় জোর বাজারটুকু তিনি করিতে পারেন।

নয়ানজোড়ের সেই সুধা এই সামান্য কয়টা মাসে এত ঘর-সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিল কি করিয়া, মনে করিয়া সে আপনি বিস্মিত হইয়া উঠে। পিসিমা যদি হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া পড়েন তাহা হইলে সুধার রকম-সকম দেখিয়া তাহাকে হয়ত চিনিতেই পারিবেন না। শিবুটা যে ছেলেমানুষ সেই ছেলেমানুষই থাকিয়া গেল। কিন্তু সুধার যেন সাত-আট মাসে সাত-আট বৎসর বয়স বাড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ বাবা একথা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, "সুধার ঐ কাঁচা মনে রং ধরতে অনেক বছর লাগবে।"

সন্ধ্যায় খোকার চঞ্চল হাত পা যখন ঘুমের কোলে এলাইয়া পড়ে, ঝি-রাঁধুনীর কাংসকণ্ঠমুখর গৃহ একটু নীরব হইয়া আসে, তখন চন্দ্রকান্ত গৃহে ফিরিয়া দেখেন দিনের খেলার শেষে হয়ত শিবু দিদির সঙ্গে সুর করিয়া পড়িতেছে,

"ওরে তোরা কি জানিস কেউ,
জলে উঠে কেন এত ঢেউ,
তারা দিবস রজনী নাচে,
তারা চলেছে কাহার কাছে।"

নয়ত তাঁহারই মুখে শোনা মেঘদূতের শ্লোকে স্বরচিত সুর যোজনা করিয়া দুই জনে আবৃত্তি করিতেছে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে'। অর্থ তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে না কিন্তু পদলালিত্য ও ধ্বনির ঝঙ্কার তাহাদের সমস্ত মনটা মাতাইয়া তুলিয়াছে। সুধা দুলিয়া দুলিয়া বলিত, শিবু কথার তালে তালে তুড়ি দিয়া নাচিত।

বার বৎসর বয়সে মাত্র পল্লীমাতার নিরাড়ম্বর ক্রোড় হইতে সুধা যখন মহানগরীর সমারোহের মাঝখানে আসিয়া পড়িল, তখনই তাহার মনের গঠনের ছাঁচ সম্পূর্ণ ঢালাই হইয়া গিয়াছে। পল্লীজননীর শ্যামস্নিগ্ধ শান্তশ্রী তাহার মনে যে চির নবীনতার রং ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে পল্লীর প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু নগরীর সমারোহ ছিল না। ধরণী যেমন করিয়া বুক পাতিয়া বর্ষাধারাকে গ্রহণ করিয়া আপনার শ্যামলতায় সজলতায় নীরবে তাহাকে নব রূপ দান করে, আকাশকে সপ্রেম স্নিগ্ধ হাস্যে অভিনন্দিত করে, সুধার মনও তেমনই করিয়া মানুষের স্নেহপ্রীতিকে সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়া নীরব মমতা ও গভীর সরস অনুরাগে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। গ্রহণ ও দান দুইই তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু লৌকিক দেনা-পাওনার নাগরিক প্রথা সম্বন্ধে চেতনা তাহার দ্রুত সজাগ হইয়া উঠিল না। বৃষ্টিধারা ধরণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হইয়া তাহার হৃদয়কে নবপ্রাণে বিকশিত করিয়া তোলে, কিন্তু তখন সে বারিধারাকে আর মাপিয়া ওজন করিয়া এই শ্যামলতার ভিতর চিনিয়া লওয়া যায় না। কলের জল পাইপের এক দিকে যেমন রূপে যে মাপে ঢোকে তেমনই মাপে ওজনে অন্য পাত্রে গিয়া ধরা দেয়। নাগরিক সভ্যতাও যেন সেই রকম—যেখানে টাকা পাইয়াছ ওজন করিয়া জিনিস দিবে, ভদ্রতা পাইয়াছ ওজন করিয়া বন্ধুত্ব দিবে। এই ওজন করা ব্যবসায়িক ভদ্রতার আদবকায়দা সম্বন্ধে সুধার সঙ্কোচ ও অজ্ঞতা চিরকালই রহিয়া গেল। তাহাকে হয়ত মূঢ়তাও বলা চলে। কারণ ইহারই জন্য নাগরিক সভ্যতায় বিচক্ষণ মানুষকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া চিরকালই সে একটু পিছনে থাকিত।

শিবু তাহার পাড়াপ্রতিবাসী ইস্কুলের সহপাঠী সকলের সঙ্গেই হৃদ্যতা করিতে এবং সর্বক্ষেত্রে আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জীব বলিয়া প্রমাণ করিতে যখন ব্যস্ত, সুধা তখন যেন ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়া যাইতেছে। কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্ত তাহার সমবয়সী মানুষ যে তাহার চোখে কম পড়িয়াছে তাহা নয়, কিন্তু কাহারও সহিতই সে আপনা হইতে সম্পর্ক গড়িয়া

তুলিতে পারিত না। যাহাকে তাহার ভাল লাগিত তাহাকে সে দূর হইতেই আন্তরিক মমতা ও নিষ্ঠার সহিত ভালবাসিত, পৃথিবীর হৃদয়জাত বনস্পতি মত তাহার শিকড়ও যেমন গভীর ও বিস্তৃত হইত, তাহার বহিঃপ্রকাশও তেমনই শ্যামস্নিগ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাতে দুরন্ত গতির চাঞ্চল্য আসিত না।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে চন্দ্রকান্ত একদিন গাড়ীভাড়া করিয়া সুধাকে মেয়ে-ইস্কুলে ভর্তি করিতে চলিলেন। স্কুল-বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড সবুজ ঘাসের ময়দান, পাশ দিয়া রাঙা সুরকির পথে সারি সারি ঝুমকোজবার গাছ, দুই-একটা টগর গন্ধরাজও আছে। দেখিলে নয়ানজোড়ের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর ও রাঙা ধূলার পথ মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু চারিধারে হাস্যমুখর লীলাচঞ্চল বালিকার সকৌতুক দৃষ্টিপাতে সুধার মানবভীতি সজাগ হইয়া উঠিল, সে আর বাহিরের দিকে না তাকাইয়া ঘরের মেঝেতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিল। হাই-হিল জুতার খট্ খট্ শব্দ করিয়া ব্যস্ত ভাবে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ভয়ে সুধার বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শিষ্টাচার মতে তাহার কি কর্তব্য সুধা যেটুকু জানিত তাহাও কেমন যেন ভুলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, সুধা নীরবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একবার খালি মুখ তুলিয়া দেখিয়া লইল শিক্ষয়িত্রীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দুগ্ধশুভ্র ফরাসডাঙ্গার শাড়ী ও তাঁহার ঝকঝকে সোনার চশমার অন্তরালে তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি। নিশ্চয় সুধাকে খুব কঠোর পরীক্ষা দিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশের ছাড় লইতে হইবে। মানুষটাকে দেখিয়াই খুব কড়া মনে হইতেছে। শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাংলা ইংরিজী অঙ্ক কত দূর পড়েছ ?"

সভয়ে সুধা বলিল, "সীতার বনবাস, মেঘদূত"···আর বলিতে হইল না। শিক্ষয়িত্রীর কঠোর মুখে হাসি দেখা দিল, "তুমি এতটুকু মেয়ে মেঘদূত পড় ? তবে টোলে ভর্তি হলে ত পারতে !"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "মেঘদূত ওর মুখস্থ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ভুল হয়েছে, ইংরেজী বেশী পড়ানো হয়নি।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "তাতে আর কি ? ও ত ছেলেমানুষ, শিখে নেবে এখন। ওকে থার্ড ক্লাসে বসিয়ে দি গিয়ে। কি বলেন আপনি ?"

এই পরীক্ষা ! সুধার ধড়ে প্রাণ আসিল। শিক্ষয়িত্রীর হাতে তাহাকে

সঁপিয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত চলিয়া গেলেন। এই জনারণ্যের ভিতর সুধা নির্বাসিতা সীতার মত একলা পড়িয়া রহিল। শিক্ষয়িত্রী তাহাকে যেখানে লইয়া বসাইয়া দিলেন ক্লাসের ঠিক সেইখানটিতে সুধা নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া রহিল। ভাল করিয়া কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলও না, পাছে চোখে চোখ পড়িলেই কেহ কোন প্রশ্ন করিয়া বসে। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে পড়াইতেছিলেন, তিনি সুধার সঙ্কোচ ভাঙিয়া দিবার জন্য বলিলেন, "বল দেখি—'জ্যোৎস্না তুষারমলিনা সীতেব চাতপশ্যামা' মানে কি?"

সুধা মানে বলিতেই পণ্ডিতমহাশয় মেয়েদের বলিলেন, "দেখ, তোমরা যেন সব নূতন মেয়ের কাছে হেরে যেও না।"

মেয়েরা বিস্ময় ও কৌতূহলে দৃষ্টি পূর্ণ করিয়া সুধার মুখের দিকে তাকাইল, সুধা কিন্তু মুখ তুলিল না।

স্নেহলতা বলিয়া একটি খ্রীষ্টিয়ান মেয়ে পিছনের বেঞ্চে বসিয়াছিল। সে সুধার সঙ্কোচ বুঝিয়া আপনি উঠিয়া আসিয়া সুধার কাছে বসিয়া ভাব করিতে শুরু করিল। ক্লাসের ভিতর বেশী গল্প করা চলে না, কাজেই সে সুধার খাতায় বাংলা ইংরেজী সমস্ত বইয়ের নাম, প্রত্যেক বারের প্রত্যেক ঘণ্টার রুটিন একে একে টুকিয়া দিতে লাগিল।

টিফিনের ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া পড়িতেই মেয়েরা যে যাহার প্রিয় বন্ধুকে লইয়া বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। স্নেহলতা সুধাকে সঙ্গে লইয়া মুসলমান বাক্সওয়ালার নিকট হইতে চকোলেট কিনিয়া খাওয়াইল। সুধার জীবনে চকোলেটের স্বাদ গ্রহণ এই প্রথম। রঙটা ত বেশ সুন্দর পাটালি গুড়ের মত, কিন্তু স্বাদগন্ধ ঠিক যেন পোড়া তামাক। কিন্তু স্নেহলতা ভালবাসিয়া দিতেছে—কি করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়? মুখটা যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া সে সমস্ত চকোলেটটা একসঙ্গে গিলিয়া ফেলিল। স্নেহলতা কিন্তু চালাক মেয়ে, সে সুধার মুহূর্তে গলাধঃকরণ দেখিয়া আসল ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল, "ওমা, নেসল্‌স্ চকোলেট তোমার ভাল লাগল না। প্রথম দিনে কারুরই ভাল লাগে না, যদি না আমাদের মত আজন্ম খাওয়া যায়। আচ্ছা, তুমি 'গোয়াভা চিজ' খেয়ে দেখ, নিশ্চয় বেশ লাগবে।"

সুধা আপত্তি করিবার আগেই স্নেহলতা পাতলা কাগজে জড়ানো লাল টুকটুকে 'চিজ' তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। "ওমা, এ ত পেয়ারা",

বলিয়া সুধা খুশী হইয়া সাগ্রহে সবটা খাইয়া ফেলিল। কিন্তু প্রতিদানে কিছু ত দেওয়া তাহারও উচিত। সুধা বলিল, "কাল আমি পিসীমার তৈরি আমসত্ত্ব এনে তোমাকে খাওয়াব, দেখো কেমন চমৎকার!"

স্নেহলতা হাসিয়া বলিল, "সে হবে এখন। তোমার ত বই কেনা হয়নি, চল খাতায় লিখে দি, কালকের বইয়ের কতখানি পড়া।"

পড়া লিখিতে লিখিতে স্নেহলতা বলিল, "সেকেণ্ড মাস্টারমশায়ের পড়াটা একটু যত্ন ক'রে ক'রে রেখো, ভাই, উনি বড্ড রাগীমানুষ, শেষে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে না বলেন।"

সুধা অজ্ঞের মত বলিল, "বেঞ্চির উপর দাঁড়ালে কি হয়?"

স্নেহলতা সুধাকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "একবার দাঁড়িয়ে দেখো না কি হয়! তুমি একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে!"

সুধা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আর কি পড়া আছে বল।"

স্নেহলতা বলিল, "পণ্ডিতমশায় ভালমানুষ, বই না পেলে তাঁর পড়াটা দুই-এক দিন বাদ গেলেও তিনি নূতন মেয়েকে কিছু বলবেন না। তাছাড়া তুমি ত ভাই নিজেই মস্ত পণ্ডিত, না-পড়া জিনিসও বলতে পার। যাই হোক, পণ্ডিতমশায়কে কিন্তু বেশী প্রশ্ন ক'রো না, যা বলবেন চুপ ক'রে শুনো। প্রশ্ন করলেই উনি ভাবেন ওঁকে বুঝি ঠাট্টা করা হচ্ছে।"

স্নেহলতা সুধার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইবার নানা চেষ্টাই করিল। কিন্তু এই চেষ্টা-করা বন্ধুত্বের ভিতর আন্তরিকতার কি একটা অভাব অথবা ভিন্ন তন্ত্রীর সুর সুধার মনের গতিকে বাধা দিত। সে স্নেহলতাকে একেবারে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। ইস্কুলে প্রত্যেক মেয়েরই এক-একটি বিশেষ বন্ধু ছিল, স্নেহলতার ইচ্ছা ছিল তাহার এই বিশেষ বন্ধুত্বের কোঠায় সে সুধাকে ফেলে। কিন্তু সুধা যে তেমন ভাবে সাড়া দেয় না ইহাতে স্নেহলতা রাগ করিয়া কতবার বলিত, "তুমি ভাই আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পার না। কার দিকে তোমার মন বল না? উপর ক্লাসের বড় মেয়েদের এডমায়ারার হতে চাও বুঝি? ওসব ন্যাকামী দেখলে আমার গা জ্বালা করে। ইস্কুলে এসে লেখাপড়া শেখবার আগেই ঐ বিদ্যেটি সকলের শেখা হয়ে যায়।"

সুধা লজ্জিত হইয়া বলিত, "কি যে তুমি আবলতাবল বক! আমার

কারুর সঙ্গে আলাপই নেই, ত ন্যাকামী করব কোত্থেকে? তোমাকেই ত কেবল আমি চিনি। ক্লাসের মেয়েদের এখনও ভাল ক'রে চেনা হয়নি।"

বাল্যবন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন সুধার জীবনে তখনও ঘটে নাই। তাহার প্রায় একমাত্র খেলার সাথীই ছিল ছোট ভাই শিবু। কিন্তু একে ত সে ভাই, তাহাতে শৈশবের বয়সের মাপে অনেকটাই ছোট, সেইজন্য সুধা তাহাকে ঠিক বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে কোনদিন পারে নাই। শিবুর প্রতি তাহার ভালবাসা ছিল গভীর বাৎসল্যমিশ্রিত। সে যে তাহার ক্ষুদ্র ভাইটির মস্ত বড় দিদি এই কথাটাই ছিল তাহার ভালবাসার ভিতর সকলের চেয়ে বড়। নারীজন্মের প্রথম পর্বেই বাৎসল্যরসের মমতাস্নিগ্ধ ধারা তাহার জীবনকে সরস করিয়া তুলিয়াছিল এই ছোট ভাইটিকে অবলম্বন করিয়া। অথচ সুধার মনে প্রবল একটা বন্ধুপ্রীতি তখনও উথলিয়া কূলপ্লাবিত করিয়া ছুটিবার জন্য থম্ থম্ করিতেছে। পূর্ণিমার চাঁদের মত কোন্ বন্ধুর আকর্ষণ তাহার এই প্রীতির সাগর উচ্ছ্বসিত করিয়া জোয়ারের মত টানিয়া লইয়া যাইবে এইটুকুর প্রত্যাশাতেই যেন সে বসিয়া ছিল।

এমনই দিনে দেখা দিল হৈমন্তী। স্কুলের টিফিনের ছুটির সময় একটা মস্ত মোটর-গাড়ী করিয়া গাড়ী-বারান্দায় কাহারা যেন আসিয়া নামিল। সব মেয়েরা তখন স্কুল-বাড়ীর ময়দানে খেলা করিতে ব্যস্ত। স্নেহলতা আজ পড়া তৈয়ারী করিয়া আনে নাই বলিয়া ছুটির সময় প্রাণপণে ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিতেছে। সুধা একলা একলা গাড়ী-বারান্দার ধারের চওড়া বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল। গাড়ীটা দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। খাকি পোশাক-পরা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় হিন্দুস্থানী দারোয়ান গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিবার আগেই একটি গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি শ্যামাঙ্গী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। সুধা মেয়েটিকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। কলিকাতার আধুনিক স্কুলের মেয়ে সুধা এক মুহূর্তে যেন জাতিস্মর হইয়া কোন সুদূর অতীত যুগে চলিয়া গেল। এই ত তাহার বহুকালের পথ-চাওয়া বন্ধু! ইহারই জন্য ত সে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিল। কত যুগ ধরিয়া কত ভ্রান্ত পথে পথে ঘুরিয়া আজ আবার দুইজনে দেখা! সুধা দেখিয়াই চিনিয়াছে! আয়ত কালো চোখের কি স্নেহমাখা গভীর অতলস্পর্শ দৃষ্টি! বহুযুগের স্নেহ সঞ্চিত না হইলে দৃষ্টিতে এমন অমৃত কি

উথলিয়া উঠে? মেয়েটিও যেন সুধার মুখের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া গেল। যেন সে কি একটা আকস্মিক আবিষ্কার করিয়াছে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি মা?"

সুধা যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, "সুধা।"

তিনি আবার সস্নেহে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কার মেয়ে বল ত। তোমাকে এখানে কেমন যেন নূতন নূতন দেখাচ্ছে।"

সুধা বলিল, "আমার বাবার নাম শ্রীচন্দ্রকান্ত মিশ্র।"

স্মিতহাস্যে ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ওঃ, তুমি ত দেখছি মস্ত লোকের মেয়ে। ওরকম পণ্ডিত আজকালকার দিনে দেখা যায় না। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই বটে, কিন্তু তাঁকে আমি দেখেছি, তাঁর আশ্চর্য গলার গানও শুনেছি। এই দেখ, আমারও একটি মেয়ে আছে হৈমন্তী, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে দিই। এই ইস্কুলেই ত পড়বে।"

হৈমন্তী হাসিমুখে আসিয়া অতি পুরাতন বন্ধুর মত সুধার হাত চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সুধা কেমন যেন সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া গেল। অমন পদ্মের পাপড়ির মত ধূলিলেশশূন্য পেলব সুন্দর বেশভূষা যাহার, অমন সুদীর্ঘ মৃণালের মত গ্রীবা, অমন গভীর অতলস্পর্শী দৃষ্টি যাহার, যাহার মুখের উদাস ভঙ্গীটুকু, যাহার অতি লঘুক্ষিপ্র গতি, আর পালকের মত হাল্কা চুলের রাশ দেখিলে তাহাকে সাধারণ পৃথিবীর মানুষ মনে করিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় যেন কোন দামী বিলাতী উপকথার বইয়ের পরীর ছবি হঠাৎ মানুষ হইয়া বইয়ের পাতা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে এই স্বদেশী মিলের মোটা শাড়ী ও ধূলিধূসরিত চটিপরা সুধাকে এমন অসঙ্কোচে কাছে টানিয়া লইল কি করিয়া? সুধার চটির ধূলা, চুলের নারিকেল তেল হৈমন্তীর গায়ে লাগিয়া যদি একটুও তাহার বেশভূষার সৌন্দর্যের হানি করে তাহা হইলে এমন শিল্পসৃষ্টিটিতে যে খুঁত হইয়া যাইবে।

কিন্তু হৈমন্তী যেন সুধার মধ্যে কি পাইল। সে সুধার মোটা কাপড় পাড়াগেঁয়ে সাজসজ্জা কিছুই দেখিতে পাইল না। সে সুধার লজ্জাজড়িত চোখের ভিতর আপনার গভীর দৃষ্টি নামাইয়া যেন কোন পূর্বজন্মের পরিচয়ের সূত্র খুঁজিতে লাগিল। যেন বলিতে লাগিল, "আমাকে তুমি ঠিক চিনেছ ত?"

ভদ্রলোক হৈমন্তীকে হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "চল হেমু, আগে ইস্কুলে ভর্তি হয়ে তারপর নূতন বন্ধুর সঙ্গে গল্প আলাপ ক'রো এখন।"

হৈমন্তী বাবার কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিল বলিয়া মনে হইল না। সে বাবার সঙ্গে কোন রকমে চলিল বটে, কিন্তু সুধাকে প্রায় জড়াইয়া টানিতে টানিতে। সঙ্কুচিত সুধা চোখ নামাইয়া একেবারে নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

হৈমন্তী হঠাৎ আবদারের সুরে বলিল, "বাবা, সুধাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না।"

ভদ্রলোক বলিলেন, "ইস্কুল থেকে ওকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাবে, ওর মা বাবা যে পুলিসে খবর দেবেন শেষে।"

হৈমন্তী ঠাট্টায় দমিবার মেয়ে নয়। সে বলিল, "হ্যাঁ বাবা, নিয়ে যেতেই হবে। তুমি ত এখুনি আমাকে নিয়ে ফিরে যাবে, তাহলে ভাব করব কখন?"

বাবা বলিলেন, "কেন, কাল থেকে রোজ স্কুলে আসবে সে কথা কি ভুলে গেলে? তখন যত খুশি ভাব ক'রো।"

হৈমন্তী তাহার মৃণাল গ্রীবা বাঁকাইয়া পিতার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ইস্কুলের পড়ার মধ্যে যেন কতই গল্প করবার সময় থাকে! যাও!"

ক্লাসের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মেয়েরা যে যাহা করিতেছিল এক মুহূর্তে বন্ধ করিয়া ছুটিয়া ক্লাসে চলিয়া গেল। অন্য মেয়েদের মত সুধাও ব্যস্ত ভাবে দৌড়িয়া পলাইল। হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে বিদায় লইতেও কেমন লজ্জা করিল। হৈমন্তী এক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সুধার পলায়ন দেখিয়া পিতার সঙ্গে আপিস-কামরায় চলিয়া গেল।

* * * *

সুধাদের স্কুলে একটা বড় ঘরেই চারি কোণে চারিটি ক্লাস। পরদিন ক্লাস আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিতমহাশয় সুধাদের ক্লাসে ব্যাকরণকৌমুদী খুলিয়া তদ্ধিত প্রত্যয় পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, হঠাৎ খট্‌খট্ করিয়া জোরালো পায়ের আওয়াজ সুপরিচিত ছন্দে বাজিয়া উঠিল। সুধা ফিরিয়া দেখিল হৈমন্তীকে সঙ্গে করিয়া হেড মিস্ট্রেস ঘরে আসিতেছেন। আনন্দে সুধার বুকটা

ছলিয়া উঠিল। কাল হইতে সে হৈমন্তীর আশাপথ চাহিয়া আছে। এইবার সশরীরে হৈমন্তী তাহাদের ক্লাসে আসিয়া বসিবে। কিন্তু একটু দুঃখও হইল। যদি বেঞ্চিগুলা আর একটু পরিষ্কার চক্‌চকে হইত, যদি মেয়েরা হৈমন্তীকে অভ্যর্থনা করিবার আর একটু উপযুক্ত হইত।

সুধাকে হতাশ করিয়া হৈমন্তী তাহাদের নীচের ক্লাসে গিয়া বসিল। ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও নিদারুণ বিরক্তিকে অবহেলা করিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে তাকাইল। স্নেহলতার ঠোঁটদুটি কথা বলিবার জন্য উদগ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়ের ভয়ে কথা ফুটিল না। যাহার মনে যত কথা ভিড় করিয়া আসিয়াছে, ক্লাস শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাহার একটিও প্রকাশ করিবার উপায় নাই। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় ক্লাসের শেষে ব্যাকরণকৌমুদী হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপুষ্ট শিখাটি ক্লাসের দিকে ফিরাইতেই স্নেহলতার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, "নূতন মেয়েটি কি রোগা ভাই? রঙটাও বেশ কালো!"

এক মুহূর্তের ত পরিচয় তবু এতটুকু নিন্দা যেন সুধার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া উঠিল। মনীষা বলিয়া উঠিল, "ফিটফাট বেশ ফিরিঙ্গির মত, কিন্তু কি চোখ বাবা! যেন গিলে খেতে আসছে।"

সুধা ভাবিল, "হায় অন্ধ! চোখ কাকে বলে তাও কি তোমরা জান না? ঐ অতল কালো চোখের রূপ, ঐ মৃণাল গ্রীবা, ঐ পদ্মকুঁড়ির মত মুখ, কিছু তোমাদের চোখে পড়ল না, শুধু কালো রঙটুকু দেখতে পেলে?"

কিন্তু সুধা বাক্‌পটু ছিল না; তা ছাড়া মুখের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত কথায় তাহার এই দৈবলব্ধ প্রিয় বন্ধুর প্রশংসা করা কিংবা নিন্দা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করা দুইই যেন তাহার কাছে দেবতার নির্মাল্য লইয়া পুতুলখেলার মত মনে হইতেছিল। সে আলোচনায় যোগ দিল না, কেবল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, হৈমন্তীর শ্যামশ্রীর অন্তরালে পূজার প্রদীপের মত যে প্রাণটি জ্বলিতেছে, তাহার নিষ্কম্প দীপ্তি যে তাহার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহা কেন সুধা ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। সুধা কবিতা কখনও লেখে নাই, কিন্তু কবিতার হাওয়াতেই তাহার প্রাণবায়ু আজন্ম নিশ্বাস লইয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল একটি ছন্দে লয়ে সুরে সুসম্পূর্ণ গীতিকবিতা যেন তাহার বাণীরূপ

হারাইয়া অকস্মাৎ কায়াগ্রহণ করিয়াছে হৈমন্তীর মধ্যে। তাহার হাঁটাচলা কথাবলা প্রতি অঙ্গ চালনার ভিতর এই যে আশ্চর্য সুষমা, ইহা কবিতা ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নহে।

সঙ্গিনীরা সুধাকে আলোচনায় যোগ দিতে না দেখিয়া বিস্ময় ও কৌতুহল দেখাইতেছিল, কিন্তু সুধা কি তাহার মনের অনুভূতিকে এমন করিয়া মুখে প্রকাশ করিতে পারে? করিলেও এই অন্ধেরা তাহাকে পাগল বলিবে।

ছুটির পর হৈমন্তী দৌড়িয়া আসিয়া দুই হাতে সুধার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ভাই, আমাদের গাড়ীতে যেতে হবে।"

প্রশ্ন নয় একেবারে সুনির্দিষ্ট আদেশ। সুধা বলিল, "তুমি কোন্ বাসে যাবে তা ত জানি না। আমার বাড়ী যদি তার পথে না পড়ে?"

হৈমন্তী সুধাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া হাসিয়া বলিল, "না গো না, বাসে না। আমাকে নিতে বাবা গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, তাতে আমরা দুজন যাব, কেমন?"

সুধা সঙ্কোচের সঙ্গেই বলিল, "আচ্ছা যাব, কিন্তু তোমার ফিরতে দেরী হয়ে যাবে না?"

প্রথম দিনেই বন্ধুকে অসুবিধায় ফেলিতে সুধার আপত্তি ছিল। সে নিজের সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য অপরকে এতটুকু অসুবিধায় ফেলিতেও সঙ্কোচ বোধ করিত। তা ছাড়া যদিও সুধা এক দিনেই হৈমন্তীর প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হইয়াছিল যে পাইলে তাহাকে অষ্টপ্রহরই ধরিয়া রাখিত, তবু তাহার নিজের সকল দিকের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে এমন একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যে তাহাকে লইয়া কেহ বাড়াবাড়ি করিলে সে কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিত না।

বয়সে হয়ত হৈমন্তীই চার-পাঁচ মাসের ছোট হইবে, কিন্তু সুধার সঙ্গে কথা বলিতে গেলেই সে যেন সুধাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে করে।

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল, "দু-চার মিনিট দেরী হ'লেই কি আমি খিদেয় ককিয়ে ম'রে যাব? আমাকে তোমার মতন অমন কচি মেয়ে পাওনি!" বলিয়া সে সুধার দুইটি গাল সজোরে টিপিয়া দিল।

সুধা অগত্যা হার মানিয়া হৈমন্তীর সঙ্গেই যাইতে রাজি হইল। বই গুছাইতে ক্লাসে যাইতেই মনীষা বলিল, "এত তাড়াহুড়ো কিসের? যাবে ত সেই পাঁচটায় সেকেণ্ড বাসে। চল না মাঠে একটু ঘুরে আসি।"

সুধা বলিল, "আমি যে হৈমন্তীর গাড়ীতে যাচ্ছি।"

মনীষা বলিল, "চালাক মেয়ে বাবা! বড়মানুষের মেয়ে দেখেই অমনি পিছনে ছুটতে শুরু ক'রে দিয়েছ? তবু যদি এক ক্লাসে পড়ত!"

অপমানে সুধার কান দুইটি লাল হইয়া উঠিল। তবু হৈমন্তীকে প্রত্যাখ্যান করিতে অথবা তাহার বন্ধুত্ব লইয়া হাটের ভিতর অসভ্যের মত ঝগড়া করিতে সুধার মানসিক আভিজাত্য অস্বীকার করিল। সে নীরবেই চলিয়া যায় দেখিয়া স্নেহলতাও বলিল, "আমাদের ভাই একেবারে ভুলে যেও না, হাজার হোক আমরা ত পুরনো বন্ধু।"

সুধা তাড়াতাড়ি বই লইয়া পলাইল। গাড়ীর ভিতর সুধা ও হৈমন্তী পরস্পরের গা ঘেঁসিয়া হাত ধরাধরি করিয়া বসিল। তাহাদের হাতের স্পর্শের ভিতর দিয়াই যেন মনের সমস্ত প্রীতি উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছিল, যেন শব্দহীন কি একটা বাণী-বিনিময় অনুক্ষণ চলিতেছিল, কথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। একটি দিনের মাত্র পরিচয়, তবু সুধা ও হৈমন্তী দুইজনেই এই স্পর্শের ভিতর দিয়া বুঝিতেছিল যে কথা বলিয়া পরস্পরের পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করিবার যে বৃথা চেষ্টা মানুষ করে, কোন একটা দৈব আশীর্বাদে তাহারা তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। কথার আবরণ অতিক্রম করিয়া তাহাদের হৃদয় পরস্পরকে চিনিয়া লইয়াছে।

সুধা বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিল। হৈমন্তী ড্রাইভারকে বলিল, "গাড়ীটা একটু আস্তে চালিও, নয়ত কখন ভুলে বাড়ী ছাড়িয়ে চলে যাব।"

পথে যেখানে ঘরবাড়ীর ভিড় একটু কমিয়াছে সেইখানে পরিচিত গলিটুকুর কাছে আসিতেই সুধা বলিল, "এই যে এই গলিতে আমাদের বাড়ী।"

এতবড় একখানা গাড়ী হইতে এই সরু গলির মধ্যে নামিতে সুধার মনে কোন সঙ্কোচই আসিল না, কারণ অর্থের আড়ম্বরের কাছে মাথা নীচু করার শিক্ষা জীবনে তাহার হয় নাই। কিন্তু তবু তাহার মনে হইয়াছিল, হৈমন্তী নিশ্চয়ই এই রকম ঘরবাড়ী দেখিতে অভ্যস্ত নয়, হয়ত সুধার এই রকম জায়গায় বাড়ী দেখিয়া হৈমন্তী বিস্মিত হইতে পারে।

কিন্তু হৈমন্তীর আনন্দিত মুখে বিস্ময়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সুধাকে নামিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াই সে বলিল, "ড্রাইভার, গাড়ীটা একটুখানি রাখ, আমি একবারটি বাড়ীটা দেখে আসি।"

সুধার বাড়ীর এত নিকট হইতে বাড়ী না দেখিয়া সে কি করিয়া ফিরিয়া যাইবে ? ড্রাইভার মনিব-কন্যার কথার উপর কথা বলিতে সাহস করে না, তবু একেবারে নূতন বাড়ীতে গলির মধ্যে হৈমন্তীকে নামিতে দেখিয়া একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, 'বহুৎ দেরী হো যায়েগা বাবা, সাহব গুস্‌সা করেঙ্গে।"

হৈমন্তী "আমি এখখুনি আসব" বলিয়া প্রায় সুধার সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া পড়িল। অগত্যা বেচারী ড্রাইভার নীরবে পথের ধারের কৃষ্ণচূড়াগাছের তলায় গাড়ীটা দাঁড় করাইয়া সিটের উপর পা দুইটা ঊর্ধ্বমুখী করিয়া একটু ঘুমাইয়া লওয়া যায় কিনা তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

সুধাদের গলি হইতে খাড়া মইয়ের মত সিঁড়িটি অতিক্রম করিয়া তাহারা দেখিল, ঝি ননীর মা পিছনের কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া একবোঝা বাসন লইয়া আসিতেছে। দিদিমণির সঙ্গে এমন মেমসাহেবের মত ফিটফাট মেয়েটিকে দেখিয়া ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিবার উৎসাহে কখন তাহার হাতের বাঁধন আল্‌গা হইয়া একখানা থালা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া ভাঙিল সে লক্ষ্যই করে নাই। বাসন ভাঙার শব্দে চমকিয়া সুধার মা উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "শেষ করলে না কি গা সব ক'খানা বাসন ?"

"মোটে একখানা ভেঙেছে" বলিতে বলিতে সুধা দুইফুট চওড়া খাড়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া হৈমন্তীকে লইয়া তিনতলায় উঠিতে লাগিল। শিবু সবেমাত্র ইস্কুল হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরে কি কি খাদ্য পাওয়া যাইতে পারে তাহারই তদারক করিতে উপর হইতে নাচিয়া নাচিয়া নামিতেছিল, হঠাৎ দিদির সঙ্গে অপরিচিত একটি মেয়ে দেখিয়া এক এক লাফে দুই সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া একেবারে চারতলার ছাদে চলিয়া গেল।

শিবু এখন অনেকটা বড় হইয়াছে, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে তাহার এগারো বৎসর পূর্ণ হইবে, লম্বাতেও সে প্রায় দিদির সমান হইয়া উঠিয়াছে। এক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তাহার অপরিচিত মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মিয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার দিকে যে রকম অবজ্ঞাভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাতে তাহাদের ত্রিসীমানায় না থাকাই উচিত। তাহার মস্ত অপরাধ যে সে খোকনের মত গালফোলা নয় এবং আধ আধ কথা বলে না। ওঃ ভারি ত! নাইবা তাহারা উহার সঙ্গে কথা বলিল, শিবুর বন্ধুর অভাব নাই, সে চায় না মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে।

মা ছোট ঘরের ভিতর একটা তক্তাপোষের উপর খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, ছেলেকে হুড়মুড় করিয়া ছাদে পলাইতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু চট্ করিয়া উঠিয়া খবর লইবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, একটা পা প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

সুধা বড় ঘরে টেবিলের উপর বই কয়খানা রাখিয়া হৈমন্তীকে লইয়া ছুটিয়া ছোট ঘরখানায় মা'র কাছে গেল। মা একটু ভিতরে বসিয়াছিলেন, না হইলে সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময়ই তাহাদের দেখিতে পাইতেন। ছোট্ট ঘর, তাহাতে অসংখ্য জিনিসপত্র। বাহিরের পরিচিত লোকজন বিশেষতঃ মেয়েরা উপরেই দেখা করিতে আসেন, বড় ঘরখানাতেই তাঁহাদের বসাইতে হয়। কাজেই কাপড়ের আলনা, শীতকালের জন্য তোলা লেপ-তোষক, ভাঁড়ারের আলমারি, কাপড়ের দেরাজ, এমন কি তরকারির ঝুড়ি বঁটি পর্যন্ত আসিয়া জুটিয়াছে এই ঘরে। মহামায়া ত দেড়তলায় গিয়া তরকারি কুটিয়া দিয়া আসিতে পারেন না, সুধাও এখন থাকে সারাদিন ইস্কুলে। এত জিনিসেরই মধ্যে একখানা তক্তাপোশে দিনে মহামায়ার কাজের আসন, রাত্রে বিছানা পাতিয়া চন্দ্রকান্ত ঘুমান। মহামায়া দিনের কাজের শেষে রাত্রেও এই একই আসনে শুইবেন ঠিক করিয়াছিলেন কিন্তু বড় ঘরখানায় আলো-হাওয়া বেশী এবং দিনান্তে একটু স্থান পরিবর্তনও হয় বলিয়া চন্দ্রকান্ত অসুস্থ স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন। ছেলেমেয়েরা মা'র কাছে থাকিতেই চায়, তাছাড়া বড় ঘরে বেশী লোকের সংকুলানও হয় বলিয়া তাহারা তিন জনেও এই ঘরে আশ্রয় লইয়াছে।

সুধার সহিত সুবেশা অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখিয়া মহামায়ার দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মানুষের মুখের সামনে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পাছে অভদ্রতা হয় বলিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। সুধা পরিচয় দিবার আগেই হৈমন্তী মহামায়াকে প্রণাম করিতে মাথা নামাইল। ব্যস্ত হইয়া সুধা সহাস্যে বলিল, 'মা, এই আমার বন্ধু হৈমন্তী।"

তার পর হৈমন্তীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ক'রে চিনলে ভাই, আমার মাকে ?"

হৈমন্তী বলিল, "আমি মুখ দেখেই চিনতে পেরেছি।" বলিয়া মা ও মেয়ে দুইজনের মুখের উপর সে একবার সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

সুধা বিস্মিত সুরে বলিল, "কি যে বল ভাই! মা কি আশ্চর্য সুন্দর দেখছ না?"

হৈমন্তী হাসিয়া সুধার দুইটা হাত ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, গো দেখছি বইকি!"

তার পর সুধাকে একবার বাহিরে টানিয়া লইয়া তাহার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি হানিয়া তাহার গাল দুটি টিপিয়া বলিল, "তুমিও আশ্চর্য সুন্দর। কিন্তু তুমি সেকথা জান না।"

সুধা একটু লজ্জা পাইয়া মুখ নামাইল।

হৈমন্তী সুধার কপালে একটি সস্নেহ চুম্বন দিয়া তাহাকে একবার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইয়া "আজ আসি" বলিয়া সেদিনের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

হৈমন্তীকে আবিষ্কার করিবার পর সুধার জীবনে যেন একটা নূতন আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিল, জীবনের একটা নূতন অর্থ দেখা দিল।

যৌবনের সূচনার পূর্বেই জীবনে একটা অতৃপ্তি এবং বিশ্বস্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে মস্ত একটা অভিযোগ লইয়া একদল মানুষ সংসার-পথে চলে। তাহারা পৃথিবীতে কাহার কাহার কাছে অবিচার, কাহার কাছে অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং কাহার কাছে কি কি দুঃখ ও মনোবেদনা পাইয়াছে তাহারই হিসাব সযত্নে রাখে, অন্য দিকটা অবশ্যপ্রাপ্য মনে করিয়া সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। সুধা কিন্তু সেই দলে জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার বাল্য ও শৈশবকালের সমস্ত সম্বন্ধই আনন্দের সম্বন্ধ। মাতা পিতা, দুই ভাই, পিসিমা, মাসিমা, বহুদিনের অদেখা দাদামশায়, এমন কি করুণা-ঝি প্রভৃতি যে কয়টি মানুষকে লইয়া তাহার সুনির্দিষ্ট ক্ষুদ্র জগৎ গঠিত, তাহাদের সকলের দানের ভাণ্ডার হইতে নিত্য কি পরিমাণ আনন্দ সে মধুমক্ষিকার মত কণা কণা করিয়া আপনার অন্তরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে ইহাই ছিল তাহার যৌবন-জাগরণের পথে সকলের চেয়ে বড় হিসাব। সেই জন্যই খাঁটি হিসাবীর মত নিজের দেনাটা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া আনন্দে সেবা করিতে সে ভালবাসিত। আপনার প্রিয়জনের শ্রেষ্ঠতা ও অতুলনীয়তা সম্বন্ধে তাহার মনে যে গৌরবময় ধারণা ছিল, সেইটা ছিল তাহার জীবনের আনন্দের একটা মস্ত খোরাক। এই আনন্দলোকে এবং সুন্দরী পৃথিবীর অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে সংসারের তুচ্ছতা ও অর্থহীন অতৃপ্তির উপরে তাহার মনটা সর্বদা বিচরণ করিত বলিয়া পার্থিব কোন অভাব কি অবিচার সম্বন্ধে যৌবন-জাগরণের মুখে তাহার মনে কোন অভিযোগের সৃষ্টি হয় নাই। মৃত্যু কি বিচ্ছেদের যতটুকু পরিচয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সে পাইয়াছিল তাহাতে বেদনার অন্তঃসলিলা ধারা অনুরাগের মূলকেই আরও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, মৃত্যু ও বিচ্ছেদকে অযৌক্তিক বলিয়া জীবনে বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই।

কিন্তু তাহার এই আত্মীয়গোষ্ঠী-পরিবৃত ক্ষুদ্র জগৎটা ছিল অত্যন্ত অভ্যস্ত,

জন্ম হইতেই ইহার সহিত তাহার নাড়ীর সম্বন্ধ, তাই এই লোকের আনন্দটাও ছিল প্রতিদিনের প্রাণবায়ু ও অন্নজলের মত সুপরিচিত।

অকস্মাৎ হৈমন্তীর আবির্ভাব হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হইতে। সে নিজেই যে শুধু অদেখা অপরিচিত ছিল তাহা নয়, সে আসিয়াছিল এমন একটা আবেষ্টনের ভিতর হইতে যাহার সহিত ইতিপূর্বে সুধার কোনই পরিচয় ছিল না। চোখে চোখ পড়িতেই এই দুইটি ভিন্ন লোকের মানুষের মনে একই তন্ত্রীর সুর এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিতে সুধা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। ইহা তাহার জীবনে একটি অপূর্ব অভিনব আবিষ্কার। সুমিষ্ট ফুলের সৌরভ যেমন অদৃশ্য থাকিয়াও বাতাসের প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে অণুতে অণুতে ছড়াইয়া যায়, তেমনই হৈমন্তীর আবির্ভাবের আনন্দ সুধার জীবনের সকল কাজ ও সকল সেবার মধ্যে অদৃশ্যরূপে নূতনতর প্রেরণা লইয়া ছড়াইয়া পড়িল। বেলুনের গ্যাসে ভারমুক্ত হইয়া তাহা যেমন উর্দ্ধে আকাশলোকে উড়িয়া যায়, সুধাও তেমনই এই আনন্দের প্রাচুর্যে ভারমুক্ত হইয়া সংসারের উপরের সৌন্দর্যলোকে পাখীর মত উড়িতে লাগিল।

চন্দ্রকান্ত একেবারে শেষরাত্রের হাল্কা অন্ধকারের মধ্যেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ছাদের চিলে-কোঠার ঘরে পূর্বমুখী আসনে বসিয়া একতারা লইয়া গান করিতেন—

'কর তাঁর নাম গান
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।"

ঘুমের ভিতরেই বাবার মধুর কণ্ঠে—

"যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতিঃ
জগৎ করে হে আলো"

শুনিয়া প্রায় প্রতি উষায় সুধা চোখ মেলিয়া দেখিত, সূর্যের নবীন জ্যোতি-রেখায় পূর্ব গগন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সুধাও তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিত, খোকনের ঘুম ভাঙিবার আগে তাহার ইস্কুলের অঙ্ক ও লেখাগুলি অন্তত সারিয়া রাখিতে হইবে, না হইলে সে রুলার ও ইরেজার লইয়া ডাণ্ডাগুলি খেলিতে এবং কম্পাস লইয়া সারা বাড়ীতে পৃথিবী আঁকিতে লাগিয়া যাইবে। এদিকে ঝি রাঁধুনী আসিয়া পড়িলেই রান্নাঘরেও একবার না ছুটিলে চলিবে না, মা উপরে বসিয়া ভাঁড়ার বাহির ও তরকারি কোটার কাজটা না-হয়

রিয়া দিবেন, কিন্তু খোকার দুধটা ফুটাইয়া আনা, শিবুর লুচিটা চটপট বেলিয়া দেওয়া, বাবার ভাতটা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া দেওয়া, এসব হুড়াহুড়ির কাজ নীচে আসিয়া মা ত করিতে পারিবেন না। শিবু ডাল ভাত খাইয়া স্কুলে যাইতে চায় না, তার জন্য রোজ লুচি চাই, সেটা তবু মাছভাজা দিয়াই বেশ গরম গরম খাইয়া লওয়া চলে। সুধা যদি ঝি রাঁধুনীর পিছনে না লাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে ন'টার মধ্যে ডাল ভাত, লুচি, দুধ আবার ভাজাভুজি, এত আর হইয়া উঠিত না। ঘণ্টাখানিক ত কাজ নিশ্চয়ই পিছাইয়া যাইত। কিন্তু সুধারও ন'টায় না হোক সাড়ে ন'টায় বাস্ আসে। বাড়ীর কাজ চলে না বলিয়া সে দ্বিতীয় বাসে যাওয়া-আসার ব্যবস্থাই করিয়া লইয়াছে। বিকালে বাড়ী ফিরতে দেরী হইত বটে, কিন্তু সকালে বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায়। তাহাতেই আর সকলের কাজটা সারিয়া দিয়া সে স্নান খাওয়া সারিয়া লইতে পারে।

চারতলার সিঁড়ির নীচে তিনতলার বড় ঘরের পাশে স্নানের জন্য ছোট একটা চিল্‌তে ঘর ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কল নাই, কে অত জল টানিয়া তুলিবে? মা'কে না দিলে নয়, তাঁহারই জলটা শুধু ননীর মা পৌঁছাইয়া দিত। সুধারা স্নান করিতে যাইত দেড়তলার রান্নাঘরের পাশের কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটা অন্ধকার কোটরে। কোন সময় কয়লা ঘুঁটে রাখিবার জন্য হয়ত বাড়ীওয়ালা এটা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কলতলাটা পাড়াসুদ্ধ লোক দেখিতে পায় বলিয়া সুধারা ইহাকেই স্নানের ঘর করিয়াছে। ঘরের দরজা বন্ধ করিলেই চোখে আর কিছু দেখা যাইত না। কিন্তু বালতির ভিতর কলের জলের শব্দটাই মনকে আনন্দে নাচাইয়া তুলিত। স্কুলে মেয়েদের মুখে শোনা রবিবাবুর নূতন গান,

"তোমারই ঝর্ণা তলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্‌খানে"

মনে পড়িয়া যাইত। জলধারার সহিত তাহার অশিক্ষিত কণ্ঠ মিলাইয়া সুধা গান ধরিয়া দিত। মনে থাকিত না যে অন্ধকার আরসোলাপূর্ণ বায়ুহীন একটা খোপের ভিতর সে কোনপ্রকারে স্নানটা সারিয়া লইতে আসিয়াছে। মা অনেক দূর তিনতলার ছাদের আলিসা হইতে ঝুঁকিয়া বলিতেন, "ওরে, তাড়াতাড়ি কর্, ইস্কুলের গাড়ী তোকে ফে'লে যাবে যে।"

শিবু ভাতের থালা বাড়া হইয়াছে শুনিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে

বলিত, "দাঁড়াও! দিদির কবিত্ব আগে শেষ হোক, তবে ত ইস্কুল যাবে।"

ভিজা কাপড় হাতে করিয়া উপরে আসিতে আসিতে সুধা বলিত, "কবিতা কে লেখে রে, তুই না আমি?" কিন্তু মনের ভিতর তাহার এ-তর্কের জোর থাকিত না। শিবু বলিত, "আমি বোকা-সোকা মানুষ, যা খুশী তাই লিখি, যে-সে দেখে, তোমার মত সমস্ত কবিত্বের জাহাজ একজনের জন্যে বোঝাই ক'রে ত রাখি না।"

সুধা সে-কথার জবাব দিত না। বাসনের পিঁড়ির উপর হইতে একটা থালা তুলিয়া রান্নাঘরে নামাইয়া দিয়া বলিত, "বামুনদি, চট্ ক'রে ভাতটা বাড়, মাছভাজা আর ডাল হলেই হবে, আমি চুলটা আঁচড়ে আসছি।"

দ্রুতপদে সুধা উপরে উঠিয়া গেল, চুল আঁচড়াইয়া বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কালাপেড়ে মোটা কাপড়খানা বোম্বাই ধরণে ঘুরাইয়া পরিতে পরিতে ও গুন্‌গুন করিয়া গাহিতে লাগিল,

"রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে,
বলাকা কোন্ গগনে উড়ে চলে।"

বাল্যলীলাভূমিতে প্রত্যহ দেখা শৈলমালার অন্তরালে অস্তমান সূর্যের ছবি মনে ফুটিয়া উঠিতেছিল, জীবনের নবলব্ধ আনন্দ যেন সেই অস্তরাগের রং আরও রহস্যময় করিয়া তুলিতেছিল। স্কুলের পোষাক করিবার সময় হৈমন্তীর কোঁকড়া চুলের মোটা বিনুনীর তলায় চওড়া কালো রেশমী ফিতার জোড়া ফাঁস, তাহার সাদা মসলিনের ফাঁপা হাতের জামা, তাহার সাদা খড়কে-ডুরে শান্তিপুরে ফুলপেড়ে শাড়ী, তাহার মুক্তাখচিত 'এইচ' লেখা ছ-আঙুল লম্বা ব্রোচ, তাহার সাদা লেসের মোজা ও সাদা ক্যানভাসের ফিল-দেওয়া জুতা সুধার মনের ভিতর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। কি সুন্দর হৈমন্তীকে দেখায় এই পোষাকটিতে! কিন্তু সুধা তাহা নকল করিয়া সং সাজিতে এবং হৈমন্তীর পোষাকের অমর্যাদা করিতে চাহে না। সুধাকে অমন হাল্কা পরীর মত পোষাকে মোটেই মানায় না। তাহার এই বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা শাড়ী, মোটা ছিটের জামা ও বিবর্ণ চটিই বেশ ভাল। আঁচলটা কোমরে গুঁজিয়া একটা ষ্টীলের সেফটিপিন কাঁধে লাগাইয়া সে খাইতে চলিয়া গেল। অধিকাংশ দিন আঁচলে চাবি ঝুলাইয়াই সে স্কুলে চলিয়া যায়।

খোকন পাতের কাছে আসিয়া বলিল, "দিদিভাই, আমাকে এতটুকু

মাছ!" তাহার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র ঠেকাইয়া সে মাছের পরিমাণ বুঝাইয়া দিল।

সুধা তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া তাহার ছোট হাতখানিতে আধখানা মাছভাজা তুলিয়া দিল। মহামায়া এই সময়টা স্নান ইত্যাদি সারিয়া একবার সিঁড়ি ধরিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামেন। সুধা চলিয়া যাইবে, তাহার খাওয়াটাও দেখা হইবে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে বিকালের কাজও কিছু আগাইয়া দেওয়া যাইবে। নিজের খাওয়ার পর সেই যে তিনি উপরে যান ত আর নীচে নামেন না। মহামায়া সুধার দান দেখিয়া বলিলেন, "ঐ ত একখানা মাছ তাও আবার আধখানা ওকে দিলি, সারাদিন সেই পাঁচটা পর্যন্ত দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকবি কি ক'রে? যা না মেয়ে, তাঁর লোকের সামনে হাঁ ক'রে খেতেও লজ্জা করে, পাছে তারা দাঁত দে'খে ফেলে। ও ননীর মা, এক ভাঁড় দই এনে দে ত বাছা তোর দিদিমণিকে। এই খেয়ে কি ন-টা পাঁচটা চলে কখনও?"

সুধা শরীরবিজ্ঞান কি ডাক্তারী পড়ে নাই এবং লোভ জিনিসটা স্বভাবতই তাহার কম ছিল। কাজেই খাওয়া জিনিসটায় মানুষের কি প্রয়োজন সে বুঝিত না। ক্ষুধা ত ডাল ভাত খাইলেই মিটে, তবে আবার মাছ না হইলে হইবে না, দই না হইলে চলিবে না করিবার কি প্রয়োজন? মা দই না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না, কিন্তু তাহার জন্য ত আবার দশ মিনিট হাঁ করিয়া বসিয়া থাকা চাই। উঠিয়া পড়িলে এতক্ষণে কালকের সেলাইটা শেষ করা চলিত। মাঝখানে ক'ঘণ্টা খাওয়া হইবে না তাহাতে এমন কি চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে? মানুষ ত জানোয়ার নয় যে অষ্টপ্রহর জাবর কাটিতে হইবে।

স্কুলে পৌঁছিয়াই সবার আগে মনে হয় হৈমন্তী আজ তাহার আগে আসিয়াছে কি? যদি হৈমন্তী আগে আসে তাহা হইলে স্কুল-বাড়ীতে পা দিয়াই তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা দেখা যায়। হৈমন্তী হাসে ছেলেমানুষের মত খিল্ খিল্ করিয়া নয়। কি শান্ত স্নিগ্ধ স্মিত হাস্যটুকু তাহার; সে হাসির শব্দ নাই, আলো আছে।

কিন্তু সব দিন হৈমন্তীকে কাছে পাওয়া শক্ত। একে ত সে পড়ে অন্য ক্লাসে, তাহার উপর মাসে তিন-চার বার জ্বর হওয়া তাহার যেন একটা বাঁধা নিয়ম। হঠাৎ এক-এক দিন ক্লাসে গিয়া ছোট্ট একখানি নীল খামে ছোট একটুখানি চিঠি পাওয়া যায়, "সুধা, আমার একটু জ্বর হয়েছে, আজ আর স্কুলে যেতে পারলাম না।"

সুধার মনটা মুষড়িয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা আনন্দও হয় যে স্কুলের মেয়েদের বিদ্রূপভরা হাসির আড়ালে আজিকার দিনটা অন্ততঃ হৈমন্তীর সঙ্গে তাহার দেখা হইবে। দেখা হইত সন্ধ্যার পরে, কারণ হৈমন্তীর নিয়ম ছিল, জ্বর হইলেই সন্ধ্যার পর সে সুধাকে আনিতে গাড়ী পাঠাইয়া দিত। হৈমন্তীর জ্বরে তাহার আনন্দ করিবার কিছু কারণ যে থাকিতে পারে, ইহাতে সুধার মন নিজেকে অপরাধী ভাবিত।

হৈমন্তীদের বাড়ীতে শয়নকক্ষগুলির দক্ষিণ দিকে দোতলায় পূর্ব-পশ্চিমমুখী প্রকাণ্ড একটা বারান্দা ছিল। তাহার মোটা মোটা জোড়া থামের মাঝখানে উপরের খড়খড়ি হইতে নীচের রেলিং পর্যন্ত লোহার জাল দিয়া আগাগোড়া ঘিরিয়া কাক পক্ষী ও চোর-ডাকাতের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করা হইয়াছিল। এই বারান্দাতেই লোহার একটা খাটে পুরু গদি পাতিয়া, চওড়া হেমস্টীচ্-করা শুভ্র ওয়াড় পরানো আশমানী রেশমের জোড়া বালিশে রুক্ষ তৈলহীন মাথাটি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া হৈমন্তী শুইত।

বাড়ী ফিরিয়া কোন রকমে একটু লুচি তরকারি খাইয়া সুধা ছুটিয়া আসিয়াছে হৈমন্তীর জ্বর বলিয়া। আজ স্কুলের বাসেই ফিরিতে হইয়াছে, তাই

দেরীও হইয়াছে যথেষ্ট। সুধা খাটের পাশের বেতের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া হৈমন্তীর জ্বরতপ্ত মসৃণ কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, শীর্ণ নরম হাতের মুঠা-দুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু বেশী কথা বলিল না। হৈমন্তী তাহার দীর্ঘায়ত চোখের দৃষ্টি দিয়া সুধার আপাদমস্তকে যেন একটি স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিল। তাহার বর্ণহীন পেলব দুটি ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, একটু থামিয়া হৈমন্তী বলিল, "তুমি এসেছ ?"

ঐ ঈষৎ কম্পন আর ঐ দুটি মাত্র কথায় সুধা যেন তাহার সমস্ত অকথিত বাণী আনন্দ-সঙ্গীতের মত শুনিতে পাইল। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল হৈমন্তীর তরুণ চোখের গভীর দৃষ্টি, তাহার মৃণাল গ্রীবার সস্নেহভঙ্গীটুকুও যেন হইয়া উঠিল ভাষাময়। এমনই নীরবেই ফুটিয়া উঠিত তাহাদের নিষ্কলঙ্ক কিশোর জীবনের প্রথম বন্ধুপ্রীতির অম্লান কুসুম। এক মুহূর্তে বলা হইয়া যাইত এক যুগের কথা।

পৃথিবীর হাটে চল্‌তি সাধারণ কথাগুলা সম্বন্ধে সুধার অবজ্ঞা থাকিলেও সে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি ভাই, রোজ রোজ এমন ক'রে জ্বর ক'রো না, শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে কি হবে ভাব ত!"

হৈমন্তী সুধার মুখের দিকে চাহিয়া উদাসীন ভাবে বলিল, "কি আর হবে ? তোমরা কত এগিয়ে পাসটাস ক'রে যাবে, আমি প'ড়ে থাকব !"

সুধা ব্যথিত হইয়া ভাবিল, হৈমন্তী তাহার কথার অর্থ কিছুই বুঝিল না। তুচ্ছ ভাষার ক্ষমতা কি সামান্য। সুধার মনের গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত যে উৎকণ্ঠা, যে নিদারুণ দুশ্চিন্তার কথা সে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, তাহার মুখের কথায় ত তাহার সহস্রাংশের একাংশও প্রকাশ হইল না।

সুধা হৈমন্তীর দুই হাত সজোরে চাপিয়া বলিল, "না, ওসব বাজে কথা নয়। তুমি আর জ্বর করতে পাবে না, পাবে না, কক্ষনো পাবে না।"

হৈমন্তী খুশী হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার হুকুম পালন করতে চেষ্টা করব।"

তারপর নীরবে কিছুক্ষণ ক্ষান্তবর্ষণ আষাঢ়ের আকাশের দিকে চহিয়া বলিল, "দেখ, দেখ, পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে দেখ। আকাশ ভ'রে রঙের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কি আশ্চর্য শিল্পী সে, যে এই বিরাট আকাশের গায়ে প্রতি সন্ধ্যায় নূতন নূতন রঙের এমন অপূর্ব সমারোহ করে। আমি এ রূপ-

সাগরের কূল খুঁজে পাই না। মানুষের তুলিতে এ রূপ ফোটে না, মানুষের ভাষাতেও এর নাম নেই।"

হৈমন্তী কথা বলিতে বলিতে যেন তন্ময় হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া যাইত। সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা তাহাকে যেন মায়াবীর বাঁশির সুরের মত ভুলাইয়া এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাইত। সুধা মুগ্ধ হইয়া আকাশের সৌন্দর্য-সম্ভারের দিকে চাহিত, কিন্তু ততোধিক মুগ্ধ হইত হৈমন্তীকে দেখিয়া। ভাবিত, না জানি হৈমন্তী তাহা অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ লোকের মানুষ, কত গভীর করিয়া এই পৃথিবীর বিচিত্র রসানুভূতি তাহার হৃদয়ে জাগে। গন্ধর্বলোক-বাসিনীদের মত পৃথিবীর স্থূলতা তাহাকে কোথাও যেন স্পর্শ করে না।

হৈমন্তীর ধ্যান হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "তুমিও কিন্তু ঐ আকাশের মত সুন্দর, অমনি নিত্য নূতন রূপের ছায়া তোমার মুখে পড়ে। তোমার মনে কিসের খনি আছে বল ত?"

সুধা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, "কি যে তুমি বল!"

আর বেশী কথা তাহার যোগাইল না, মনে মনে ভাবিল, "হৈমন্তী পাগল। আমি ভারি ত একটা মানুষ! একটা কথা বলতেও ভাল ক'রে পারি না। আমাকে ও কি-না মনে করে!"

হৈমন্তী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "এই বারান্দায় ব'সে রবিবাবুর 'বলাকা' পড়তে আর জ্বর হ'লে এই আকাশের দিকে চেয়ে চুপটি ক'রে শুয়ে থাকতে ভারি ভাল লাগে। বৃষ্টি না এলে এখান থেকে কেউ আমায় নাড়াতে পারে না। তুমি যদি রোজ এখানে আসতে ত দেখতে যে সকাল-সন্ধ্যা সবই এখানে কেমন সুন্দর হয়।"

পথের ধারে এক সারি দীর্ঘ ঋজু দেবদারু গাছ ও দুই-একটা বৃহৎ ছত্রাকার কৃষ্ণচূড়া গাছ বর্ষার জলে ঘন পত্রসম্ভারে ঝলমল করিতেছিল। তাহাদের স্নিগ্ধ শ্যাম রূপে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সুধা ভাবিল, সুন্দর বটে! কিন্তু নয়ানজোড়ের বর্ষার ঘনঘটা, নীল আকাশের গায়ে জটাজুটময়ী রণরঙ্গিণী ভৈরবীর উন্মত্ত বাহিনীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ কাল মেঘ, দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে সবুজের কত স্তর, ক্ষেতের কচি ধানের অঙ্কুরে তরঙ্গ-হিল্লোলের মত বাতাসের খেলা, পাথরের বাঁকে বাঁকে নূপুর বাজাইয়া জলস্রোতের নৃত্য, হৈমন্তী ত দেখে নাই, দেখিলে পাগল হইয়া যাইত।

সুধা বলিল, "তোমাকে ভাই, একবারটি নয়ানজোড়ে নিয়ে দেখবে সত্যিকারের পৃথিবী কি!"

হৈমন্তী যেন ছেলেমানুষ সুধাকে ঠাট্টা করার সুরে বলিল, "তার মানে আমার এই পৃথিবীটা কিছু নয় বলতে চাও ত! আমার এই দক্ষিণের বারান্দায় আলাদিনের প্রদীপ আছে, দু-দিন থাকলে দেখতে পেতে।"

সুধা কিছু বলিল না। সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু মিলাইয়া অন্ধকারের পূর্বসূচনা দেখা দিল। সোনালী মেঘ ক্রমে ক্রোধে কালো হইয়া কেশর ফুলাইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় সুধা বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "ঝড় বৃষ্টি এসে পড়লে মাকে বড় ছুটোছুটি করতে হবে, আমি আসি ভাই আজ।"

হৈমন্তীর স্বাস্থ্যহীনতায় ব্যথিত ও তাহার মনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সুধা যখন বাড়ী ফিরিল তখন বাড়ী নীরব। চন্দ্রকান্ত নূতন একজন জার্মান চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, যদি তাঁহাকে দেখাইলে মহামায়ার কিছু উপকার হয়। শিবু মাঠে মোহনবাগানের খেলা দেখার পর তাহার টিউটরের বাড়ীতে পড়িতে গিয়াছে। বাড়ীতে খোকন ছাড়া মহামায়ার আর কোনও অভিভাবক নাই বলিয়া বামুনদি বাসায় যাইতে পায় নাই। সুধার পায়ের শব্দ পাইয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি যাই ভাল মানুষের মেয়ে, তাই আমারই অদেষ্টে যত দুর্ভোগ। ননীর মা দু-ঘটি জল তুলে আর ঘরে দু-ঘা ঝাঁটা পিটিয়ে কোমর দুলিয়ে চ'লে গেল, আর আমি ছিষ্টির রান্না সেরেও এই গুমোট ঘরে ব'সে আছি। কি করি বল, মা'কে ত আর একলা ফে'লে যেতে পারি না।"

সুধা যেন লজ্জিত হইয়া তাহাকেও কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, "আজ হ'ল ব'লে কি রোজই তোমার দেরী হবে? আজ আমি বড় আটকা পড়ে গিয়েছিলাম কিনা! আচ্ছা, আর একটুও দেরী হবে না। তুমি এখন যাও।"

বামুনদির কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া মহামায়া সুধা আসিয়াছে বুঝিয়া সিঁড়ির মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ও সুধা, উপরে এসে দে'খে যা, তোর পিসি তোর জন্যে কি শাড়ী পাঠিয়েছে। তুই বড় মেয়ে, সংসারের গিন্নি, মা তোর খোড়া, তোর জন্যে কিছু করতে পারে না, উল্টে

তোরই সেবা নেয়। কিন্তু পিসি সেই পাড়াগাঁ থেকেও ঠিক বছর বছর কাপড় পাঠায়, তার কখনও ভুল হয় না।"

মহামায়া তাহার সেই ছোট ঘরের তক্তাতেই আবার দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া গিয়া বসিলেন। তক্তার উপর হিসাবের খেরো-মোড়া খাতা, ছোট একটা পানের ডিবা, ও সংসার-খরচের ক্যাস বাক্স। সুধা উপরে আসিয়া দেখিল, মা'র কোলের উপর গোলাপী রঙের একখানা জরির পাড়ের শাড়ী। পিসিমা পাড়াগাঁয়ে বসিয়াও ত সুন্দর জিনিস সংগ্রহ করিয়াছেন!

মহামায়া বলিলেন, "কাল রথযাত্রার মেলাতে ঠাকুরঝি মৃগাঙ্ককে শহরে পাঠিয়েছিলেন নিশ্চয়। ব্যাপারীরা এই সময় কাপড়চোপড় বাসন কিছু কিছু আনে। ঠাকুরঝি আর কিছু না কিনে টাকা ক'টা তোর জন্যেই খরচ ক'রে ব'সে আছেন। কাপড়খানা প'রে একবার আসিস এ-ঘরে।"

সুধা কাপড়খানা হাতে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সামান্য পাঁচ-ছ' টাকার কাপড়, কিন্তু সুধার কাছে তাহাই অমূল্য। চিরকালই সে সাদাসিধা কাপড় পরে, জরির পাড়ের শাড়ী তাহার বয়সে এই সে প্রথম পাইল। কাপড়খানা সযত্নে খুলিয়া সন্তর্পণে পরিয়া কি মনে করিয়া কপালে একটি সিন্দুরটিপ পরিবার জন্য সে আয়নার কাছে গেল। টিপটা পরিয়া ইচ্ছা করিল আয়নার ভিতর নিজের মুখের ছায়াটা একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে। ছায়ার দিকে তাকাইয়া সে নিজেই ভাবিয়া বিস্মিত হইল যে ইতিপূর্বে এরূপ ইচ্ছা তাহার বিশেষ কখনও হয় নাই কেন। তাহার বয়সে মেয়েরা, এমন কি ছেলেরাও নিজেদের অল্পবিস্তর যা সৌন্দর্যের পুঁজি আছে, তাহা ষোল আনা হিসাব করিয়া রাখে। কিন্তু সে কেন এমন অচেতন উদাসীন? হয়ত বিধাতা তাহাকে শৈশব হইতেই ঐখানে বঞ্চিত করিয়াছিলেন বলিয়া ওকথা সে বেশী ভাবে নাই। হৈমন্তী তাহাকে হঠাৎ সজাগ করিয়া দিয়াছে।

তখন রাত্রি হইয়াছে। এক পশলা বৃষ্টির পর জলভারমুক্ত মেঘগুলি যেন ক্লান্ত হইয়া দিগন্তের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। জলকণাধৌত সপ্তমীর চাঁদের স্নিগ্ধ আলো সুধার গোলাপী-শাড়ী জড়ানো সুঠাম দেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার নিটোল স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ দেহযষ্টির উপরের সুকুমার মুখখানির ছায়া তাহার নিজের চোখেই অকস্মাৎ ভারি সুন্দর

লাগিল। বাড়ীতে ছেলেবেলা হইতে প্রায় সকলের কাছেই সে নাম পাইয়াছে কালো মেয়ে। কিন্তু এমন সর্বগ্লানিমুক্ত রক্তাভ শ্যামসুন্দর মুখশ্রী সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। বিধাতা তাহাকে অটুট স্বাস্থ্য দিয়াছিলেন, তাহারই দীপ্তি যেন তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলে হাল্কা মেঘের আড়ালের অষ্টমীর জ্যোৎস্নার মত জ্বলিতেছে। পীতাভ রঙীন কাগজের ফানুসের ভিতর মোমবাতির মৃদু আলো জালিয়া দিলে তাহা যেমন জ্বল্ জ্বল্ করে, তাহার রেখালেশহীন উজ্জ্বল তরুণ মুখও যেন তেমনই দীপ্যমান। সুধার বিশ্বাস হইতেছিল না যে এই দর্পণের সুন্দর ছায়াটি তাহারই আজন্ম-পরিচিত সুধার ছায়া। সে ত এমন ছিল না; একখানা শাড়ীর রঙে কুৎসিত মানুষ কি হঠাৎ এতটা সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে? অথবা হয়ত সে সুন্দর ছিল, কিন্তু হৈমন্তীর আবিষ্কারের পূর্বে সে তাহা জানিতে পারে নাই। মনটা তাহার অকারণ খুশীতে ভরিয়া উঠিল। কোন এক অদৃশ্য শিল্পী যে তাহার বয়ঃসন্ধিকালে নূতন তুলিকাপাতে তাহাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন তাহা সুধা বুঝিতে পারে নাই।

সুধার মনে পড়িল, কলিকাতায় আসিবার বছরখানিক আগে পিসিমা একদিন মাকে বলিতেছিলেন, "কেমন বউ, আমার কথা ঠিক হবে না বলেছিলে, এখন দেখছ ত? সুধা নাকি তোমার কালো কুচ্ছিৎ হবে? আর দুটো বছর যাক্, তখন দে'খে নিও জাতসাপের বাচ্ছা জাতসাপ হয় কিনা।"

মা নিশ্চয়ই পিসিমার চেয়ে সুধাকে কম ভালবাসেন না, কিন্তু পিসিমার কথাতে মা নিজের জেদ ছাড়িলেন না। তিনি মৃদু একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি কি আর বলেছি যে ও সাঁওতাল হবে? ভদ্র বাঙালীর মেয়ে ঘসামাজা হবে বইকি? তবে শিবুতে ওতে চিরকালই তফাৎ থাকবে এ আমি নিশ্চয় বলছি।"

হৈমবতী রাগ করিয়া বলিলেন, "মুখে তুমি মান না, কিন্তু বউ, তোমার রঙের ঝোঁক আছে। তোমার চেয়ে একটু নীরস ব'লে ওকে তুমি উঁচু নজরে কোনদিন দেখলেই না।"

হৈমবতী ও মহামায়ার এই সব কথা লইয়া সুধা কোন দিন মাথা ঘামায় নাই। মনে মনে সে মহামায়ার কথাই সত্য বলিয়া জানিত। পিসিমার

পক্ষপাতে মনটা তাহার যে মোটেই খুশী হইত না তাহা নয়, কিন্তু সেটা যে নিতান্তই পিসিমার পক্ষপাত এ ধারণাটাও তাহার পাকা ছিল।

আজ সুধার ধারণা বদ্‌লাইয়া গেল। পিসিমা সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, না হইলে হৈমন্তীই বা তাহাকে আকাশের মত সুন্দর বলিবে কেন, সে নিজেই বা কেন দর্পণে নিজমুখ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইবে? মা'র উপর একটুখানি অভিমান হইল, মা নিজে অপূর্ব সুন্দরী, তাই শিবুর গৌরবর্ণের উপর তাঁহার নজর বেশী, সুধার কিছু সুন্দর তিনি খুঁজিয়া পান না। অবশ্য, মা'র উপর বেশী অভিমান সুধা করিতে পারিত না, তাহা হইলে আবার নিজেকেই মস্ত অপরাধী মনে হয়। মানুষ কি দর্পণ, যে যাহাই বলুক না কেন, এ-কথা সুধা ভোলে নাই যে তাহার মায়ের সৌন্দর্যের সহিত তাহার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। তাঁহার রূপ-বিচারের মাপকাঠি ত বড় হইবেই। কিন্তু তবু আজ যাহা সে আবিষ্কার করিয়াছে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নয়, আজিকার মত তাহার চোখে তাহাও অপূর্বই!

শীতের হাওয়া দিয়াছে। সুধা ও শিবু পূজার ছুটিতে মৃগাঙ্কদাদার সঙ্গে হৈমবতীর নিকট গিয়াছিল, বিশ-বাইশদিন থাকিয়া ছুটি শেষ হইবার আগেই ফিরিয়া আসিয়াছে। নয়ানজোড়ের ধানের ক্ষেত সোনায় সোনা হইয়া উঠিয়াছে। সুধাদের ভিতর-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান গোবর দিয়া নিকাইয়া করুণা ঝি সেখানে ধান মাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরু ও মহিষের গাড়ীতে বোঝাই রাশি রাশি ধান আনিয়া লখা মাঝি ও ডুমকা সাঁওতাল উঠানে ঢালিতেছে। হৈমবতী ভয়ানক ব্যস্ত। কুলি-কামিনদের ধান দিয়া পয়সা দিয়া যে যেমন চাহে ধানকাটার বেতন শোধ করিতে হইতেছে, আবার তাহার হিসাবও রাখিতে হইবে। সুধা সাহায্য করিতে গেলে তিনি যেন আজকাল কেমন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠেন। "না বাছা, তোমরা লেখাপড়া ফে'লে এর ভিতর কেন? এ সব গেঁয়ো চাষা-ভূষোর কাজ কি তোমাদের সাজে?" তিন বছর আগে যে-সব সাঁওতাল মেয়েরা ঘরের লোকের মত সুধার সঙ্গে গল্পগুজব করিত তাহারাও এখন একটু দূর হইতে তাকায়।

সুধা ক্ষুণ্ণ হইত বটে, কিন্তু বিস্মিত হইয়া দেখিত, তাহারও মন আজ আর নয়ানজোড়ের ধানের ক্ষেতের ভিতর নাই। কলিকাতার বাঁধানো রাজপথের ধারে হৈমন্তীদের বারান্দায় হৈমন্তীকে ঘিরিয়াই তাহার মনটি ঘুরিয়া বেড়াইত। শীতের সন্ধ্যা সকাল সকাল কালো হইয়া নামিলে পিসিমা যখন পশ্চিমদিকের দরজা-জানালাগুলা ভেজাইয়া একলা-ঘরের বহুদিন-সঞ্চিত দুঃখের কথা বলিতে বসিতেন এবং নিজের বুড়ো হাড় ক'খানার জন্ম একটুখানি বিশ্রাম ভিক্ষা করিতেন, শুধু তখনই সুধার মনে হইত, এমন করিয়া পিসিমাকে একলা ফেলিয়া সকলে চলিয়া না গেলেই ভাল হইত। মৃগাঙ্কদাদা বাহিরে বাহিরে ধান চাল আর খাজনা আদায় করিয়া বেড়ায়, পিসিমা তাহাই মাপেন আর মরাইয়ে তোলেন। যদি সুধা এখানে থাকিত তাহা হইলে পিসিমার জীবনযাত্রার ধারায় আর-একটুখানি সরসতা ও আর-

একটুখানি বৈচিত্র্য হয়ত দেখা যাইত। কিন্তু হায়, তাহাদের আজ সকলেরই জীবনের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর পূর্বস্থানে ফিরাইয়া আনা যাইবে না। একলা ধান চাল মাপিয়াই পিসিমার শেষ কয়টা দিন কাটানো ছাড়া গতি নাই।

কতকটা যেন মায়া বাড়াইবার ভয়েই সুধা এবার ছুটি শেষ হইবার আগেই কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে। নহিলে কোথা হইতে একটা টাট্টু ঘোড়া জুটাইয়া শিবুকে বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইবার খেলায় মৃগাঙ্ক-দাদা বেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

বহুকাল পরে সুরধুনী রুগ্ন বোন মহামায়াকে দেখিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভরসাতেই খোকাকে কলিকাতায় রাখিয়া সুধা পিসিমার কাছে যাইতে পারিয়াছিল। না হইলে মা ও খোকাকে ফেলিয়া একদিনের জন্যও তাহার কোথাও যাইবার উপায় নাই। এই একটি চিররুগ্না মা ও একটি শিশু ভাই যেন তাহার দুই পায়ের বেড়ি। তাহারই উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই জন্য তাহার এই বন্দীদশায় ছিল সুধার আনন্দ ও গৌরব।

সুরধুনীকে সুধা খুবই ভালবাসিত, কিন্তু তাঁহার কাছে মামার বাড়ীর গল্প শুনিবার আশায় বাঁধা পড়িলে আর পিসিমার কাছে যাওয়া হয় না। সুতরাং এই বিচ্ছেদের ত্যাগটুকু তাহাকে স্বীকার করিতেই হইয়াছিল। ফিরিয়া যখন আসিল তার পরদিনই সুরধুনীও দেশে ফিরিয়া গেলেন। একটা মাত্র দিনের দেখাশুনা তাহাতেও সুরধুনী সুধার সঙ্গে বেশী ছেলেমানুষী গল্প করিলেন না। হাসিয়া দুই-তিন বার বলিলেন, "ষেটের কোলে সুধা এবার ডাগরটি হয়েছে, মায়া এবার চন্দরকে সজাগ ক'রে দিস্, নইলে পণ্ডিত-মানুষের কি আর হুঁস হবে?"

মহামায়া বলিলেন, "উনি বলেন পড়াশুনো সাঙ্গ না হ'লে বিয়ে দেবেন না।"

সুরধুনী বলিলেন, "স্বামীই মেয়েমানুষের জপতপ ধ্যান ধারণা, এই পড়াশুনোতেই যদি ভালছেলে পছন্দ করে, তবে আর কার জন্যে বেশী পড়াশুনো করবে? ও কি আর আপিস আদালত করতে যাবে?" হৈমবতীও আসিবার সময় সুধাকে বলিয়াছিলেন বটে, "লেখাপড়া ত খুব করাচ্ছে তোমার বাপ, কিন্তু যেমন এদিকে করাবে, ওদিকেও সেই মত হিসেব ক'রে

না আনতে পারলে যে মান থাকবে না, সে সব কি হুঁস আছে? আর ত কচিটি নেই, এবার এসব কথাও ত ভাবতে হবে?"

সুধা যে বড় হইয়াছে, মাসি পিসি সকলের মুখেই এখন সেই কথা। পিসিমা হুঁসিয়ার মানুষ, তিনি আবার সুধাকে কত বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। "তোর মা রোগা মানুষ, ঘর থেকে ত বেরোয় না, বাইরে যেতে আসতে আর যার তার সঙ্গে হট্ হট্ ক'রে বেড়াবি না। বাপের সঙ্গে যাবি, শিবুকেও সঙ্গে নিস্। পুরুষ ছেলের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিস্ না, তাদের সঙ্গে এক আসনেও কখ্খনো বসবি না।"

সুধার ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিশেষ নাই। তাহাদের পরিবারের সকলের বন্ধু সুধীন্দ্রবাবুই এক এ-বাড়ীতে আসাযাওয়া করেন, তাঁহার সঙ্গে তাহাদের সকলেরই বেশ ভাব। অন্য কেহ সমবয়স্ক বন্ধু তাহার থাকিলে আপত্তি ছিল না, কারণ স্ত্রীসমাজে পুরুষেরা যে এমন অপাঙ্‌ক্তেয় সুধার তাহা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। পিসিমার কাছে এবার সে শিখিয়াছে যে বড় হইলে পুরুষজাতিকে সর্বদা সাত হাত তফাতে রাখিয়া চলিতে হয়। এমন কি সর্বক্ষেত্রে সর্বঘটে সকলকে মুখ দেখিতেও দেওয়া উচিত না। কয়েকটা মাত্র বৎসরের ব্যবধান ঘটিয়া তাহার জীবনে এমন সকল পরিবর্তন কেন আসিবে তাহা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। কেনই বা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ হইতে তাহাকে দূরে দূরে থাকিতে হইবে এবং কেনই বা বিশেষ একটি মানুষের জন্যই তাহার বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা সব মাপিয়া রাখিতে হইবে তাহাও বুঝা শক্ত। সে এতকাল পিতামাতার কাছে ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে শিখিয়াছে, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষা তাহার নিজের এবং দশ জনের আনন্দ ও উন্নতির জন্য, তবে আজ তাহার বেলা মাসিমা পিসিমারা সব নূতন নিয়ম প্রচার করিতেছেন কেন? স্ত্রীলোকেরা কি ঠিক মনুষ্যজাতির মধ্যে গণ্য নয়? একটুখানি নীচে বোধ হয় তাহাদের আসন! কিন্তু কেন?

যাইবার সময় সুধা সুরধুনীকে বলিল, "মাসিমা, আবার তুমি কবে আসবে?"

মাসিমা বলিলেন, "তোমার বর দেখতে আসতেই ত হবে মা। সে আমাদের কত আদরের জিনিস!"

আবার সেই সব কথা! সুধার জন্য আর মাসিমা আসিবেন না। সুধা এখন আর সে সুধা নাই।

ছুটি প্রায় কাটিয়া আসিতেছে কিন্তু নয়নজোড়ে চলিয়া যাওয়ার জন্য বাড়ীর কাজকর্ম অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে। পিসিমা-মাসিমাদের নূতন প্রসঙ্গের কথা ভুলিয়া এইবার সুধাকে সেই-সব দিকে মন দিতে হইবে। তাহার উপর হৈমন্তীর ডাকও আছে। প্রায় মাস-খানিক দেখাশুনা নাই, হৈমন্তী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ছুটি থাকিতে থাকিতেই বড় রকম একটা উৎসব কি চড়ুই-ভাতের আয়োজন করিয়া সে এতদিনের অদর্শনের দুঃখটা একটু ভুলিতে চায়। সুধার ত এত আয়োজন করিবার ক্ষমতা নাই, সে আর কি করিবে? হৈমন্তীকে ডাকিয়া এক দিন নিজের হাতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবে। হৈমন্তী নতন গুড়ের পায়েস খাইতে ভালবাসে। সুধা নয়ানজোড় হইতে পিসিমার কাছে চাহিয়া নূতন গুড়ের 'নবাত' আনিয়াছে, তাই দিয়া পায়েস রাঁধিবে। আর একটা বিদ্যাও সে পিসিমার কাছে শিখিয়া আসিয়াছে—বিবি-খোঁপা বাঁধা। হৈমন্তীর ঐ রেশমের মত নরম কুঞ্চিত কাল চুলগুলি দিয়া কেমন খোঁপা হয় সুধা দেখিবে। হৈমন্তীও ত বড় হইয়াছে, এখন জোড়া ফাঁস দেওয়া বিনুনি না ঝুলাইয়া তাহার মৃণালের মত গ্রীবাটি বাহির করিয়া খোঁপা বাঁধিলে গ্রীক দেবীমূর্তির মত সুন্দর দেখাইবে।

সুরধুনী চলিয়া যাইবার পর সংসারের তোলা বিছানা-কাপড় রোদে দিতে দিতে সুধা এই-সব সাত-পাঁচ ভাবিতেছিল। অন্যান্য বছর ভাদ্র মাসেই সমস্ত কাপড়-চোপড় রোদে দিয়া ছ'মাসের মত ঝাড়িয়া তোলা হয়, এবার আর তাহা হইয়া উঠে নাই। বিধাতাপুরুষ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে পাঁজিতে ভাদ্র আশ্বিন বলিয়া দুইটা মাস আছে। সেই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে বৃষ্টি নামিয়াছিল, একেবারে শেষ হইল কার্তিকের গোড়ায় আসিয়া। অবিশ্রাম জলে সারা ভারতবর্ষটাই যেন তলাইয়া যাইবার যোগাড়। কলিকাতার লোকে সুদ্ধ দু-বেলা ভাবিতেছে, এই বুঝি গঙ্গার জলে ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া শহর ডুবিয়া যায়। ইহার ভিতর ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীতে ঘরের ভিতরকার বিছানা-কাপড়ই শুষ্ক রাখা দায় ত বাহিরে দিবে কি? সূর্যদেব ত মেঘের ঘেরা-টোপ তুলিয়া পৃথিবীর মুখ দেখিতেই পান না।

দক্ষিণের বারান্দার দরজার কাছে তক্তাপোষটা টানিয়া মহামায়া বসিয়াছেন

একটু হাওয়া পাইবার আশাতে। সুধা ছোট ছাদে ঝুলানো লোহার তারে গরম ও রেশমের কাপড়গুলি শুকাইতে দিতেছিল। লেপগুলাও আলিসার উপর মেলিয়া দিয়াছে। মহামায়া বলিলেন, "শিবুর হাতে কাপড় পড়লে ভালমন্দ ত কিছু বিচার করে না, তার কাছে চটও যা আর কিংখাবও তা। কাপড়গুলোকে একটু ছুঁয়াই ক'রে রাখিস্ বাছা! তসরের পাঞ্জাবি, সিল্কের শার্ট সব ঘেঁটে গোবর ক'রে রেখেছে, সেগুলো শুধু রোদে দিলে ত হবে না, শালকরকে ডাকিয়ে একবার কাচিয়ে নিতে হবে। সারা শীত ওসব গায়ে উঠবে না, আকাচা তুলে রাখলে যে-কাপড়ের সঙ্গে তুলবে তাও পোকায় কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে রেখে দেবে।"

সুধা বলিল, "আচ্ছা, আমাদের তিনজনের কাপড় রোদে দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে রাখি। ওই দুই মূর্তিমানের জিনিস না-হয় কেচে তোলা যাবে। বাবার ত দুখানা এণ্ডি আর গরদের চাদর, ও ত রোদেও না দিলে চলে। সারা বছর গায়ে দিলে ময়লা হ'ত না বোধ হয়। শালখানা শীতের শেষে কাচিয়ে রাখতে হয়, তাই গত বছর কাচিয়েছিলাম। না কাচালেও কেউ বিশ্বাস করত না যে সারা শীতের ব্যবহার। কি ক'রে যে বাবা পারেন?"

মহামায়া সুধার সিল্কের ব্লাউসে হুক টাঁকিতে টাঁকিতে বলিলেন, "যার ভাল হয় তার সবই ভাল। আমি ত বাপু দিবারাত্রি রাজসিংহাসনে ব'সে আছি, তবু অমন ক'রে জিনিস রাখতে পারি কই? গায়ের থেকে জামা কাপড় নামিয়ে পাট না ক'রে উনি কখনও আলনায় পর্যন্ত রাখেন না।"

পাশের বাড়ীর মণ্ডলগৃহিণী তালপাতায় বোনা ব্যাগে করিয়া উলকাঁটা লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, দুপুরবেলা পাড়াপড়শীর বাড়ী একবার তাঁহার যাওয়া চাই। প্রথম প্রথম মহামায়ার কাছে পাড়ার গিন্নিরা বড় আসিতেন না, কিন্তু হঠাৎ যখন মণ্ডলগৃহিণী একবার আবিষ্কার করিয়া বসিলেন যে মহামায়া মানুষটা বেশ গপ্পে, তখন প্রত্যহ তাঁহার কাছে একবার করিয়া হাজিরা দেওয়া মণ্ডলগৃহিণীর বাঁধা নিয়ম হইয়া উঠিল। কারণ এই মানুষটিকে বাড়ীতে আসিয়া অনুপস্থিত কখনও দেখা যাইবে না তাহা সকলেই জানিতেন।

সুধা তালপাতার ব্যাগের দিকে তাকাইয়াই ভীত স্বরে বলিল, "ও মাসিমা, আপনার ছেলেরা যে সব কলেজে পড়া শুরু ক'রে দিল, আপনি আবার উল বুনছেন কার জন্যে?"

মণ্ডলগৃহিণী বলিলেন, "ওর কি আর জন্যে টন্যে আছে মা? হাতটা নাড়লে মনে সান্ত্বনা হয় যে একটা কাজ করছি; তার পর জমা ক'রে রাখলে একে তাকে দিতে কত কাজে লেগে যায়। লোকলৌকিকতাও ত আছে! ঐ দেখ না, তোমার মা ও ত টুকটাক ক'রে হাত চালাচ্ছেন।"

হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, "টুকটাক নয় ভাই, চট্‌পট্ মেয়ের ব্লাউস তৈরি হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবে, ছুটোছুটির কাজগুলো আমার ও সেরে ফেলছে, আমি ওর হাল্কা কাজগুলো ক'রে দি।"

নূতন একটা গল্পের গন্ধ পাইয়া মণ্ডলগৃহিণী উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "তাই নাকি? কার সঙ্গে যাচ্ছে গো?"

মহামায়া বলিলেন, "ওই ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই যাবে। আমাদের সুধীন-বাবু আছেন, ছোটর সঙ্গে ছোট আবার বড়র সঙ্গে বড়। তিনিই নিয়ে যাবেন, তবে যোগাড়-যাগাড় করছে রণেন পালিতের মেয়ে হৈমন্তী। সুধাকে যে ভয়ানক ভালবাসে। ওকে ছাড়া এক পা কোথাও যেতে চায় না।"

মণ্ডলগৃহিণী বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভালবাসে ভালই, তবে মেয়ে না ভালবেসে ছেলে ভালবাসলেই বেশী কাজ হত। বড়মানুষের প্রথম ছেলে! আমাদের ক্রীশ্চান ঘর হ'লে লুফে নিত, তোমাদের আবার বামুনের জাত এই যা।"

মহামায়া ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষের সামনে কি যে ছাই-ভস্ম বকছ ভাই, তার ঠিক নেই। মা-মাসির সম্পর্কও কি ভুলে গেলে?"

মণ্ডলগৃহিণী সে কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, "সুধা বড় হয়েছে, এখন আর ঘরে-তৈরি জামা কাপড় পরিয়ে বাইরে পাঠিও না, ভাই। দরজি ডাকিয়ে মাপসই সব কাপড়চোপড় করাবে। যেখানে বাইরের পাঁচটা লোক আসে সেখানে দশ জনে দে'খে ভাল বলে এমন ক'রে ত মেয়েকে পাঠানো উচিত? মেয়েছেলেকে শুধু লেখাপড়া শেখালেই মানুষ হয় না, আরও অনেক জিনিস শেখানো চাই।" এই বলিয়া তিনি মহামায়ার দিকে চোখ টিপিয়া একটা ইসারা করিলেন—অর্থাৎ কাহার কখন সুনজরে এ-বয়সের মেয়েরা লাগিয়া যায় তাহার ত ঠিক নাই, মনোহরণ-বিদ্যার প্রথম ধাপ যে প্রসাধন, সে কথা এখন আর ভুলিয়া থাকা চলে না।

মহামায়া ইসারা বুঝিয়াও গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, বড়লোকের

মেয়ের সঙ্গে গেলে গায়ে গরীবের মার্কা অত স্পষ্ট ক'রে না মেরে যাওয়াই ভাল। সমানে সমানে মিশতে পারলেই মানুষের মান থাকে। তবে আমিত জেলখানার কয়েদী, ঘরের বাইরের পৃথিবীটা কতদিন চোখে দেখি নি, কাজেই কোন্‌খানে যে কি বেমানান হচ্ছে সব সময় বুঝতে পারি নে। মেয়েটাও বেশী সৌখীন নজর নিয়ে জন্মায় নি, ওই বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় প'রেই ত ক'বছর এখানে কাটিয়ে দিল। একটা হাবড়া হাটের কাপড়, তাও ওকে সেধে পরাতে হয়। শুনছিস্ ত সুধা, পিসি ত পূজোতেও তোকে নূতন জরীপেড়ে নীলাম্বরী দিয়েছেন, ঐখানাই প'রে যাস। জামাটা ঘরে তৈরি হলেও সিল্কের ত বটে, ওই পরলেই বেশ চলবে।"

উঠিতে বসিতে বড় হইয়াছে শুনিতে আর সুধার ভাল লাগে না। মানুষের শৈশব কি এতই ক্ষণস্থায়ী? আর বড়-হওয়া কি মানুষের একটা অপরাধ? বড় হইলে সকল বিষয়ে এত ভয়ে ভয়ে আটঘাট বাঁধিয়া চলিতে হইবে কেন? আরও আশ্চর্য যে মৃগাঙ্ক-দাদা যে সুধার চেয়ে আট বছরের বড় তাহাকে কেহ কোনদিন বড় হওয়ার জন্য পঁচিশ রকম নিয়ম পালন করিতে বলে না। মণ্ডলগিন্নির ছেলেরা কলেজে পড়ে, তাহারাও বড় হওয়ার কোন দায়িত্ব বহন করে এমন ত তাহাদের মায়ের কথায় মনে হয় না। তবে সুধা অকস্মাৎ দুই-তিন বছরে সকলকে ডিঙাইয়া এত বড় কি করিয়া হইয়া গেল?

শৈশবের অৰ্দ্ধসুপ্তি হইতে জীবনে একটা নূতন জাগরণের মধ্যে যে সে বাড়িয়া উঠিতেছে, ইহা সুধা নিজে একেবারেই অনুভব করে নাই এমন নহে। ঊষার উন্মেষ যেমন অন্ধকারের বুকের ভিতর হইতেই কোনও আকস্মিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করিয়া এক এক পরদা করিয়া দেখা দিতে থাকে, তাহার দেহমনও তেমনই পাপড়ির পর পাপড়ি বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বিকাশ ভয়ের নয়, আনন্দের। সেখানে সতর্ক প্রহরীর মত কেহ চীৎকার করিয়া বলে নাই, 'সাবধান বড় হইয়াছ।' সেখানে কে যেন শেষ রাত্রের মধুর স্বপ্নের ভিতর গান গাহিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইতেছে, "দেখ, এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ, কাল যার কোলে অকস্মাৎ এসে পড়েছ মনে হয়েছিল, আজ অনুভব করছ না কি তোমার দেহমনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুমি তার সঙ্গে জন্ম জন্ম বাঁধা?" কার এ বাণী সুধা বুঝিত না, কিন্তু আনন্দ-শিহরণের সহিত

সে অনুভব করিত সৃষ্টির সহিত জন্মজন্মান্তরের তাহার অচ্ছেদ্য বন্ধন। সবটা এখনও তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠে নাই, কিন্তু প্রতি দিনই যেন ধরিত্রীমাতা একটু একটু করিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া রহস্য-মধুর কণ্ঠে কানে কানে বলিয়া দিতেন, "আমার বিশ্ব-সৃষ্টির শতদলে তুমি একটি পাপড়ি, তোমাকে বাদ দিলে তা অসম্পূর্ণ হবে। এ সৃষ্টি-লীলায় তোমার পালা এল বলে, তার জন্য প্রস্তুত হও।"

সুধা বুঝিত না, জানিত না, কিন্তু আপনা হইতেই তাহার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, জগতে একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছে। তাহাকে তাহার জন্য পূজারিণীর মত নিষ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। হয়ত লোকের চক্ষে সৃষ্টিতে তাহার পালা অতি সামান্যই মনে হইবে, কিন্তু তবু নিজের কাছে তাহাকে সেইটুকু নিখুঁত করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জীবনে যে-সকল দুঃখ-বেদনা সে পায় নাই, যে আনন্দও সে জানে নাই, গানের সুরে কবিতার ছন্দে তাহা যখন কানের কাছে বাজিয়া উঠিত, আনন্দ ও বেদনার গভীর অনুভূতিতে বুকের তারগুলা কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত, "এ বেদনার তীব্র আঘাত, এ সুখের নিবিড় স্পর্শ আমার যে বহুপরিচিত। কবে মনে নাই, কিন্তু ইহাকে আমি একদিন বুকের ভিতর করিয়া বহন করিয়াছি।" সুধা পৃথিবীর রূপরসগন্ধকে যেন দুই হাতে আপনার বলিয়া কাছে টানিয়া লইতে লাগিল। ইহাকে সে দিন দিন যত চিনিতেছে ততই আরও চিনিতে চায়। মনে হয়, বহু-পুরাতন পরিচয়ের উপর শৈশবের সুষুপ্তি একটা আবরণ টানিয়া দিয়াছিল, আজ তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে।

নিজের সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য তাহার ছিল তাহা যেন ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে। নিজেকেও সে আগের চেয়ে বেশী ভালবাসিতে শিখিয়াছে। তাই প্রসাধনেও তাহার নজর এখন আগের চেয়ে একটুখানি বেশী হইয়াছে। সখ নামক অজানা জিনিসটা তাহার মনের ভিতর ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র যে রূপের সৌন্দর্যের সুষমা, তাহার মাঝখানে সে একটা শ্রীহীন আবর্জনার মত মানুষের চক্ষুপীড়া ঘটাইতে চাহে না। তাহার জন্য সৌন্দর্যের রাগিণীতে যেন হঠাৎ বেসুর না বাজিয়া উঠে।

অবশ্য, হৈমন্তীর সমান পর্যায়ে সে উঠিতে রাজি নয়। ময়ূরের পেখমে যে বর্ণচ্ছটা মানায়, ঘুঘু পাখীর স্বল্প পালকে কি তাহা খোলে? হৈমন্তীর মত

নির্দোষ নিখুঁৎ উজ্জ্বল সাজসজ্জা তাহার অঙ্গে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে। ততটুকু সাজপোশাকই তাহার পক্ষে ভাল যাহাতে লোকে তাহাকে অদ্ভুত কিছু একটা না মনে করে। কিন্তু লোকে আসিয়া তাহার সাজপোশাক তারিফ করিবে ভাবিতেও সুধার ভয় হয়। সুশোভন কি অশোভন কোনও ভাবেই মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা বিষয়ে তাহার একটা সঙ্কোচ ছিল।

মণ্ডলগৃহিণীর কৌতূহল তখনও মিটে নাই, সদুপদেশ দিবার ইচ্ছাও তেমনই ছিল। তিনি বলিলেন, "গিন্নিবান্নি ত সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না দেখছি, শুধু একপাল মেয়ে নিয়েই সুধীন-বাবু যাবেন, না ছেলেছোকরাও থাকবে?"

মহামায়া বলিলেন, "ছেলেরাও কেউ কেউ আছে শুনেছি। তবে সবই ওদের চিরকালের চেনাশুনো। আমরা এখানে বেশীদিনের ত মানুষ নয়, আমাদের কাছে একটু নূতন বটে।"

মণ্ডলগৃহিণী কি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আমার ছেলেদের ও সব বালাই নেই। তারা ক্রিকেট, ফুটবল আর হকি নিয়েই মেতে আছে। মা ছাড়া কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম না আজ পর্যন্ত। বড়টা উনিশ বছরের হ'ল, এখনও মা না হ'লে খাবে না, ঘুমোবে না, যতক্ষণ বাড়ী থাকে আমারই পিছন পিছন ঘোরে। মেয়ে তোমার সব বোঝে-সোঝে ত? একলা ত দিব্যি ছেড়ে দিচ্ছ?"

মহামায়া বলিলেন, "তোমার এক কথা ভাই! এত জানবার বোঝবার কি আছে? দল বেঁধে পাঁচজনের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, তারা ত কেউ বাঘ ভাল্লুক নয় যে ওকে খেয়ে ফেলবে?"

মণ্ডলগৃহিণী বলিলেন, "থাক্, আমার অত কথায় কাজ কি? তোমার ছাগল, তুমি যে দিকে খুশী কাট!"

মণ্ডলগৃহিণী ব্যাগ গুছাইয়া বাড়ী চলিয়া গেলে সুধা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতেছিল, পৃথিবীটা সুন্দর, কিন্তু তাহার তলায় তলায় কি যেন কি একটা রহস্যের ধারা বহিয়া যাইতেছে। কেউ ইঙ্গিত করে, কালো কুৎসিত ভয়ঙ্কর কি একটা রহস্য পৃথিবীর সুন্দর মুখোসের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছে, কখন না জানি উপরের সমস্ত সৌন্দর্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কেউ বা গানের সুরের ভিতর দিয়া বলে, এই সৌন্দর্যের অন্তরালে আরও কত অনন্ত

সৌন্দর্যের খনি রহস্যগভীর গোপন অন্ধকারের তলায় রহিয়াছে, মাঝে মাঝে শুধু নিমেষের মত তাহা দেখা যায়।

সুধার মনটাও বলে, পৃথিবী রহস্যময়ী। একবার তাহার অন্তরালের অন্ধকার তমিস্রার স্রোত বুকে ভয়ের কাঁপন আনিয়া দেয়, আবার তাহার চকিতের দেখা সোনালী আলোর স্রোত বলে, মিথ্যা ও অন্ধকার, মিথ্যা ভয় ভাবনা। তখন ইচ্ছা করে, চোখ বুজিয়া ছুটিয়া চলিতে ঐ না-দেখা রহস্য-পুরীর আনন্দের সন্ধানে।

চুলটা বাঁধিয়া প্রসাধনের শেষ পর্ব পর্যন্ত পৌছিতে না-পৌছিতে গলির ওপার হইতে হৈমন্তীদের পরিচিত হর্ণের শব্দ কানে আসিয়া পৌছিল। সুধার হাত পা আরও দ্রুত চলিতে লাগিল, তাহার ভয় হইল পাছে সে শেষ কর্তব্য গুলি সমাপন করিবার পূর্বেই হৈমন্তী দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৈমন্তীকে সুধা ভালবাসিত, তাহাকে কাছে পাইলে আনন্দিত হইত। কিন্তু তাহার উপস্থিতিতে মনের সহজ আটপৌরে স্বস্তি যেন কোথায় চলিয়া যাইত। সংসারের প্রাত্যহিক ধর্ম তখন চোখে এত ছোট বলিয়া বোধ হইত, ঘরোয়া প্রয়োজনের কথাবার্তা কানে এমনই বেসুরো শুনাইত যে তাহার হাত পা মন সবই যেন অকস্মাৎ আড়ষ্ট হইয়া যাইত। দৈনন্দিন ব্যাপারে তাহাদের আর নিযুক্ত করা যাইত না। সেই জন্য এই সব চুল বাঁধা মুখ ধোওয়ার কাজ সে নেপথ্যে চুকাইয়া রাখিতেই ভালবাসে।

সিঁড়িতে হৈমন্তীর উঁচু হিলের বিলাতী জুতার খট্‌খট্ শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মৃদু একটা অঙ্গরাগের সুগন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া ঘরে আসিল। সুধার চেয়ে হৈমন্তী অনেকটা সহজ মানুষ ছিল। সিঁড়ি হইতেই একবার ডাকিয়া বলিল, "মাসিমা, আমি সুধাকে নিতে এসেছি।"

ছোট খোকা একমাথা কোঁকড়া চুল দুলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, "হেমুদিদি, তোমার গলাটা বেশ সরু! তুমি সোনার ঘড়ি পরেছ?"

হৈমন্তী হাসিয়া তাহার হাতের ঘড়িটা খুলিয়া একবার খোকার হাতে বাঁধিয়া দিল। মহামায়া বলিলেন, "ফিরতে কি রাত হবে মা তোমাদের?"

হৈমন্তী বলিল, "না, রাত হবে কেন? আর হ'লেও আপনার ভয় নেই। আমি সুধাকে নিজে সঙ্গে ক'রে ফিরিয়ে এনে আপনার বাড়ীতে দিয়ে যাব। আর আমরা ত একলা যাচ্ছি না। সঙ্গে ত সবাই রয়েছেন।"

হৈমন্তীদের সিডান গাড়ীতে তাহার বাবা, ছোট ভাই ও একটি জ্যাঠতুত বোন ছিলেন। সুধাকে দেখিয়া তিন জনেই সমস্বরে কথা বলিয়া উঠিলেন। হৈমন্তীর এই দিদি মিলি বয়সে তাহার চেয়ে বছর-তিনের বড়। নিজের

অস্তিত্ব মর্যাদা ও রূপগুণ সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য সচেতন মানুষ খুব কম দেখ যায়। সুধাকে দেখিয়াই সে একবার মাথার চুলের উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া, কানের নূতন গহনা দুইটি নাড়িয়া, গায়ের উপরের শাড়ীর ভাঁজ ও পাড়ের ভঙ্গীটা ঠিক করিয়া লইয়া আবার চোখের দৃষ্টিটা এমন মোলায়েম করিয়া লইল যেন নিজের প্রসাধন সম্বন্ধে নিজে সে সম্পূর্ণ উদাসীন।

মিলি বলিল, "ওয়াকিং শূ প'রে এলে না কেন সুধা? এদিক্ ওদিক্ ক ঘোরাঘুরি করতে হবে, পাদুটো বেশ আরামে থাকত।"

হৈমন্তী সুধাকে জবাব দিবার বিড়ম্বনা হইতে বাঁচাইবার জন্য বলিল "বাঙালীর মেয়েরা শুধু-পায়ে হরিদ্বার থেকে কুমারিকা পর্যন্ত বেড়িয়েছে, তাদের চটিতে ত বিশ্ব বিজয় করা হয়ে যায়।"

রণেন-বাবু বলিলেন, "তোমার রোদে রোদে ঘোরা অভ্যেস আছে ত মা?"

হৈমন্তীর ছোট ভাই সতু ভাঙা গলায় বলিল, "আমি কি খালি একা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে যাচ্ছি? আমার দলের ত কই কেউ জুটল না। আপনার ভাইকেও যদি আনতেন ত একটু কাজ হ'ত।"

গাড়ী সুধীন্দ্র-বাবুর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। এইখানে তাহাকে তুলিয়া লইয়া এবং রণেন-বাবুকে একটা দোকানে নামাইয়া দিয়া গাড়ী সোজা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইবে।

দক্ষিণেশ্বরের জীর্ণ ফটকের কাছে গাড়ী যখন পৌছাইল, তখন দেখা গেল ভিতরে ইঁহাদেরই অপেক্ষায় আর একদল মানুষ পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে গাড়ীটা দেখিয়াই চার জন যুবক ছুটিয়া আসিয়া প্রায় একই সঙ্গে দরজার হাতল ধরিয়া টান দিল। এ দলে একটিও মেয়ে নাই। নিখিল, সুরেশ তপন ও মহেন্দ্র চার জনে প্রায় সমবয়সী। ইহারা প্রায়ই হৈমন্তীদের বাড়ী যাওয়া-আসা করে।

মহেন্দ্র দূরসম্পর্কে সুধীন্দ্র-বাবুর কি রকম যেন আত্মীয় হয়। তাঁহাদের বাড়ীতেই ছেলেবেলা হইতে বেশীর ভাগ সময় থাকিত, এখন পাস করিয়া নিজে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। হৈমন্তীকে এক সময় সে সংস্কৃত পড়াইত সেই সূত্রেই তাহাদের সঙ্গে পরিচয়। আজ ইহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিবে

শুনিয়া মহেন্দ্র আপনা হইতেই তাহার তিন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। সুধার সকলের সঙ্গে পরিচয় নাই কিন্তু হৈমন্তীর সকলেই পূর্বপরিচিত।

নিখিল দীর্ঘাকৃতি শ্যামবর্ণ সদাহাস্যমুখ সুপুরুষ যুবা, সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবীর উপর গলায় চামড়ার ব্যাগে ক্যামেরা ঝুলিতেছে, কথা হাসি ও ছবিতোলা কোন বিষয়েই কার্পণ্য নাই।

সুরেশ কালো মোটা ছোটখাট মানুষ, চোখের চশমা গলায় সরু চেন দিয়া বাঁধা, কখনও বুকের উপর দোলে, কখনও চোখে থাকে। মানুষটা বেশী কথা বলে না। কিন্তু মনে হয় চশমার ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিস দেখিয়া নিজের মনের খাতায় লিখিয়া রাখিতেছে। মোটাসোটা মানুষের পক্ষে তাহাকে প্রখরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণধী বলিয়া মনে হয়। কোনও বিষয়ে ঔদাস্য নাই।

তপন নবীন ভাস্করের মতই আশ্চর্য সুন্দর। দেখিলে মনে হয় বিধাতা ইহাকে মর্মর পাথরের উপর তুলি দিয়া আঁকিয়া তাহার পর অতন্দ্রিত অধ্যবসায়ের সহিত নিখুঁত করিয়া বাটালি দিয়া কাটিয়াছেন। গ্রীক মূর্তির মত তাহার সুগঠিত নাসা, উড়ন্ত পাখীর ডানার মত ভ্রূ-যুগল যেন এখনই নড়িয়া উঠিবে, স্থির সমুদ্রের মত নীল চোখে উজ্জ্বল কালো তারা কুঞ্চিত ঘন কালো চুল অর্দ্ধচন্দ্রের মত দীপ্যমান প্রশস্ত ললাট ছাড়াইয়া সুগোল মাথার চারি পাশে সমান ওজনে হেলিয়া পড়িয়াছে। পদ্মকোরকের মত হাত দুখানি দেখিলে মনে হয় না পৃথিবীর কোনও কাজে কোন দিন লাগিয়াছে, পূজার মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিতেই শুধু এমন হাতের প্রয়োজন। তপনের মুখে বেশী কথা নাই, দৃষ্টিতেও চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সে যেন কোন ধ্যানে সমাহিত।

মহেন্দ্র সাহেবদের মত ধপধপে শাদা, চেহারায় খুব কিছু বিশেষত্ব নাই। চুলগুলি একেবারে সোজা, বিনা সিঁথিতে পালিশ করিয়া একেবারে পিছন দিকে ঠেলা, কপালটা একবিন্দুও কোথাও ঢাকা নাই। নাকটা একটু বেশী উঁচু এবং খড়্গের মত বাঁকা, হাত পা শক্ত শুষ্ক কাঠের মত ও গ্রন্থিবহুল; কথাও বলে জটিল বিষয়ে গুরুগম্ভীরভাবে। যেন সমস্ত পৃথিবীর গুরু-পদ এই বয়সেই তাহাকে কে লিখিয়া দিয়াছে। সকলের শিক্ষা সে না সমাপ্ত করিলে মানব-সমাজের আসন্ন প্রলয় হইতে আর মুক্তির উপায় নাই। মহেন্দ্রেরও গলায় একটা খুব দামী ক্যামেরা দুলিতেছে, কিন্তু সে-বিষয়ে সে খুব সজাগ নয়।

সুধার সহিত ছেলেদের সকলের পরিচয় ছিল না। সুধীন্দ্র-বাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই সকলের পরিচয় দিলেন। একে ত আলাপ করা বিষয়েই সুধা অত্যন্ত অপটু, তাহার উপর একসঙ্গে চারি জন জুটিলে ত কথা খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত। তবু সুরেশ ও মহেন্দ্রের সহিত কথা বলা তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হইল। নিখিল ও তপনকে দেখিয়া কেন যে তাহার মুখে কথা আটকাইয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না, অথচ নিখিল ত কথা বলিতে খুবই ব্যগ্র।

সকলের আগে নিখিলই গাড়ীর ভিতর উঁকিঝুঁকি মারিয়া একটা টিফিন-কেরিয়ার ও জলের কুঁজা দেখিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বাহির করিয়া লইল। এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া আর তেমন কিছু দেখিতে না পাইয়া মেয়েদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "করেছেন কি? রোদ ত এখনও বেশ আছে, অথচ আপনারা কেউ একটা ছাতা আনেন নি, বাড়ী গিয়ে মাথা ধ'রে সারারাত ঘুমোতে পারবেন না যে।"

মিলি কাপড়ের আঁচলটা ঠিক সমান করিয়া লইয়া ছোট আয়নায় মুখখানা তাড়াতাড়ি একটু দেখিয়া লইল। তাহার পর যেন এইমাত্র কথাটা শুনিয়াছে এমন ভাবে বলিল, "আমি একটা ছাতা এনেছি, আর সবাই ত এঁরা সাক্ষাৎ এক-একটি 'এঞ্জেল', পা পিছলে দৈবাৎ স্বর্গের সিঁড়ি থেকে মাটিতে পড়েছেন, পৃথিবীর দুঃখকষ্টের কথা ওঁদের মনেই থাকে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে চললেই ওঁদের পেটও ভ'রে যায়, রোদ ঝড় বৃষ্টিও উড়ে যায়।"

মহেন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলিল, "আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে মেয়েরা পরস্পরের দোষ সম্বন্ধে পুরুষের চেয়ে বেশী সচেতন? এটা তাদের সব চেয়ে প্রিয় টপিক?"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "তুমি ত আচ্ছা ক্ষ্যাপা দেখছি। আগে মেয়েদের বসবার দাঁড়াবার একটু ব্যবস্থা কর, তার পরে না-হয় নারদ-মুনির কাজটা সুরু করা যাবে। আপনারা মহেন্দ্রের কথা শুনবেন না; ও স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বড় অথরিটি যে নয়, তা ত আপনাদের খুশী করবার অপূর্ব চেষ্টা দে'খেই বুঝতে পারছেন।"

সুরেশ ইহাদের কথা ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিল, "চলুন, ঐ পঞ্চবটীর দিকে গঙ্গার ধারটায় বসা যাবে, ভারি সুন্দর জায়গা।"

সকলে সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। শীতের দিনে অধিকাংশ গাছের পাতাই ঝরিয়া পড়িতেছে। কোন কোন গাছের ডালপালা অনাবৃত শিরা-উপশিরার জালের মত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যেন তাহারা আকাশের দিকে সহস্র অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া নূতন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। গঙ্গার ঠিক ধারে একটা বটগাছের বড় শিকড় গুঁড়ির মত মোটা হইয়া প্রায় হেলিয়া শুইয়া আছে। সুরেশ বলিল, "এখানে পা ঝুলিয়ে বেশ বসা যায়। আপনারা যদি চান ত একটা শতরঞ্জিও পাতা যেতে পারে।"

গাড়ীতে গদির তলায় শতরঞ্জি ছিল, সতু এতক্ষণে তবু একটা কাজের মত কাজ পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে আনিতে দৌড়িল। ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাঙা গলায় গান ধরিয়াছিল,—"এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে।"

শতরঞ্জি আসিয়া পৌছিলে মহেন্দ্র পালা করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কে কোথায় বসবে বল, তার পর একটা ছবি তোলার ব্যবস্থা হবে।"

সুধীন্দ্রবাবু বলিলেন, "দেখ, আমার যদিও মনে হয়, 'পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো, সবার আমি একবয়সী যেন', তবুও সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বুড়ো এ-কথা লুকানো যায় না। সুতরাং আমি তোমাদের ছবির বাইরে থাকলেই ভাল। ঐ উঁচু বেদীটাতে আমার স্থান ক'রে নিচ্ছি আমি। ওখান থেকে গঙ্গার ওপার পর্যন্ত সারাক্ষণ দেখা যায়।"

নিখিল বলিল, "আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে আপনি বুড়ো হ'তে পারেন না। আপনার যে রকম শরীর তাতে আমাদের চেয়ে এখনও আপনার আয়ু কম হবে না।"

সতু বলিল, "আমি বিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে না ব'সে ঐ উঁচু ডালটাকে দোলনা ক'রে বসি।"

হৈমন্তী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "হনুমানেরা যত উঁচু ডালে বসে, মানুষের পক্ষে ততই নিরাপদ। তুমি সামনে থাকলে ত আমাদের আর সব ভাবনাই ভুলিয়ে দেবে।"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "কিন্তু মনে রাখবেন, এখানে আমরা শুধু ভাবনা ভাবতে আসি নি, অন্য কিছু কিছু সাধু উদ্দেশ্যও আছে।"

সুরেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিখিলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "কি কি উদ্দেশ্য আছে নির্ভয়ে ব'লে ফেল না। আশ্রমপীড়া না ঘটে এইটুকু মনে রাখলেই হ'ল।"

তপন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "একটা ত খুব নির্দোষ উদ্দেশ্য ছিল ছবিতোলা। তার জন্যে মস্তিষ্ক কি মাংসপেশী কোনটারই খাটুনি বেশী হ'ত না।"

সুধা যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই বলিল, "মন্দির-টন্দির কিছুই দেখলাম না, আগেই ছবি তুলে কি হবে?"

মিলি আতঙ্কিত হইয়া বলিল, "কি যে তোমাদের সব ব্যবস্থা? ঘুরে ঘুরে ধুলোয় আর হাওয়ায় চুলগুলো জটাইবুড়ীর মত হ'লে তার পর যা ছবি উঠবে, বাঁধিয়ে রাখবার মত।"

হৈমন্তী বলিল, "আচ্ছা ভাই সুরেশদা, দিদিকে রাগিয়ে কাজ নেই। ওর চেহারাটা অপ্সরার মত থাকতে থাকতে ছবি তুলে ফেলাই ভাল।"

মিলি বলিল, "বাবা, তুমি ত ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানতে না, তোমার মুখে এত কথা ফুটল কবে থেকে?"

প্রথম ছবিখানা তুলিল মহেন্দ্র, দ্বিতীয় নিখিল।

নিখিল বলিল, "আমাদের দেশের সনাতন প্রথামত মেয়েরা একদিকে ছেলেরা একদিকে দাঁড়াতে পাবে না। এক-এক জন মেয়ের পাশে এক-এক জন ছেলে। কে কার পাশে দাঁড়াবে বল।"

সতু গাছের উপর হইতে বলিল, "মিলিদিদি, তুমি ভাই তপনদার পাশে দাঁড়িও না, দোহাই, তাহলে Beauty and the Beast-এর উল্টো ছবি হয়ে যাবে।"

মহেন্দ্র বলিল, "এই বোকা ছেলেটাকে আজ না আনলেই ত হ'ত। কথা বলতেও শেখে নি।"

সুধা স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, বেড়ানো-চেড়ানোর সময়েও প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবসৃষ্ট শিল্পের সৌন্দর্য অনুভূতির দিকে তাহার যতটা মন, সঙ্গীদলের হাল্কা কথা ও হাসির সুরের প্রতি তাহার তত মন নয়। কিন্তু আজ সে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে আজিকার এই তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথায় তাহার মন ত বেশ আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। যে যত হাল্কা হাসির

দিকে কথার মোড় ফিরাইতেছে, তাহাকেই তত যেন বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাণী রাসমণির প্রকাণ্ড কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবের মন্দির, পরমহংসদেবের ঘরদ্বার ঘুরিয়া সকলে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। একদল মানুষকে ঘাটে নামিতে দেখিয়া কয়েকটা পানসী নৌকার মাঝি হাত তুলিয়া ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিল। তখন ভাঁটা সুরু হইবার উপক্রম করিয়াছে। গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি কচি ছেলের মত ক্রমাগত টলিয়া টলিয়া চলিতেছিল। একবার তীরের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, আবার সরিয়া যায়। ছেলেরা বলিল, "নৌকো চড়তে হ'লে নেমে আসতে হবে, কিছু কাদাও ভাঙতে হবে।"

সুধা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাহার ভয় কম, কোমরে আঁচল গুঁজিয়া একেবারে ঘাটের শেষ ধাপে নামিয়া গেল। একটা স্টীমার দুই ধারের জলে ঢেউ তুলিয়া মাঝখানে যেন প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দুই পাশের ভাঙা ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া দুই তটে গিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সুধার পায়ের উপরেই ঢেউগুলি আছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া হৈমন্তী বলিল, "গঙ্গাদেবী কাকে প্রণাম জানাচ্ছেন কে জানে, তুমি ভাই ও প্রণাম চুরি ক'রো না।"

সুধা বলিল, "এ প্রণাম নয়, এ জাহ্নবীর ডাক, উত্তর-রামচরিতে পড় নি? দেখ, দেখ, ঢেউয়ের চূড়াগুলি কেমন আঙুলের ডগার মত নুয়ে নুয়ে পড়ছে। দেবী জাহ্নবী সহস্র অঙ্গুলি তুলে তাঁর কন্যাকে ডাক দিচ্ছেন। ইচ্ছা করে ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

এতগুলা কথা বলিয়াই সুধা কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল তাহার কথা হৈমন্তী ছাড়া বেশী কেউ লক্ষ্য করে নাই। নিখিল ও সুরেশ তখন নৌকার দর করিতে ব্যস্ত। অনেক দর-কষাকষির পর আট আনায় নৌকা ঠিক হইল। নিখিল ও মহেন্দ্রই একটু শক্ত গোছের মানুষ, তাহারা দুই ধারে দাঁড়াইয়া মেয়েদের হাতে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া দিতে লাগিল। নৌকা এত টলে যে তাহার উপর স্থির হইয়া দাঁড়ানোই যায় না। মিলি ও হৈমন্তী নিখিলের হাত ধরিয়া ও মহেন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। ইতস্ততঃ করিতে লাগিল

সুধা। ছেলেদের সঙ্গে চলা-ফিরায় সে অভ্যস্ত ছিল না। ইহার ভিতর নিন্দা-প্রশংসার কোন কথা থাকিতে পারে কি না এ চিন্তা স্পষ্ট করিয়া তাহার মনে উঠে নাই। একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আপনা হইতেই তাহাকে বাধা দিতেছিল। তদুপরি পিসিমার অতিরিক্ত সাবধানতার বাণী হয়ত তাহার মনে অলক্ষ্যে কিছু কাজ করিয়াছিল।

মহেন্দ্র হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া শক্ত করিয়া সুধার হাত ধরিয়া বলিল, "দেখুন, ভীরুতা স্ত্রীলোকের ধর্ম হ'লেও সব সময় এ ধর্মে নিষ্ঠা রাখা বুদ্ধির পরিচয় নয়। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?

মহেন্দ্রের হাতের তলায় সুধার হাত কাঁপিয়া উঠিল; জলে পড়ার ভয়ে নয়, সম্পূর্ণ অজানা অচেনা কি একটা ভয়ে বুকটা দুলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে একেবারে নূতন। সুধা উত্তর দিতে পারিল না। নিখিলও অগ্রসর হইয়া আসিল। "কিসের আপনার এত ভয়? আচ্ছা, আমরা দু-জনেই আপনাকে তুলে দিচ্ছি। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওহে সুরেশ, তোমরা কিন্তু এ সময়ে স্ন্যাপ নিতে চেষ্টা ক'রো না।"

নিখিল ও মহেন্দ্র যখন সুধাকে মাটি হইতে প্রায় শূন্যে তুলিয়া ফেলিয়াছে, তখন সুধা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি নিজেই পারব। আমাকে তুলে দিতে হবে না।"

নিখিল নৌকার কাছে প্রায় কাদার মধ্যে কাঁধটা নীচু করিয়া অর্ধেক হাঁটু গাড়িয়া বসিতেই সুধা তাহার পিঠে ভর করিয়া উঠিয়া পড়িল। সর্বশেষে মহেন্দ্র ও নিখিল নৌকার তক্তার উপর সুধার দুই পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তপন বসিয়াছিল হৈমন্তীর পাশে, আর সুরেশ মিলির ও সতুর মাঝখানে। সুধার ইচ্ছা করিল, উঠিয়া গিয়া হৈমন্তীর পাশে বসে, নিখিল ও মহেন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিতে ত সে আসে নাই, গল্প করিবার ক্ষমতাও তাহার বেশী নাই। কিন্তু উঠিয়া গেলে শহরের ছেলেরা যে ইহাকে অপমান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে এ ভয়টাও তাহার ছিল। তাহার মনে আছে গত বৎসর আলিপুরের বাগানে বেড়াইতে গিয়া সে মহেন্দ্রের কেনা লেমনেড খাইতে আপত্তি করিয়াছিল ভদ্রতা ভাবিয়া, কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্র এমনই অপমানিত বোধ করিল যে রাগিয়া গেলাসসুদ্ধ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। মহেন্দ্র বলিয়াছিল, "আমি কি এমনই অস্পৃশ্য যে আমার হাতে জলও খাওয়া যায় না।"

সেই হইতে শহরের মানুষকে, বিশেষতঃ ছেলেদের সুধা ভয় করিয়া চলে।

বেড়ানো আজ যথেষ্টই হইল, কিন্তু অনেক দিন পরে যে আশা লইয়া সে আসিয়াছিল তাহা ত পূর্ণ হইল না। নিরিবিলিতে হৈমন্তীর সহিত দুই দণ্ড গঙ্গার ধারে বসিয়া যে অপার্থিব আনন্দ অনুভব করিবে মনে করিয়াছিল, তাহার আশা এই হাস্যকোলাহলের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য! সুধা আজ ঘরে ফিরিয়া নৈরাশ্যের কোনও বেদনা মনে অনুভব করিতেছে না।

পৃথিবীতে কেবল যে সুধার একলারই পরিবর্তন হইতেছে তাহা নয়, আশেপাশে আরও পাঁচজনেরও হইতেছে, ইহা সুধা পূজার ছুটির পর স্কুলে আসিয়া ভাল করিয়া অনুভব করিল। স্নেহলতা, মনীষা, ইহারা যেন এই দেড় মাসেই সুধার চেয়েও অনেক বেশী বড় হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কথাবার্তা চলনধরণ সব যেন এক ভিন্ন লোকের। স্কুলে তাহারা পড়ে বটে, কিন্তু তাহাদের আলাপ আলোচনা, ভাবনা চিন্তা স্কুলের বাহিরের বিষয় লইয়াই।

মনীষা একটু সেকেলে হিন্দু ঘরের মেয়ে, স্নেহলতা ক্রীশ্চান। মানুষের বিবাহের আদর্শ কি হওয়া উচিত এই লইয়া সেদিন টিফিনের ঘণ্টায় দুই জনে তর্ক লাগিয়া গিয়াছিল। মনীষা বলিল, "বাপ মা যাকে ভাল বুঝে হাতে ধ'রে সঁ'পে দেবেন তাকেই স্বামী ব'লে গ্রহণ করা স্ত্রীলোকের কর্তব্য। বাপ-মায়ের চেয়ে আমাদের মঙ্গল কে বুঝবে আর তাঁদের চেয়ে বুদ্ধি-বিবেচনাই বা কার বেশী?"

স্নেহলতা মনীষার কথায় তাচ্ছিল্য ভরে হাসিয়া বলিল, "বুদ্ধি-বিবেচনা মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা কে বলছে? তুমি আদত কথাটাই বুঝলে না। মানুষের জীবনে ভালবাসার চেয়ে বড় জিনিস নেই এটা বোঝ ত? তার একটা নিজস্ব সম্মান আর দাবী আছে। মঙ্গল-অমঙ্গল, বাপ-মা, কিছুর কাছেই তাকে বলি দেওয়া যায় না। যে মানুষ একজনকে ভালবেসে আর একজনকে বিয়ে করে, সে নিজেরও অপমান করে, ভালবাসারও অপমান করে।"

মনীষা বলিল, "যাও, কি যে ভালবাসা ভালবাসা করছ, তোমার লজ্জা করে না? বিয়ে হবার আগেই পুরুষমানুষকে মেয়েমানুষে ভালবাসলে কখনও তার মান থাকে? ভদ্র মেয়েরা ওরকম করে না কখনও।"

স্নেহলতা চটিয়া বলিল, "পৃথিবীতে তুমি ছাড়া সবাই তাহলে অভদ্র। যার গায়ে ঠে'লে ফে'লে দেবে তাকে ভালবাসাই বুঝি খুব ভদ্রতা? আত্মসম্মান বোধ ব'লে যার একটা জিনিস নেই, সে-ই ওকথা বলতে পারে।"

মনীষা বলিল, "আচ্ছা, সুধাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, সে কখ্খন তোমার

কথায় সায় দেবে না। আমার চেয়ে তার কথা ত তুমি বেশী বিশ্বাস কর? আমি না-হয় পণ্ডিত নই, সে ত বটে!"

স্কুল-বাড়ীর ছাদের উপর হৈমন্তী তখন সুধাকে টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম' পড়িয়া শুনাইতেছিল। সুধা ও হৈমন্তী যে যখন-তখন ছাদে চলিয়া যায় মনীষারা তাহা জানিত। হৈমন্তীর গলার স্বরটা ছিল ভারি মিষ্ট, ইংরেজী কবিতা তাহার গলায় রূপার ঘণ্টা-ধ্বনির মত শুনাইত। হৈমন্তী সুধার মুখের দিকে চাহিয়া এমন করিয়া কবিতা পড়িয়া শুনাইতেছিল, যেন হৈমন্তীই কবি, সে-ই বন্ধুর বিরহে আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মনীষা ও স্নেহলতাকে দেখিয়া হৈমন্তী থামিয়া গেল। স্নেহলতা মনীষাকে ঠেলা দিয়া বলিল, "তুমি ভালবাসার নিন্দে করছিলে, এই দেখ, ভালবাসা কাকে বলে। সবচেয়ে যদি ওই জিনিস পৃথিবীতে বড় না হবে, তবে ওরা পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে বেড়ায় কেন?"

সুধা ও হৈমন্তীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মনীষা অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করিয়া বলিল, "যা নয় তাই একটা ব'লে বসলেই হ'ল। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তুমি ত আর সখ্যের কথা বলছিলে না, তুমি প্রেমের কথা বলছিলে।"

স্নেহলতা বলিল, "তোমার মত অত সংস্কৃত কথা আমি জানি না বাপু। সুধা, বল দিখি, ঘটকালির বিয়ে ভাল না লভ-ম্যারেজ ভাল? মনীষা বলছে, ভদ্র মেয়েরা নাকি কাউকে ভালবাসে না।"

মনীষা তেলে-বেগুনে জলিয়া বলিল, "দেখেছ একবার রকম? আমি তাই বলেছি বইকি!" মনীষার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিল।

স্নেহলতা নরম হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তা না হোক, তুমি বলেছ ত যে বিয়ে হবার আগে কোন ভদ্র মেয়ে পুরুষমানুষকে ভালবাসে না? তাহলে পৃথিবীতে ক'টা যে ভদ্র মেয়ে আছে খুঁজে বার করা শক্ত।"

মনীষা বলিল, "তুমি বলতে চাও যে সব মেয়েই ঐ রকম করে?"

স্নেহলতা খুব বিজ্ঞের মত বলিল, "হয় করে, নয় মিথ্যে কথা বলে।"

হৈমন্তী বলিল, "এ তোমার অন্যায় কথা ভাই। মানুষ সব রকমই আছে। সবাই তোমার শাস্ত্রও মেনে চলে না, মনীষার শাস্ত্রও মেনে চলে না।"

স্নেহলতা বলিল, "বাইরে না মানতে পারে, কিন্তু ষোল-সতের বছর বয়স

হয়েছে, অথচ মনে মনেও কিছু হয় নি, এমন যারা বলে তারা মিথ্যে কথা বলে। মানুষ ওরকম ভাবে তৈরিই নয়।

সুধা বলিল, "তোমার ভালবাসা মানে কি? কাউকে কারুর একটু ভাল লাগলেই ভালবাসা হয়ে গেল? অমন ত কত মানুষকেই লোকের ভাল লাগে। পৃথিবীতে জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্তই ধরতে গেলে ত আমরা মানুষকে ভালবাসি। তার জন্যে বয়স হবার দরকার করে না।"

স্নেহলতা বলিল, "তা কেন? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা। যার জন্যে বাপ-মাকেও ছেড়ে দেওয়া যায়, সেই রকম ভালবাসা। তুমি যেন আর কিছু বোঝ না?"

সুধা বিস্মিত হইয়া বলিল, "যে তোমার সত্যি কেউ হয় না, তার জন্যে বাপ-মাকে ছেড়ে চ'লে যাবে? এও কি কখনও হয়? যে অমন কাজ করতে বলে সে কখনও সত্যি ভালবাসে না।"

মনীষা এইবার গাল ফুলাইয়া বলিল, "দেখলে ত? এই কথা আমি বলেছিলাম ব'লে আমায় যা খুশী বললে নির্বিবাদে।"

স্নেহলতা বলিল, "সুধা, তুমিও ভাই মনীষার মত খুকী সেজো না। সত্যি কথা বলতে তোমার ভয় কি? তোমায় ত কেউ গলা টিপে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে না?"

হৈমন্তী বলিল, "স্নেহ, মনীষার পেছনে অমন ক'রে লেগেছ কেন ভাই? ওর যা বিশ্বাস তা ও বলবে না? সব মানুষই নিজের মতকে সত্য ব'লে মনে করে।"

সুধা বলিল, "আমি খুকী সাজছি না ভাই। তোমার কথা ভাল ক'রে না বুঝে আমি জবাব দিতে পারব না। আমাকে ভেবে দেখতে হবে।"

স্নেহলতার আজ রোখ চাপিয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "ভেবে আবার দেখবে কি? এত রোমিও জুলিয়েট, আইভ্যান হো, শকুন্তলা, উত্তরচরিত পড়লে, আবার ভেবে না দেখলে বুঝতে পারবে না? তোমরা প্রমাণ করতে চাও যে আমি সকলের চেয়ে পাকা, আর তোমরা এখনও কেউ কিছু বোঝ না। সব 'ব্রেড এণ্ড বটর মিস'।"

এ-কথার কি জবাব দিবে সুধা ভাবিয়া পাইল না। সে কিছুই বোঝে না বলিলে সত্য বলা হয় না এবং স্নেহলতাও বিশ্বাস করিবে না, অথচ তাহার

কথা সব ঠিক বুঝিয়াছে বলিলেও মিথ্যা বলা হয় এবং মনীষার প্রতি অন্যায় করা হয়। বাস্তবিকই তাহাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। গল্পের বইয়ে অনেক প্রেমের কথা সে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবের সহিত মিলাইতে কখনও সে চেষ্টা করে নাই। গল্পেতে সব জিনিস বাড়াবাড়ি করিয়া লেখার একটা নিয়ম আছে, ইহাই সে ছেলেবেলা হইতে মানিয়া লইয়াছিল। স্নেহলতা শুনিলে চটিয়া যাইবে যে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের অনেক প্রেমিক-প্রেমিকার বক্তৃতাই সুধার এক এক সময়ে পাগলের প্রলাপের মত লাগিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে অবশ্য সে বিশেষ চেষ্টাও করে নাই। গল্পাংশটার দিকেই এ-সব সময় তাহার ঝোঁক থাকে বেশী, অন্য জিনিসগুলিকে অবান্তর ভাবেই সে গ্রহণ করিয়া গিয়াছে।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। টিফিনের ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছে। সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি বাহিয়া ছুটিতে লাগিল। ইতিহাসের পড়া আছে। মাস্টার মহাশয় ঘণ্টার আগেই ক্লাসে আসিয়া থাকেন, কে কতখানি দেরী করিয়াছে সব লক্ষ্য করিবেন। বিবাহ বিষয়ে দারুণ তর্কযুদ্ধ আপাতত ধামা চাপা দিয়া সকলকে বই লইয়া ইংরেজ-রাজত্বে ভারতের মহোন্নতির কথা চিন্তা করিতে হইবে।

মনীষা ও স্নেহলতার তর্কটা কিন্তু সুধার মনে গভীর চিহ্ন রাখিয়া গেল। সে বহুদিন একথা ভুলিতে পারে নাই। শুধু যে ভোলে নাই তাহা নহে, সুধার চক্ষে ইহা যেন একটা নূতন অঞ্জন পরাইয়া দিল। সংসারে স্বামী-স্ত্রী রূপে যাহারা পরিচিত তাহারা যে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন গৃহ হইতে আসিয়া একত্রে নীড় বাঁধিয়াছে এ-কথা কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই সে জানে, কিন্তু তবু তাহার মনে একটা জন্মগত সংস্কার ও শিশুজনোচিত ধারণা ছিল যে মাতা পুত্র, ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ যেমন মানুষ ভাঙিতে গড়িতে পারে না, এই সম্বন্ধও সেই রকমই। বর-কন্যা পরস্পরকে বাছিয়া বিবাহ করিলে বেশী সম্মানার্হ হয়, কি তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে বিবাহ হইলে বেশী সম্মানার্হ হয় এ-কথা ভাবিয়া দেখিবার কারণ তাহার জীবনে ঘটে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজনের বিবাহ তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি হইবার আগেই হইয়াছে এবং প্রাচীন মতেই হইয়াছে। আধুনিক আর একটা বিবাহ-পদ্ধতি যে আছে যদিও জানে, তবু প্রাচীন পদ্ধতির যে একটা দারুণ বিরোধ থাকা খুব স্বাভাবিক সে-কথা কখনও সে ভাল

করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। দুই পক্ষীয় লোকেরাই যে আপন আপন মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারে তাহাও সুধার মনে আসে নাই। প্রাচীন পন্থাতে সে অভ্যস্ত ছিল, কাজেই মনে মনে খানিকটা প্রাচীনপন্থীই হয়ত সে ছিল। আজ অকস্মাৎ স্নেহলতার কথায় তাহার মনে হইল, স্বামী বলিয়াই স্ত্রীলোক যেমন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসে, তেমন ভালবাসে বলিয়াই ব্যক্তিবিশেষকে বিবাহ করিতে সে চাহিতে পারে। দুর্গেশনন্দিনী, কপাল-কুণ্ডলা, কি রোমিও জুলিয়েট, ইত্যাদিতে যাহা সুধা পড়িয়াছে জগতে তেমন জিনিস হয়ত সত্যসত্যই ঘটে। কিন্তু তবু অজানা অচেনা একজন মানুষকে এতখানি ভাল কি করিয়া বাসা যায় যাহাতে চিরজন্মের বন্ধু বাবা মা সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া সব ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যায়, বুঝিতে সুধার কষ্ট হইতেছিল। উপন্যাসে রোমান্সে যাহাই থাকুক, কিছু তাহার মধ্যে অতিরঞ্জিত নিশ্চয়। হৈমন্তী অবশ্য বন্ধু মাত্র, কিন্তু তাহাকে সুধা যেমন ভালবাসে তেমন ভালবাসা পৃথিবীতে নিশ্চয় কম দেখা যায়। তবু কই, হৈমন্তীর জন্য বাবাকে কিংবা পীড়িতা মাকে ফেলিয়া চিরদিনের জন্য কোথাও সে চলিয়া যাইতেছে এ-কথা ত সে ভাবিতে পারে না। নিজের শ্রেষ্ঠতম সুখও সে হৈমন্তীর জন্য ছাড়িতে পারে, কিন্তু আজন্মের যাঁহারা প্রিয় ও আত্মীয় তাঁহাদের সে ছাড়িতে পারে না। তাহারা যে তাহার সকলের প্রথম।

আবার মনে হইল, তাহার বৃদ্ধ দাদামশায়ের কথা, কত আদরে মহামায়াকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন, বৎসরান্তে দেখিবার জন্য কাছে পাইবার জন্য কি আগ্রহে পথের ধারে ছুটিয়া আসিতেন! আজ দিদিমা নাই, তবু মা কতকাল দাদামশায়কে একদিনের জন্যও দেখিতে যান না। এ কি শুধু মা'র অক্ষমতার জন্য, না মা'র মন এখন আপন সংসারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া? অবশ্য, দাদামশায়ই মাকে এ সংসারে জুড়িয়া দিয়াছেন, মা আপনি বাছিয়া লন নাই। যদি বিবাহ না দিতেন, হয়ত মা চিরদিনই রতনজোড়ে দাদামশায়ের সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন। তবুও মা'র এই পরিবর্তনের কারণের ভিতর আর কিছু আছে কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার।

সুধা স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াই মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি তিন-চার বৎসর দাদামশায়কে দেখতে যাও নি, তোমার মন কেমন করে না?"

মহামায়া কেমন যেন ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে? এমন

কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস? কোন খারাপ খবর আসে নি ত! বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল।"

সুধা তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলিল, "না, না খারাপ খবর কিছু আসে নি। তোমার বাবাকে দেখতে তোমার ইচ্ছে করে কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।"

মহামায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "করে বইকি মা! বাপ-মায়ের মত জিনিস সংসারে কি আছে? কিন্তু মানুষের মন যা চায় পৃথিবীতে সব সময় কি তাই পাওয়া যায়?"

মহামায়ার কাছে যাহা শুনিবে আশা করিয়া সুধা কথা পাড়িয়াছিল তাহা তিনি বলিলেন না, তাঁহার চিন্তাধারা অন্য পথে চলিয়া গেল। মহামায়া বলিলেন, "বুড়ো বয়সে বাপ-মায়ের সেবা করতে পাওয়া বহু জন্মের তপস্যার ফল। আমি কি তেমন কিছু পুণ্য করেছি যে ও কাজ করতে পাব? সে পুণ্য করেছেন আমার দিদি। আমি এখন যেখানে যাব সেখানেই লোকের সেবা নেব। এ আমার গত জন্মের পাপের ফল, মা।"

মহামায়ার মনে এই দুঃখ-বেদনা জাগাইয়া তুলিতে সুধা চায় নাই, সুতরাং এ-কথায় আর সে কথা যোগাইল না। একবার ভাবিল মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করে, "মা, দাদামশায় যদি তোমার বিয়ে না দিতেন, তুমি কি নিজে থেকে বাবাকে বিয়ে করতে পারতে?" কিন্তু সুধার লজ্জা করিল, সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। সে জানিত, প্রায় শৈশবেই মহামায়ার বিবাহ হইয়াছিল এবং বাপ-মা ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ী গিয়া সাতদিন ধরিয়া তিনি এমন কান্নাকাটি করিয়াছিলেন যে পাড়ায় তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। পাড়ার গৃহিণীরা নাকি বলিয়াছিলেন, "যে-মেয়ে বাপ-মায়ের জন্য কাঁদতে পারে, সে-ই স্বামীপুত্তুরকে সত্যি ভালবাসতে পারবে।"

এ-সকল গল্প সুধার মুখস্থ ছিল, কিন্তু ইহার অর্থ তলাইয়া বুঝিতে আগে সে চেষ্টা করে নাই। বাপ-মাকে যে এমন করিয়া ভালবাসে, সে অন্য কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিতে পারে না, এই ছিল তাহার শৈশবের একটা মোটামুটি ধারণা। এখন সে ধারণা আপনা হইতেই তাহার বদলাইয়া গিয়াছে। স্বামীকে ভালবাসা সে চোখে দেখিয়াছে এবং হয়ত খানিকটা বুঝিয়াছেও, কিন্তু স্বামী নির্বাচন করা জিনিসটা কাব্য-উপন্যাসের বাহিরে কখনও সে ইতিপূর্বে ভাবিয়া দেখে নাই। স্নেহলতারা যে তর্ক তুলিয়াছে তাহা আবার

সাদাসিধা নির্বাচনের অপেক্ষাও জটিল। ধরা যাক্, সুধার বাবা মা একটি বর নির্বাচন করিয়া সুধাকে বিবাহ করিতে বলিলেন এবং সুধা তাঁহাদের অপ্রিয় আর একজনকে বিবাহ করিতে চাহিল। তাহা হইলে জিনিসটা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? সুধা মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, বাবা-মার যাহা পছন্দ নয় এমন কোন জিনিস সচরাচর তাহার পছন্দ হয় না, সে যেন আপনার পছন্দ ও রুচিকে তাঁহাদেরই ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাদের অপ্রিয় একটা মানুষকে অকস্মাৎ সে পছন্দ করিয়া বসিবে কি করিয়া? কি জানি, দিনে দিনে মানুষের কত পরিবর্তনই হয়, হয়ত একদিন এমনই অভাবনীয় একটা ব্যাপার তাহার জীবনেও ঘটিয়া বসিতে পারে। আজ পর্যন্ত তাহার ত বিশ্বাস যে সে তাহার পিতামাতারই মিলিত মনের একটি নূতন সংস্করণ মাত্র। তাহার নিকট ভাল ও মন্দ বলিতে যে দুইটি বিভাগ, তাহা পিতামাতার ভাল-মন্দ বিভাগের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। কিন্তু এমনও ত হইতে পারে এবং তাহা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে পৃথিবীর অনেক জিনিসই সে জানে না, সে বিষয়ে ভাল-মন্দ কি তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও তাহার হয় নাই। সেই সব ক্ষেত্রে গিয়া পড়িলে সে কি করিবে? পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে সে পারিবে কি? হইবার কোনও গোপন সম্ভাবনা তাহার চরিত্রের ভিতর লুকাইয়া আছে কি?

কিন্তু এ-সকল কথা খুব বেশী সুধা ভাবিতে পারিত না। তাহার জীবনে এই চিন্তার প্রয়োজন এমন জরুরি ছিল না যে ইহা লইয়া সারাক্ষণ সে মাথা ঘামায়। বন্ধুপ্রীতির বিমল আনন্দে তাহার মনটা ছিল ভরপুর, তাহার উপর কর্তব্যনিষ্ঠায় সে ছিল আপনার প্রতি অতি নিষ্ঠুর। এই দুইটি কোমল ও কঠিন বন্ধনে সে আপনাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে তাহার ভিতর ভবিষ্যতে ভাবনার বিশেষ স্থান ছিল না। বন্ধুরা তাহার দৃষ্টিটা এই দিকে খুলিয়া দিয়াছিল মাত্র।

হৈমন্তীদের বাড়ীতে বড় একটা গোলমাল লাগিয়া গিয়াছে। হৈমন্তীর জ্যাঠামহাশয় নরেশ্বর পালিত পাড়াগাঁয়েরই মানুষ, কিন্তু তাহার সখ ছিল বিলাত-ফেরত ভাইয়ের কাছে রাখিয়া মেয়েটিকে একটু আধুনিক ধরণে মানুষ করেন। তাই অল্প বয়স হইতেই মিলি আসিয়াছে কলিকাতায়; চলন ধরণ সাজসজ্জা কথাবার্তা কোনও কিছুতেই আজ আর তাহার খুঁত পাওয়া যায় না। ছেলেবেলা ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছে, বড় হইয়া বাংলা স্কুলেও হৈমন্তীর মত দুই-তিন বছর ছিল; সুতরাং দুই জাতীয় শিক্ষাই তাহার অল্পবিস্তর হইয়াছে। মেয়ের বয়স উনিশের কাছাকাছি হইল দেখিয়া বাপ জ্যাঠা সকলেই বিবাহের জন্য ব্যস্ত। বেশ ভাল একটি বিলাত-ফেরত ছেলের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। অর্থ সামর্থ্য বংশমর্যাদা ও রূপ, কোনও দিক্ দিয়াই সে ছেলে উপেক্ষার যোগ্য নয়। মিলিকে ঠিক সুন্দরী কিংবা ধনী-কন্যা বলা যায় না, সুতরাং তাহার পক্ষে এই রকম স্বামী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই দশজনে বলিবে। কিন্তু মিলি হঠাৎ বলিয়া বসিল যে সে বিবাহ করিবে না। বরপক্ষ কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষেরই চক্ষুস্থির!

মিলির মা শহুরে সভ্য-ভব্য কথার ধার ধারেন না। তিনি চটিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। "ঢেঁকি মেয়ে, বিয়ে করবি না ত কি চিরকাল আইবুড়ো হয়ে বসে থাকবি? তোর জন্যে জাতকুল সব খোয়াব নাকি আমরা? অমন ছেলে তপিস্যে করলে পাওয়া যায় না, রূপসী মেয়ে আমার থ্যাদা নাক উঁচিয়ে অমনি 'না' ব'লে বসলেন। ঘাড়ে ধ'রে তোকে আমি বিয়ে দেব।"

হৈমন্তীর মা নাই, কাজেই রণেন পালিত আসিলেন যুদ্ধ মিটাইতে। তিনি বলিলেন, "বৌঠাকরুণ, অমন রণরঙ্গিণীর মত খাঁড়া না তুলে একটু অন্য পন্থা ধর না? হিমুকে দিয়ে খোঁজ নাও, কেন মেয়ের আপত্তি। আজকালকার মেয়ে, কেন কি বলছে সব জেনেশুনে কাজ করা দরকার। হয়ত আর কাউকে মনে ধরেছে। স্বয়ম্বরের যুগ।"

বৌঠাকরুণ একেবারে করুণ স্বর ধরিলেন, "ওমা, আমার কপালে শেষে

এই ছিল! এমন মেয়ে আমি গর্ভে ধরলাম যে যা নয় তাই আমায় শুনতে হল এই বয়সে।"

পালিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, " 'যা নয়', নয় বৌঠাকরুণ, আজকাল এইগুলোই হয়। ওর জন্যে ভেব না, তোমার কিছু মানহানি হবে না। তুমি একবার হিমুকে মিলির পেছনে লাগিয়ে দাও।"

বৌঠাকুরাণী কি আর করেন, হৈমন্তীরই শরণ লইলেন। ভাবিলেন, যস্মিন্ দেশে যদাচার তা মানিয়াই চলিতে হইবে।

হৈমন্তী স্কুলে আসিয়াই টিফিনের ঘণ্টায় সর্বাগ্রে সুধাকে ডাকিয়া বলিল, "জান ভাই, মিলিদিদি এক কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে। বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, সব ভেঙে দিয়েছে কি জানি কি জন্যে। জ্যাঠাইমা এখন বলছেন, 'তুই খোঁজ নে ওর কাকে মনে ধরেছে।' কি ক'রে খোঁজ নি বল ত আমি?"

কথাটা শুনিয়াই সুধা চোখ বড় করিয়া বলিল, "আমি হয়ত জানি সে কে!"

হৈমন্তী সুধার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "তুমি? পৃথিবীতে এত লোক থাকতে শেসে তোমার মত 'ইনোসেণ্ট বেবী'র কাছে খবর নিতে হবে?"

হৈমন্তীর ঠাট্টার জবাব না দিয়া সুধা গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল, "তোমাদের পূবের বারান্দায় আমি একদিন দেখেছিলাম, মিলিদি সুরেশদার গলা জড়িয়ে-- বুঝেছ? আমাকে হঠাৎ দেখে সুরেশদা চমকে উঠেছিল, তার পরেই বলল, 'বন্ধুত্বের মর্যাদা তুমি নিশ্চয় রক্ষা করবে। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি।' আমি কিছু বলি নি, কিন্তু আমার ভারী রাগ হয়েছিল। লুকিয়ে কোন কাজ কি মানুষের করা উচিত?"

হৈমন্তী মুখ ম্লান করিয়া বলিল, "বেচারী মিলিদিদি, বেচারী সুরেশদা!"

সুধা বিচারকের মত কঠিন স্বরে বলিল, "বেচারী কেন বলছ ভাই, ওরা ত জেনেশুনেই যা করবার করেছে?"

হৈমন্তী সুধার দিকে করুণ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "বোকা মেয়ে! তুমি বুঝবে না। সুরেশদার যে এক পয়সার সম্বল নেই। মিলিদি এত আদরে মানুষ, শেষে এই দুঃখ বরণ করা তার কপালে ছিল! জ্যাঠামশায় নিশ্চয় কিছুই দেবেন না।"

সুধা বলিল, "মিলিদি ত নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। সে কেন এ পথে গেল?"

হৈমন্তী উদাস চোখে অন্য দিকে চাহিয়া যেন কতকটা আপন মনেই বলিল, "সুধা! আমি যদি এমন কাজ করি, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?" সুধা চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হৈমন্তী আবার বলিল, "মানুষের ভবিতব্য মানুষকে এই পথে টেনে নিয়ে যায়, তার দৃষ্টি যে তখন প্রবল ঝড়ে একেবারে অন্ধ হয়ে যায়, একথা তুমি কবে বুঝতে শিখবে? তুমি কি তপস্বিনী হবে ব'লে পৃথিবীতে এসেছ?"

সুধা তবু বলিল, "আচ্ছা, মিলিদি না-হয় যা করেছে করেছে, সুরেশদা ত পুরুষমানুষ, তাকে সংসারের ভার নিতে হবে। সে যদি সে কাজের যোগ্য না হয়ে থাকে তবে মিলিদিকে এই পথে টানার জন্যে নিজের কাছে নিজে সে কি অপরাধী নয়?"

হৈমন্তী বলিল, "পাগলী, মানুষ কি মানুষ বেছে নিয়ে প্ল্যান ক'রে তবে ভালবাসে? অদৃষ্ট যাকে যে দিকে নিয়ে যায় তাকে সেই দিকেই ছুটতে হয়।"

সুধা এবার হাসিয়া বলিল, "তুমি ত আমার চেয়েও বয়সে ছোট, তুমি অমন সবজান্তার মত কথা বলছ কেন? অদৃষ্টই হোক আর যাই হোক, নিজেকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রাখবার ক্ষমতা মানুষের নিশ্চয় আছে। সে ইচ্ছা করলেই তার বাইরের ব্যবহারকে সংযত করতে পারে। মানুষের মনুষ্যত্বই ওইখানে।"

হৈমন্তী বলিল, "তুমি ভুল বুঝেছ এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু হয়ত আর একদিন অন্য দিক্‌টাও কিছু বুঝবে তুমি। আমি যদি তার আগেই কিছু ক'রে বসি, তুমি যেন আমার ওপর রাগ ক'রে মুখ ফিরিয়ে ব'স না।"

কথাটা শুনিয়াই সুধার অভিমান হইল। মিলিদির কথা হইতেছে, তাহার কথা হইলেই চলিত, হৈমন্তী আবার ইহার ভিতর আপনার কথা ঢুকাইতে ব্যস্ত কেন? এখনই কি তাহার বন্ধুত্বের কাব্য শেষ করিয়া সংসারের হাঁড়িকুঁড়ির ভিতর ঢুকিবার বয়স হইয়াছে? এত শীঘ্র এই অপূর্ব সঙ্গীতের কথা ভুলিয়া হৈমন্তী অন্য কথা ভাবে কি করিয়া?

হৈমন্তী সুধার অভিমান বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "যাক্, এখন থেকেই আর গাল ফুলিয়ে থাকতে হবে না। মিলিদিকে কি ক'রে জিজ্ঞেস করব এস পরামর্শ করা যাক্। তুমি আমাদের

বাড়ী চা খেয়ে তার পর বাড়ী ফিরো। ততক্ষণে একটা কিছু উপায় ঠিক বার করা যাবে।"

এত শীঘ্রই মিলির মনের খবর জানিতে পারিবে হৈমন্তী ভাবে নাই। সে আজ মিলিকে কোন প্রশ্ন করিবেও মনে করে নাই। সুধাকে সঙ্গে করিয়া স্কুল হইতে ফিরিয়া চায়ের সন্ধানে ভাঁড়ার-ঘরে অকস্মাৎ মিলিকে আবিষ্কার করিয়া হৈমন্তী বিস্মিত ভাবে বলিল, "দিদি, আজ অসময়ে এমন জায়গায় কেন? ড্রেসিং-টেবিলের ধারেই ত তোমার এখন আসন পাতবার সময়।"

মিলি মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, "চুলোর ভিতর আসন নিলেই আমার সব চেয়ে ভাল হয়। ড্রেস করব আর আমি কি সুখে? মা ত আমায় গলায় দড়ি বেঁধে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।"

হৈমন্তী রাগ করিয়া বলিল, "ও সব কি ছাইভস্ম কথা বলছ ভাই! তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয়, তুমি ক'রো না। সত্যি কি কাউকে কেউ জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দিতে পারে?"

মিলি বলিল, "যতখানি যুদ্ধ করলে জোরজবরদস্তি ঠেকিয়ে রাখা যায়, ততটা ক্ষমতা যদি আমার না থাকে?"

হৈমন্তী বলিল, "তাহলে তোমার তাই নিয়ে কাঁদবার অধিকার নেই। যে অতটাই দুর্বল তার নিজের পথ নিজে বাছবার যোগ্যতা কেউ স্বীকার করবে না।"

মিলির চোখে জল ছল ছল করিতে লাগিল। সে মুখটা নীচু করিয়া বলিল, "বাইরে যতই মেমসাহেবী দেখাই, আমি ভিতরে এখনও সেই পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। আমার মত মেয়েমানুষের শক্তির উপর আমার নিজেরই বিশ্বাস নেই। যে আমাকে শক্তি যোগাতে পারত সে যদি আমার পাশে থাকত তাহলে আমায় যত বল যুদ্ধ করতে পারতাম। এখন যা হবে তা আমি জানি, মার জেদে হার মানব, তার পর চিরজন্ম কাঁদব।"

সুধার নাম প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে হৈমন্তী সব জানিয়াও প্রশ্ন করিল, "সে কে ভাই?"

মিলি হৈমন্তীর কাঁধের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "তোকেও কি ব'লে দিতে হবে? তুই ত তাকে চিনিস্, তাকে দাদা ব'লে ডাকিস্।"

হৈমন্তী মিলির চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "সুরেশদা?

আচ্ছা, জ্যেঠাইমাকে একবার ব'লে দেখব? তিনি ত আমায় খোঁজখবর নিতেই বলেছিলেন। মেয়ের কান্না দে'খে হয়ত রাজি হয়ে যেতেও পারেন।"

মিলি বলিল, "তুই এখনও ছেলেমানুষ, তাই ওকথা ভাবতে পারিস্। চোখের জলে নরম হবার বয়স মার এখন নেই। মা আমাকে সারাক্ষণ ভারতনারীর আদর্শ আর নিষ্কাম প্রেম বিষয়ে লেক্‌চার দিচ্ছেন। মা বলেন, এ বয়সের ভালবাসা ভালবাসাই নয়, ও শুধু চোখের নেশা, মনের মোহ। তোর মত একটা কচি মেয়ের কথায় মা ভুলবেন সে আশা আমার নেই, বরং উল্টো উৎপত্তিই হবে। জানাতে পারলে তাকে আর কেউ এ বাড়ী ঢুকতে দেবে না। এ জন্মের মত দেখাশুনো বন্ধ হয়ে যাবে।"

হৈমন্তী বলিল, "কিন্তু তুমি কথাটা চিরকাল লুকিয়েই বা রাখবে কি ক'রে? তুমি যদি তার সঙ্গে চিরদিনের সম্পর্ক পাতাতে চাও, যদি সে বিষয়ে তোমাদের বোঝাপড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যত শীঘ্র সেটা প্রকাশ ক'রে বলবে ততই ত ভাল। যদি সে আশা ছেড়ে দিতে, তাহলে না-হয় সব কথা চাপা দিয়েও দিতে পারতে।"

মিলি ভীতকণ্ঠে বলিল, "সে কথা সত্যি বটে, কিন্তু এখনই অদর্শন শুরু হয়ে যাবে মনে করলে ভবিষ্যতের কথা আর ভাবতে পারি না। শুধু বর্তমানের কয়েকটা মুহূর্তে যা কুড়িয়ে পাই, তার লোভ যে সামলাতে পারি না।"

হৈমন্তী বলিল, "এ বর্তমান তোমার বেশী দিন থাকবে না ভাই। এমন গোলমালের পর চারদিকে কড়া নজর আপনা থেকেই সকলের পড়বে। তুমি তাঁদের কাছে ধরা পড়ার অপমান কেন স্বীকার করবে? নিজে থেকে তোমার যা বলবার আছে ব'লে দাও।"

বাহিরে সুধার মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, "হৈমন্তী, আমি কি আজ বাড়ী যাব না? তুমি আমায় বসিয়ে রেখে ভাঁড়ার-ঘরে কি করছ? একলাই সব খাওয়া সেরে নিলে?"

মিলি চোখের জল মুছিয়া সংযত হইয়া বসিল। হৈমন্তী ডাকিল, "ঘরে এস ভাই। দিদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চায়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।"

সুধা ঘরে ঢুকিয়া মিলির অশ্রুস্নাত আত্মবিস্মৃত মুখচ্ছবি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আজ কতদিন ধরিয়া হৈমন্তীর বাড়ী সুধার আসা-যাওয়া, কিন্তু ইহার ভিতর একদিনও মিলিকে সে এমন যোগিনীমূর্তিতে দেখে নাই।

মিলির সিঁথির রেখা, আঁচলের ভাঁজ, মুখের পাউডার, খোঁপার বাঁধন, নখের পালিশ, কোনটাকে কোনও দিন সে স্বস্থানভ্রষ্ট হইতে দেখে নাই। আজ সেই মিলি ভাঁড়ার-ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিপর্যস্ত বেশভূষায় যেন বৈষ্ণব কবিতার রাধিকার মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে কিসের ধ্যান করিতেছে? সুধার মনে পড়িল, কি একটা প্রাচীন পুঁথিতে সে পড়িয়াছিল,

"বিরতি আঁধারে রাঙা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা
সদাই ধেয়ানে চাহি মুখপানে না চলে নয়নতারা।"

পড়িবার সময় কবিতাটা সুধা ঠিক বুঝে নাই; কিন্তু আজ মিলিকে দেখিয়া কাব্যের অর্থ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হৈমন্তী যে ঝড়ের কথা বলিয়াছিল, সেই ঝড় কি মিলির এমন দশা করিয়া দিয়া গিয়াছে? সখ্যের প্রীতির মত এ শুধু মধুর আনন্দের বন্যা নয়, এ যে কি সুধা আজও তাহা ঠিক জানে না। পৃথিবীর বুকের রহস্যের অন্তরালে যে ভয়ঙ্করী লুকাইয়া আছে, এ কি তাহারই প্রলয়লীলার চিহ্ন মিলির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে? মানুষ আনাচে-কানাচে কি যে একটা ভয়ঙ্কর রহস্যের ইসারা সদাসর্বদা করে, যাহার নাম কেহ করে না, অথচ কিশোর-বয়স্কদের যাহার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য পদে পদে সাবধান করিয়া দেয়, এই কি তাহার উন্মক্ত অন্তরের আভাস?

হৈমন্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি চায়ের জল আনতে বলছি, চা খেয়েই তুমি যাবে।"

সুধা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "না, না, আমি চা খাব না, আমি এখুনি চ'লে যাই।" এমন জায়গায় বসিয়া সে খাইতে পারিবে না।

মিলি অকস্মাৎ সুধার হাত ধরিয়া বলিল, "সুধা, তোমাকে ভাই আমার একটা কাজ ক'রে দিতে হবে। তোমার মত কচি মেয়েকে কেউ সন্দেহ করবে না, তুমিই একমাত্র নিরাপদ্, তা ছাড়া তুমি ত ভাই সব জান।"

কি একটা গোপন ষড়যন্ত্রের ভিতর সুধাকে টানা হইতেছে মনে করিয়া আশঙ্কায় সে কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিতেছিল। মিলি এমন কাতর হইয়া তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে যে তাহাকে 'না' বলা বড়ই কঠিন হইবে, কিন্তু সুধার বিবেক যেখানে সায় না দিবে এমন কোনও কাজ যদি মিলি তাহাকে করিতে বলে তবে কেমন করিয়া সুধা তাহা করিবে? সেই ভয়টাই তাহার আগে হইল।

মিলি বলিল, "আমি তোমাকে একটা চিঠি দেব সেটা তোমায় পোস্ট ক'রে দিতে হবে। তার জবাবও তোমার নামে আসবে; লক্ষীটি, আমায় সেটা পৌঁছে দিও।" সুধার হাতের ভিতর মিলি যেন চিঠি গুঁজিয়া দিতেছে এমনই আশঙ্কায় সুধা হাত দুইটা মুঠা করিয়া ফেলিল। এই গোপন দৌত্যের কাজ সে কি করিয়া করিবে? ইহা কি ভাল কাজ, উচিত কাজ? সুধার সন্দেহবিক্ষুব্ধ মনের ভাব মুখের রেখায় ফুটিয়া উঠিল, দেখিয়াই হৈমন্তী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল। হৈমন্তী বলিল, "তোমার ভয় নেই সুধা, কোন অন্যায় কাজ তোমায় করতে বলা হচ্ছে না।"

সুধা বলিল, "কি জানি ভাই, যা ভাল কাজ তা লুকিয়ে করতে হবে কেন? কিসের জন্য কাউকে ভয় ক'রে চলতে হবে সেখানে?"

মিলি বলিল, "সব ভাল কাজকে সবাই ভাল ব'লে বুঝতে পারে না। যারা বোঝে না তাদের কাছে লুকানো ছাড়া কি পথ আছে?"

সুধা বলিল, "কিন্তু তুমিই যে ঠিক বুঝেছ তা তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি যাঁদের লুকোচ্ছ তাঁরা ত সব জিনিসই তোমার চেয়ে বেশী বোঝেন।"

মিলি বিস্মিত হইয়া সুধার মুখের দিকে তাকাইল। সুধা এত বোকা? এইটুকু বোঝে না? মিলি বলিল, "আমার সমস্ত মন যাকে ঠিক বলছে, যা নইলে আমার বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য—তা ভুল কি ক'রে বলব? যাঁদের সামনে এ সমস্যা নেই তাঁরা এর মূল্য কি ক'রে বুঝবেন? অতীতেও এ সব তাঁদের কোনওদিন ভাবতে হয় নি।"

সুধা চুপ করিয়া রহিল। সে কি ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি সুরেশদাকে আমাদের বাড়ীতে কাল ডাকব, তুমি সেখানে গিয়ে তোমার যা বলবার ব'লো। আমাকে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি বলব যে সুরেশদাকে আমি ডেকেছিলাম। কিন্তু আমার নামে চিঠি ডাকে দিতে ব'লো না, আমি লুকোচুরি করতে পারব না।"

মিলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহা নিষ্ঠুরতা হইল কিনা ভাবিয়া সুধা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আবার তাহার নিজের প্রস্তাবটাও ঠিক হইয়াছে কিনা এও হইল মস্ত একটা ভাবনা। দুইমুখী দুই চিন্তায় তাহার মনটা তোলপাড় করিতে লাগিল।

সুধার নিমন্ত্রণে তাহাদেরই বাড়ীতে সুরেশ ও মিলির দেখা হইয়াছিল। সুরেশের অর্থ না থাকিলেও সাহস ছিল। সে বলিল, "কপালে যাই থাক্, আমার যা বক্তব্য আমাকে তা বলতেই হবে।"

তাহার বক্তব্যের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। আপাতত এ-বাড়ীতে আসা তাহার বন্ধ রাখিতে হইল। নরেশ্বর পালিত বলিলেন, "তুমি আমার জামাই হবার যোগ্য হয়ে তবে এ-বাড়ীতে আসবে। তার আগে আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ চলবে না। লুকিয়ে কচি মেয়ের মন পাওয়া যত সহজ, তাকে ভরণপোষণ করবার যোগ্যতা অর্জন যে তার চেয়ে শক্ত, এটা তোমার আগে জানা উচিত ছিল।"

সুরেশ পরের ছেলে, তাহাকে বিদায় করা সহজ হইলেও ঘরের মেয়েকে বশ করা শক্ত। দেখা গেল, সে তর্জন-গর্জন, অনুনয়-বিনয়, অর্ধাশন-অনশন, কিছুতেই ভুলিবার মেয়ে নয়। মেয়েকে শাসন করিতে গিয়া মায়েরও আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই। মিলিকে খাইতে বলিলে খায় না, বেড়াইতে বলিলে বেড়ায় না, লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও তুলিয়া দিয়াছে। পাছে কোনও শত্রুপক্ষ লুকাইয়া তাহাকে কনে দেখিয়া যায়, এই ভয়ে শত্রু মিত্র সকলকেই সে এড়াইয়া চলে।

রণেন পালিত বলিলেন, "দেখ, তোমরা উভয় পক্ষই যদি এমন যুদ্ধং দেহি ব'লে চলতে থাক তাহলে ও ছেলেমানুষের হাড় বেশী দিন টিঁকবে না। হয় ও একটা শক্ত অসুখ-বিসুখ ক'রে মারা যাবে, নয় একটা এমন কিছু কাণ্ড ক'রে বসবে যার থেকে আর উদ্ধারের উপায় থাকবে না।"

নরেশ্বর বলিলেন, "তুমি তবে কি করতে বল? ঐ ভবঘুরে ভিক্ষের ঝুলিটি দেখেই মেয়েটাকে সঁপে দেব?"

রণেন্দ্র মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "তাই কি আর ঠিক বলছি? ওদের সঙ্গে একটা রফা ক'রে দেখ না। আজ ভিক্ষের ঝুলি ছাড়া কিছু নেই, কাল লক্ষ্মীর আসন পাতা হতে ত আপত্তি নেই। একটু সময় নিয়ে দেখ। বল

যে এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি এত টাকা রোজগার করতে পার তাহলে তোমাদেরই কথা থাকবে।"

মিলির মায়ের মহা আপত্তি। "এমন ক'রে কতকাল আইবুড়ো মেয়ে ডাঙিয়ে রেখে দেবে? ওরকম সময়ের কোনও ত ধরাবাঁধা নেই। আমি বুঝি, বাঙালীর মেয়ে, বিয়ে হ'লেই স্বামীকে ভালবাসবে, তাই এখনও বলি, জোর ক'রে বিয়েটা সেরে ফেলা হোক।"

নরেশ্বর চটিয়া বলিলেন, "মুখে বলতে ত পয়সা খরচ হয় না! কাজ ক'রে দেখাতে পেরেছ? এই দুই-তিন মাস ধ'রে মেয়ের একটা কড়ে আঙুলও ত নাড়াতে পারছ না।"

রণেন বলিলেন, "আচ্ছা, এক কাজ কর। ওকে কিছুদিনের জন্যে বিদেশে পাঠিয়ে দাও। শরীরটা খারাপ আছে, বছর-খানিক রেঙ্গুনে পিসির কাছে থেকে আসুক। ফিরে এসে ওর কি মতামত থাকে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিত্রগৃহিণীকে এই ব্যবস্থাতে রাজি হইতে হইল। মিলি ও হৈমন্তীর এক পিসি কয়েক বছর হইল রেঙ্গুনে ঘরবাড়ী করিয়া আছেন। তিনি খুব ফ্যাশানেবল সমাজে ঘোরেন ফেরেন, শরীর সারাইবার নাম করিয়া সেখানে পিসির দরবারে যদি কাহারও হাতে কোনও উপায়ে মেয়েটিকে সঁপিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে। অত দূর দেশে সুরেশ বাগড়া দিতে যাইতে পারিবে না, মিলিও নূতন আবহাওয়ার ভিতর পড়িয়া তাহার পুরাতন সাজসজ্জা জাঁকজমকের নেশায় আবার মাতিয়া উঠিতে পারে। এখানে এক কবিতা-পড়া হৈমন্তী ছাড়া দ্বিতীয় সঙ্গী নাই, কে মিলিকে সংসারের শ্রেষ্ঠ রস চিনাইয়া দেয়? মা হইয়া মেয়েকে কি করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যে সংসারে টাকার চেয়ে বড় কিছু নাই? টাকা না হইলে সুখ সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য, মান মর্যাদা কিছুই রক্ষা করা যায় না, অথচ টাকা যে সবার বড় একথা মুখ ফুটিয়া বলিতে যাওয়াও লজ্জার কথা। তাহার চেয়ে যেখানে টাকার সুখ, টাকার আনন্দ মানুষ দুই বেলা হাজার কাজে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে, সেইখানে মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পরখ করিয়া দেখা যাক না, আপনা হইতে উহার মস্তিষ্কে কিছু ঢোকে কি না! এ বিষয়ে হৈমন্তীর মত বোকা ত সে ছিল না বরাবর। হৈমন্তীকে

পুতুলের মত সাজাইয়া রাখা হয়, তাই সে সাজে গোজে, কিন্তু মিলির এ সকল বিষয়ে আপনার অন্তরের প্রেরণা ছিল। হঠাৎ একটা ক্ষ্যাপা ভিখারী ছেলের পাল্লায় পড়িয়া তাহার যে এমন মাথা বিগড়াইয়া যাইবে তাহা কে জানিত? যৌবন-ধর্ম বাস্তবিকই বিচিত্র! মিলির মত মেয়ে এই অর্থ-সর্বস্ব দিনে গেল ক্ষেপিয়া, আর মিত্র-গৃহিণীর মত রামকৃষ্ণের ভক্তিমতী শিষ্যাকে কিনা শেষে কন্যাকে বুঝাইতে হইবে টাকার মর্যাদা!

মিলি যাত্রার আয়োজন করিল প্রায় সন্ন্যাসিনীর মত। যত ভাল কাপড়-চোপড় ছিল সব আলমারী বোঝাই করিয়া রাখিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা মোটা কাপড়ে বাক্স সাজানো হইল। সুধা দেখিয়া বলিল, "তুমি ভাই, এই ক'মাসে এমন বদ্‌লে গেলে কি ক'রে? তোমার রেঙ্গুনের পিসিমার বাড়ী পান থেকে চুন খসলে ত বল ঢি ঢি পড়ে যায়, সেখানে নাকি আয়ারা ছাড়া কেউ সুতোর কাপড় পরে না, তবে তুমি কোন্ সাহসে এমন ক'রে সেখানে যাচ্ছ?"

মিলি বলিল, "আমি ত তপস্যা করতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি? ত্যাগেই তপস্যার সিদ্ধি হয়, ভোগে কি সিদ্ধি মেলে কখনও?"

সুধা অবাক্ হইয়া মিলির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মিলিদি, তুমি এসব কথা কোথা থেকে শিখলে? এসব তুমি জানতে? বিশ্বাস হয় না ভাল ক'রে।"

মিলি বলিল, "সব মানুষেরই আত্মচৈতন্য জাগবার দিন আসে। এতদিন ঘুমিয়ে অন্ধ হয়ে ছিলাম ব'লে আমি কি চিরদিনই তাই থাকব? দুঃখ আমার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে।"

মিলিকে কিছু বলিল না, কিন্তু সুধার মনে পড়িল, প্রথম যখন সে রবিবাবুর 'মেঘ ও রৌদ্র' পড়ে তখন হৈমন্তী তাহাকে 'এস হে ফিরে এস, নাথ হে ফিরে এস' গানটি গাহিয়া শুনাইয়াছিল। সে বেশীদিনের কথা নয়, সুধা বলিয়াছিল, 'আমার নিতি সুখ, ফিরে এস হে, আমার চিরদুখ ফিরে এস' মানে কি? যে নিতি সুখ, সেই কি চিরদুখ হইতে পারে? হৈমন্তী বলিয়াছিল, "ঐখানেই ত গানের আসল সৌন্দর্য!" আজও সুধা ভাবিতেছিল, মিলির জীবনের এই সমস্যার দিনে কোন্‌টা বড়, তাহার দুঃখ না তাহার সুখ? সুখের সন্ধানে কি সে দুঃখের কণ্টকমুকুট মাথায় করিয়া চলিয়াছে, না দুঃখ-বেদনাই তাহার সুখের তুচ্ছতা বুঝাইয়া দিয়াছে? মানুষ পৃথিবীতে আনন্দের পিছনে ছুটিয়া

চলিয়াছে। দুঃখই বলুক আর ত্যাগই বলুক, এই বেদনা, এই নিপীড়নের ভিতর মিলিদিদি নিশ্চয়ই কিছু একটা অপূর্ব আনন্দ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা তাহাকে অনায়াসে সকল কিছুর উপরে উঠিতে সমর্থ করিতেছে। সুধা বুঝিয়াছে, ইহা মিলির প্রেমের গৌরব।

হৈমন্তী কালো বলিয়া স্কুলের মেয়েরা যখন তাহার সমালোচনা করিয়াছিল, তখন সুধা বিস্মিত হইয়াছিল তাহাদের অন্ধতা দেখিয়া যাহারা হৈমন্তীর আয়ত গভীর চোখের দৃষ্টি ও মৃণালগ্রীবার অপূর্ব ভঙ্গী দেখিতে পায় নাই। আজ সুধাই ভাবিতেছিল, মানুষের পরিচয়ের প্রথম সূত্র ত চোখের দৃষ্টি, সেই ত প্রথম ভাল-লাগার সিংহদরজা খুলিয়া দেয়। কিন্তু সুরেশদাকে দেখিয়া ভাল লাগিবার কিছু ত সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে শুধু কালো নয়, মোটা বেঁটে। চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখরতা তাহার একমাত্র সৌন্দর্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে চোখও ত সারাক্ষণ থাকে চশমায় ঢাকা। কথা বলিয়া মানুষের মনকে মুগ্ধ করার দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠতর একটি পথ আছে বটে, কিন্তু সুরেশদার কাজে আলস্য যতই কম হউক, কথা বলায় আলস্য অসাধারণ। মিলির মত যে মেয়ে পৃথিবীর বাহিরের খোলস দেখিয়াই বিশ্বসংসারের মূল্য নির্ধারণ করিত, সে কি করিয়া বাহিরের এত বড় বাধাকে অতিক্রম করিয়া একেবারে সুরেশের অন্তরের খবর লইতে অগ্রসর হইল?

নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সুধা নিজেকেই তিরস্কার করিল। যাহাদের অন্তরের পরিচয়কে বিধাতা বহু রূপহীন আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের চিনিয়া লইবার জন্য তিনিই যে মানুষের মনে পরশপাথরের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কি সুধার ভোলা উচিত? বিধাতা ত সুধাকে রূপের পসরা দিয়া পৃথিবীতে পাঠান নাই, বাগ্দেবীই বা তাহার উপর সদয় কোথায়? তবে সে কি মনে করে যে পৃথিবীতে তাহাকে কেহ কোনও দিন চিনিবে না? সুধা জানে, সুধা বিশ্বাস করে, এই রকম অসম্ভব জগতে প্রতিনিয়ত সম্ভব হইতেছে। এমনই করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করাতেই মানুষের ভালবাসার গৌরব, ইহা যতদিন যাইতেছে ততই সুধা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। পৃথিবীতে অমর হইয়া তাহারা থাকে না যাহারা ধন জন রূপ মান মর্যাদা দেখিয়া ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহারাই হয় অমর যাহারা ভালবাসার জন্য দারিদ্র্য অপমান, দুঃখ বেদনা, সকলই মাথা পাতিয়া লইয়াছে। একথা কাব্যে

সাহিত্যে প্রতিদিনই ত সে পড়িতেছে। তাহার অন্তরও ত ইহাতেই শ্রদ্ধার সহিত সায় দিতেছে।

মিলি কঠিন সঙ্কল্প লইয়া চলিয়া গেল, হৈমন্তী ও সুধার কৈশোর-নাট্যে যেন যবনিকা পড়িয়া নূতন একটা অঙ্কের আরম্ভ হইল। যাহা কাগজে-কালিতে এতদিন পড়িয়াছে তাহা এমন করিয়া বাস্তব হইয়া উঠিতে তাহারা ইতিপূর্বে দেখে নাই। তাহাদের স্কুলের তর্কের পিছনে এখন জীবন্ত উপমা সর্বদা মনের পর্দায় আঁকা থাকে, শুধু মস্তিষ্কের বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিয়া তর্ক করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। মিলি যেন নীরবে চোখ তুলিয়া বলে, আমার দিকে চেয়ে কথা বল। তর্কের যুক্তির খেই হারাইয়া যায়, তাহার নীরব অনুরোধ বড় হইয়া উঠে।

নদী ও সাগরের সঙ্গম দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটি রেখাতে আসিয়া তাহারা যুক্ত হইয়াছে, রেখার এপারে এক রং, ওপারে আর-এক রং। কিন্তু যত কাছে আসা যায়, এই সীমারেখা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন্‌খানে যে নদীর মাটিগোলা জল শেষ হইয়া সমুদ্রের পান্নার রং শুরু হইয়াছে কিছুতেই ধরা যায় না। এমন ধীরে ধীরে এক রঙ আর-এক রঙের ভিতর মিশিয়া গিয়াছে যে, যে অপলকে তাকাইয়া থাকে তাহার কাছে দুইই এক বলিয়া মনে হয়! কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টি সরাইয়া লইলে তবে দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারা সম্ভব।

মানুষের কৈশোর এবং যৌবনও তেমনই। তাহার সন্ধিক্ষণ যে কোন্‌টি বলা যায় না। কৈশোরের লীলা-চপলতা কখন যে যৌবন-বেদনার গভীরতার মধ্যে যৌবন-স্বপ্নের প্রাচুর্যের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেয় কেহ বলিতে পারে না। কোন্ রাত্রির অন্ধকারে কিশোর বালক বাল্যলীলার মাঝখানে ঘুমাইয়া কোন্ যৌবন-প্রাতে জীবনের নূতন রসের সন্ধানে ছুটিয়াছে কেহ কি জানে? কিন্তু দূর হইতে ইহাদেরও যেন একটা সীমারেখা দেখা যায়। সুধা কখন যে জীবনের পথে শৈশবকে পিছনে ফেলিয়া আসিল তাহা সে নিজে বলিতে পারে না, কিন্তু স্কুলের পর্ব শেষ করিবার বৎসর খানিক পরে অনেক সময় সে দূর হইতে যেন কলিকাতায় নবাগতা সুধার দিকে মমতার সহিত তাকাইয়া দেখিত। আজিকার সুধা সে সুধা নয়। তাহার জীবনের গতি কোথায় যেন একটু মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রসার অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। শৈশবে ও কৈশোরে জীবনে যে সম্পদ্ সে অর্জন করিয়াছিল তাহা হারাইয়া যায় নাই, কিন্তু নূতন জীবনের যাত্রাপথে অসংখ্য বৈচিত্র্যের অন্তরালে তাহারা যেন একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

হৈমন্তীর প্রতি সুধার টানে কিন্তু কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নাই। বরং তাহার মনে একটা অভিমান জমা হইয়া উঠিতেছিল যে মিলি-দিদি রেঙ্গুনে চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই হৈমন্তী যেন ধীরে ধীরে কেমন একটু বদলাইয়া

যাইতেছে। সেই স্বপ্নভরা চোখ, সেই ধ্যানমগ্ন ভাব সবই আছে, কিন্তু তাহার স্বপ্ন, তাহার ধ্যানের রূপ যেন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। সে এখন স্বপ্নে ধ্যানে যে-লোকে বিহার করে সেখানে সুধা যেন প্রবেশপথ খুঁজিয়া পায় না; সুধাকে যেন পিছনে ফেলিয়া সেখানে সে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে চায়। সুধা তাহাকে দৈবাৎ সচেতন করিয়া দিলে হৈমন্তী মধুর হাসিয়া সুধার দুই হাত চাপিয়া ধরে, বলে, "সুধা, তুমি আমাকে কি ভাব? আমার উপর খুব রাগ কর তুমি, না?"

কেন যে সুধা তাহার উপর রাগ করিবে একথা হৈমন্তী স্পষ্ট করিয়া বলে না, তবু যেন স্বীকার করে কোনো একটা কারণে সে তাহার বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না, বন্ধুর একাগ্রচিত্ততার প্রতিদান সে দিতে পারিতেছে না। সুধা কিছু বলিত না কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইত, কেন হৈমন্তী তাহার কাছে মনের কথা বলে না। হৈমন্তীর মনে কি বেদনা, কি স্বপ্নের মায়া তাহাকে আপন-ভোলা করিয়াছে, সুধাকে বলিলে সে ত খুশীই হইত, হৈমন্তীর দুঃখ সুখ সব কিছুকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতাতেই ত তাহার বন্ধুত্বের মূল্য।

সন্ধ্যার পর হৈমন্তীদের বাড়ীতে গেলে হৈমন্তী সুধাকে লইয়া ছাদের উপর চলিয়া যাইত। সূর্যাস্তের সোনালী রং তখনও আকাশের গায়ে একটুখানি লাগিয়া আছে, পিছন হইতে রাত্রির অন্ধকার ছায়া অর্ধেক আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ছাদে বসিবার জন্য হৈমন্তী একটা সস্তা মাতুর সংগ্রহ করিয়া আনিত, কিন্তু সেখানে তাহাদের বসা হইত না। যেখানে ছাদের আলিসার উপর হৈমন্তীর জ্যাঠাইমা ঘিয়ের টিনে মাটি দিয়া বেল ও যূঁই ফুলের গাছ লাগাইয়া ছিলেন, হৈমন্তীও একটা রঙীন চীনা টবে রজনীগন্ধার ঝাড় বসাইয়াছিল, সেইখানে ফুলের গন্ধের মধ্যে আলিসার উপর হেলান দিয়া তাহারা দাঁড়াইত। হয়ত হৈমন্তী গুনগুন করিয়া গান ধরিত,

"মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
রাখিব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে,
প্রিয়তম হে, জাগ জাগ জাগ।"

তাহার হাত সুধার হাত দুখানির ভিতর থাকিত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি কোন্ সুদূরের পথে চলিয়া যাইত, তাহার নিঃশ্বাস গভীর হইয়া ফুলের গন্ধের ভিতর

মিলাইয়া যাইত। হৈমন্তী বলিত, "তোমার মুখে ভাই ঐ গানটা ভারি সুন্দর লাগে, তুমি গাও না—

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি।"

সুধা গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী ধরিত,

"দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।"

হৈমন্তীর দৃষ্টি সজল হইয়া উঠিত, তাহার চোখে এমন করিয়া জলকণা কাঁপিয়া উঠিতে সুধা কখনও দেখে নাই। কেন হৈমন্তী কোন কথা বলে না, সুধার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু সে ব্যথা, সে বেদনা কি সুধু হৈমন্তীর জন্য? সুধা বুঝিতে পারিত, এ বেদনা সুধু হৈমন্তীর বেদনায় সহানুভূতি নয়, কোন্ সুদূরের আকুল পিয়াসা তাহার বক্ষেও জাগিয়া উঠিয়াছে, সেও যেন কাহার আশা-পথ চাহিয়া আছে, সেই অজানা-অতিথির মুখ যেন চেনা যায়, যেন চেনা যায় না; কিন্তু এই আধ-চেনার অন্তরাল হইতেও সুধাকে সে ডাকিতেছে, সুধা নাগাল পাইতেছে না। ফুলের গন্ধের মত তাহার একটুখানি আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে ধরা যায় না, তাই এই বেদনার সৃষ্টি।

কোনদিন তাহাদের ছাদের সভায় ছেলেরা আসিয়া পড়িত। একটা মাদুরের পাশে আর একটা মাদুর পড়িত। আজ আর দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা কাটানো চলিত না। হৈমন্তী সেতার ও কাব্যগ্রন্থ লইয়া আসিত, ছেলেদের হাতে এক-একখানা নূতন ইউরোপীয় নভেল। সম্প্রতি যাঁহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহাদের রচনা কে কত বেশী পড়িয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা ও তর্ক লাগিয়া যাইত। মহেন্দ্র প্রমাণ করিত যে সে সকলের চেয়ে বেশী পড়িয়াছে এবং ঔপন্যাসিকদের আদি-অন্ত সব তাহার নখ-দর্পণে।

একদিন নিখিল বলিল, "তুমি ক্যাটালগ দে'খে কন্টিনেন্টাল অথরদের নাম মুখস্থ কর, আর মলাটের উপরের সিনপ্‌সিস্ প'ড়ে এসেই সকলের আগে বক্তৃতা শুরু কর। আমরা বোকা মানুষ, সব বইটা প'ড়ে তার পরে কথা বলব ঠিক করি, তাই সর্বদাই তোমার পিছনে প'ড়ে থাকি।"

হৈমন্তী বলিল, "আপনি ওরকম ক'রে ভদ্রলোককে চটাবেন না, শেষে টোলের পণ্ডিতদের মত লড়াই লেগে যাবে।"

মহেন্দ্র এসব ঠাট্টা-তামাসা গায়ে মাখিত না, সে মেটারলিঙ্ক ও ইবসেনের তুলনামূলক সমালোচনা এবং বার্ণার্ড শ ও অস্কার ওয়াইল্ডের রসবোধের মাপকাঠি লইয়া আরও দ্বিগুণ উৎসাহে কথা বলিতে থাকিত। থাকিয়া থাকিয়া সকলের অলক্ষ্যে আপনার চুলের পালিশে হাত বুলাইয়া লইত ও গলার চাদরটা যথাস্থানে টানিয়া বসাইত।

নিখিল বলিল, "এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা বাজে রসচর্চায় নষ্ট না ক'রে তরমুজের রস কি আমের রসের আস্বাদ নিলে ঢের কাজের হত।"

হৈমন্তীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সে আতিথ্য ভুলিয়া গিয়াছে। সুধাকে উপরে বসাইয়া সে নীচে ছুটিয়া গেল সরবৎ আনিতে। কাঠের একটা পালিশ-করা ট্রের উপর বেঁটে মোটা ছোট ছোট কাচের গেলাসে কোনদিন রক্তাভ তরমুজের সরবৎ, কোনদিন বা আমপোড়ার সোনালী সরবৎ লইয়া সে আধঘণ্টা খানিক পরে উঠিত।

স্বল্পভাষিণী সুধা ছেলেদের মাঝখানে বসিয়া কি কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইল না, সময়টা কাটাইয়া দিবার জন্য তপনকে বলিল, "আপনাকে ততক্ষণ একটা গান করতে হবে।" তপন কথা কম বলিলেও গানে তাহার কণ্ঠ সহজেই সবাক্ হইয়া উঠিত। সে গান ধরিল,

"হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে ভরব তারে রাখব তারে সাথে,
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিও,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

নিখিল বলিল, "গানটি সুন্দর, কিন্তু বন্ধু কে ? দেবতা, না মানবী ?"

তপন বলিল,

"আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

মহেন্দ্র বলিল, "তোমরা কি কবির ভাষায় ছাড়া কথা বলবে না ? নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়েছ ? যদি কাব্যচর্চাই করতে চাও ত বই সামনে রয়েছে, খুলে আরম্ভ কর না ? রোজ আধঘণ্টা পড়লেও অনেক এগিয়ে

খাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে সংস্কৃত কাব্যও ধরতে পার। আমার ঐদিকেই ঝোঁক বেশী। আমাদের কবিরা সকলেই ত ঋণী সংস্কৃত কবিদের কাছে।"

সুধার মন এদিকে যাইত না, গানের সুরের ভিতর তাহার মনটা ঘুরিয়া বেড়াইত। কি সুন্দর গলার স্বর তপনের, যেন ঝরনার জলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন চার লাইন গানের ভিতর মানুষের প্রাণের সকল গভীরতম কামনার কথা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে। কিন্তু এ কি শুধু সুকণ্ঠের মোহ, এ কি শুধু কবির বাণীর অপূর্ব সৌন্দর্য যাহা সন্ধ্যার অকাশকে এমন করিয়া ভরিয়া তুলিয়াছে? অন্তরের তন্ত্রীতে যে কথার পতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহার পিছনে কি প্রাণের আহ্বান নাই? সুধার এত কথা জানিবার কি প্রয়োজন তাহা সে নিজেই জানে না ভাল করিয়া, তবু ইচ্ছা করে জানিতে, এই গানের সুরের অন্তরাল দিয়া ওই নবীন প্রাণ কাহাকে কি বলিতে চায়।

হৈমন্তী কোমরে আঁচল জড়াইয়া ট্রের ভারে ঈষৎ হেলিয়া উপরে আসিয়া পড়িলে ছেলেদের মধ্যে কোলাহল পড়িয়া যাইত, সুধার চিন্তার ধারা কাটিয়া যাইত। সরবতের পর সেতার বাজিত, হয়ত নূতন শেখা কোনও গানের সুর সকলের মুখে গুন গুন করিয়া ফুটিয়া উঠিত। এ-পাশের ও-পাশের বাড়ী হইতে মেয়েরা গানবাজনা শুনিবার জন্য জানালা কি ছাদের আলিশা হইতে মুখ বাড়াইত। তারপর আবার ইস্কুল কলেজ, স্বদেশী গানবাজনার কত ছোট ছোট কথা উঠিত, যাহার আয়ু এক মুহূর্তের বেশী নয়। মহেন্দ্র অনেক সময় গম্ভীর সুরে বলিত, "মানুষের জীবন কি এই রকম ছোট কথার আলোচনাতেই নষ্ট করবার জন্য? জীবন ত খুব লম্বা জিনিস নয়, দু-দিনেই ফুরিয়ে যাবে, তাকে হিসেব ক'রে খরচ করা দরকার।"

তপন বলিত, "কথা হাল্কা ব'লেই নিঃশ্বাসের বায়ুর মত মানুষের প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গুরুভার কথাকে পরিপাক করা যায় না। ভারী হাওয়ায় নিঃশ্বাস আটকে যায়, ভারী খাবারে বদহজম হয় একথা মান ত!"

মহেন্দ্র বলিত, "তাই বুঝি তুমি এত হাল্কা কথা বল যে কানে শোনা যায় না?"

নিখিল বলিত, "কেন, গানের সুরের চেয়ে সুমিষ্ট কথা কি আর কিছু আছে ? ও কথা বলে গানে, কিন্তু কাজ করে কোদাল কুপিয়ে ?"

মহেন্দ্র বলিত, "ও, আই বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে ব্যাক টু ভিলেজের বড় পাণ্ডা, তা ভুলে গিয়েছিলাম। বাস্তবিক এ-বিষয়ে আমাদের মধ্যে কখনও ভাল ক'রে আলোচনা হয় না, এটা বড় দুঃখের বিষয়। একদিন একটা বন্ধু-সভা ডাকা হবে, কি বল ? কার কি মত ঠিক জানা যাবে। আমার মনে হয় না উন্নতির যুগে মানুষের আবার পিছন ফেরা উচিত।"

হৈমন্তী বলিত, "মহেন্দ্র দা, গাছের পরিণতি তার ফলে ফলে, কিন্তু তাই ব'লে তার শিকড়গুলোকে কেটে ফেললে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় না। গ্রাম যে আমাদের প্রথম ধাত্রী, তাকে এক গণ্ডুষ জল দিতেও যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে আমাদের প্রাণে রস জোগাবে কে ?"

মহেন্দ্র বলিত, "কেন, গ্রামকেও কি ক্রমশ শহরের আদর্শে তুলে আনা যায় না ? শহরের যা মন্দ তা বাদ যাবে, যদি প্রতি গ্রামই শহর হয়ে ওঠে। তা'হলে শহরে মানুষের ভিড়ে স্বাস্থ্য খারাপ হবে না, রোজগারী পুরুষরা চ'লে আসাতে গ্রামে স্ত্রীলোক বেশী আর শহরে পুরুষ বেশী হয়ে ব্যালান্স নষ্ট, নীতি দুষ্ট হবে না। যে যার নিজের গ্রামে বসে সুবিধা ভোগ করবে।"

সুধা অনেকক্ষণ পরে কথা বলিত, কারণ গ্রাম তাহার জন্মভূমি, শৈশবের লীলাভূমি। সে বলিত, "যদি গ্রামে ব'সে আমরা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ফল কিনি, বাথ-টবে স্নান করি, মোটর চ'ড়ে কাপড়ের দোকানে যাই, লণ্ড্রিতে কাপড় কাচাই, তা হ'লে যে-মাটির পৃথিবীতে আমরা জন্মেছি, তার স্পর্শ জীবনে কোনও দিন পাওয়া হবে না ; আমরা কল হয়ে উঠব কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও সৌন্দর্য থেকে কতখানি যে বঞ্চিত হলাম সেটা জানবার সুযোগ পর্যন্ত পাব না। নিজের হাতে লঙ্কা গাছ লাগিয়ে তার সাদা ফুলগুলি ফোটা থেকে লাল টকটকে পাকা লঙ্কাটি পাড়া পর্যন্ততে গ্রামের মেয়ে যে আনন্দ পায়, শহরে এক পয়সায় এক মুহূর্তে এক ঠোঙা লঙ্কা কিনে শহুরে মানুষ কি সে সুখ পায় ? সে কেনে পয়সার বদলে শুধু মসলা, আর এ পায় প্রতি পায়ে পায়ে নূতন আনন্দ। আধ মাইল হেঁটে গিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা যখন রোদপোড়া শরীর নিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সেই স্রোতের শীতল জলের ভিতর যে স্নিগ্ধতা, সেই খোলা আকাশের নীচে জলধারার মধ্যে যে মুক্তি, স্নানের

ঘরে টবে বসে শহরের ছেলেমেয়ে কি কখনও তা কল্পনা করতে পারে? জীবনের অনেক নিবিড় আনন্দের সঙ্গে শহরের ছেলেমেয়ের কখন পরিচয়ই হয় না।"

মহেন্দ্র বলিল, "আপনি ত বেশ পয়েন্ট ধ'রে তর্ক করতে পারেন! আপনার কি ইচ্ছা যে আমরা আবার সব সেই বৈদিক যুগে ফিরে যাই? মেয়েরা ঘরে ঘরে দুধ দুইবে, ছেলেরা লাঙল চালাবে আর গাছতলায় ব'সে বেদগান করবে!"

সুধা বলিল, "তা মেয়েরা ঘরে ঘরে ব'সে মোটা হওয়া আর ছেলেরা চোখে চশমা দিয়ে ডিসপেপসিয়া করার চেয়ে তা অনেকটা ভাল বইকি!"

নিখিল বলিল, "ভাগ্যিস আমার চোখে চশমা নেই, না হ'লে আমি ত একেবারে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যেতাম। যাই হোক তপন তোমারই জয়জয়কার। বল দেখি তোমার আদর্শ গ্রামে কোন চাকরি খালি আছে কি না। তাহ'লে আমরাও সব সেখানে ঢুকে পড়ব।"

তপন বলিল, "আমার গ্রামের লোকেরা চাকরি করে না। তারা লাঙল চালায়, কোদাল কোপায়, চরকা কাটে, তাঁত বোনে।"

হৈমন্তী বলিল, "নিখিলদা'র ঠাট্টা শুনবেন না। আপনাদের গ্রামে কি রকম কাজ সব হয় সত্যি বলুন না!"

তপন খুব বেশী কথা বলে না। সে বলিল, "এই সাধারণ সব কাজ আর কি! তাই দলবদ্ধ হয়ে করা আর বুদ্ধি খাটিয়ে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটু উন্নতি করা। আমি মুখে আর কি বলব? আপনারা একদিন গিয়ে দে'খে এলে ত বেশ হয়।"

হৈমন্তী যাইতে তৎক্ষণাৎ রাজি। "বাবাকে বলি, যদি যেতে দেন নিশ্চয় যাব সবাই দল বেঁধে।"

নিখিল বলিল, "খালি মহেন্দ্রকে বাদ দেওয়া হবে। ও সেখানে কি-না-কি চেয়ে বসবে তার ঠিক কি।"

নীচতলা হইতে ডাক আসিত। সেদিন সতু আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্রদা, জ্যাঠাইমা বললেন আজ আপনারা এখান থেকেই খেয়ে যাবেন।"

নিখিল বলিল, "আর আমরা?"

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল, "বোকা ছেলে, সকলের নাম বলতে পার না? প্রত্যেককে বল।'

সতু বলিল, "দিদি, সুধাদি, মহেন্দ্রদা, নিখিলদা, তপনদা আপনারা সবাই দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে দুটি শাক-ভাত খাবেন চলুন।"

সভা ভাঙিয়া গেলে দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজার শব্দ শুনিতে শুনিতে সকলে নীচে নামিত।

হৈমন্তীদের বাড়ী হইতে রাত করিয়া ফিরিলে সুধার ভাল করিয়া ঘুম হইত না। মাথার ভিতর অনেক রাত পর্যন্ত কত কথা যে ঘুরপাক খাইত তাহার ঠিক নাই। মুখে সে সেখানে খুব কমই কথা বলিত; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে কাহারও বা যুক্তি খণ্ডন কাহারও বা পক্ষ সমর্থন অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলিত। অপর পক্ষের হইয়া নূতন নূতন কথার অবতারণা সে আপনার মনেই করিত, আবার তাহার উত্তরও নিজেই দিত। কে যে কি রকম কথা বলিবে তাহার একটা খসড়া তাহার কাছে যেন লেখা থাকিত। প্রত্যেকের মুখে প্রত্যেকের মত কথা দিয়া এবং নিজে তাহার জবাব দিয়া যে নৈপুণ্য সে দেখাইত, তাহাতে তাহার মনটা খুশী হইত। কিন্তু এমন করিয়া একটা কথাও যে সে বলিতে পারে না, ইহাতে তাহার দুঃখও হইত। তাহার ইচ্ছা করিত, মহেন্দ্রের সব কূট তর্ক ও নিখিলের রসিকতার জবাব সে বিছানায় শুইয়া নিজের মনে যেমন করিয়া দেয় তাহাদের সামনেও যেন তেমন করিয়াই দিতে পারে। কিন্তু সে জানিত কথা বলা সম্বন্ধে অহেতুক লজ্জাকে সে অল্প দিনে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। তপন তাহারই মত কম কথা বলে, তাহার হইয়াও সুধা মহেন্দ্র ও নিখিলের অনেক কথার জবাব নিজের মনে দিয়া রাখিত। কিন্তু এ জবাব কখনও কাহারও কানে পৌঁছিত না।

সুধা কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পড়াশুনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, এখন কলেজে যাইবার আগে সকালে ও ফিরিবার পর সন্ধ্যায় যেটুকু সময় সে পায় তাহাতে তাহার সংসারের কাজ ও কলেজের কাজ হইয়া উঠে না। কাজেই সকালে তাহাকে উঠিতে হয় ভোর পাঁচটায়, রাত্রেও যখন শুইতে যায় তখন প্রায় এগারটা বাজে। পথে "কুলফি মালাই"-এর ডাক থামিয়া গিয়াছে, শেষ ট্রামগুলা লোকভারের অভাবে ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ করিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, ফুটপাথে ও বাড়ীর বাহিরের দিকে রোয়াকে ও বারান্দায় সারি সারি ছিন্নবাস কুলি-মজুর শুইয়া পড়িয়াছে। হোলির দিনের আগে বাড়ীর সামনে হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালা সারা দিনের কচুরি, ঘুংনি, গজা ইত্যাদির

ফিরি সারিয়া পুকুরের ধারে ছারপোকা-ভর্তি খাটোলা ও খাটিয়া পাতিয়া রাত্রি একটা তুটা পর্যন্ত খঞ্জনি ও ঢোল পিটাইয়া এক সুরে গান গাহিয়া চলিত। বিছানায় শুইলেও সহজে ঘুমাইবার জো ছিল না। তাহার উপর যেদিন হৈমন্তীদের বাড়ী হইতে নানা কথা মাথায় লইয়া সুধা ফিরিত সেদিন প্রায় সারা রাত্রিই বিনিদ্র কাটিয়া যাইত।

সেদিন অনেক রাত জাগিয়া সুধা ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পাঁচটার বদলে ছ'টাও বাজিয়া গিয়াছে। মহামায়া দেয়াল ধরিয়া সুধার খাটের কাছে আসিয়া ডাকিতেছেন, "ও সুধা, ওঠ্ না রে, বেলা হ'ল যে! ওই দেখ্ সিঁড়িতে কে পাগড়ি মাথায় চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দিদিমণিকে চিঠির জবাব দিতে হবে বলছে।"

সুধার ভোরবেলাকার আধ-ঘুমের মধুর স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "উঃ, ঘরে রোদ এসে পড়েছে যে!"

মুখ ধুইয়া চিঠি হাতে করিয়া দেখিল, হৈমন্তী লিখিয়াছে, "সুধা, আজ শনিবার তিনটার পর আমরা তপনবাবুর গ্রাম দেখতে যাব। আর কোনও সঙ্গী পেলাম না, তাই সুধীনবাবুকে ধরেছি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে। তোমাকে নিশ্চয় ক'রে যেতে হবে। যদি শিনুকে নিয়ে যেতে চাও ত তাকেও তৈরী রেখো, ছেলেদের এসব কাজ এখন থেকে দেখা ভাল। তুমি আসবেই, জবাব দিও। ইতি তোমার হৈমন্তী।"

শিনুর তখনও প্রায় মাঝ-রাত্রি। সুধা তাহাকে গিয়া একটা ঠেলা দিল।

শিনু সত্যই বলিল, "আঃ তুপুর রাত্রে জ্বালাতন ক'রো না। আমি এখন তোমাদের ফরমাস্ খাটতে পারব না।" সুধা আবার ঠেলা দিয়া বলিল, "আমাদের জন্যে খেটে ত তোমার হাড়ে ঘুণ ধ'রে গেছে, এখন নিজের জন্যে একটু দয়া ক'রে খাট। তপনবাবুর গ্রাম দেখতে আমরা যাব, তুমি যাবে কি না বল।"

শিনু চোখ কচলাইয়া উঠিয়া বসিয়া খানিক কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা যেতে পারি।"

গ্রাম বেশী দূরে নয়, কলিকাতার বাহিরেই একটা নীচু ধরণের জায়গায়। কঞ্চির বেড়ার উপর মাটি লেপা খড়ের চাল কিংবা হোগলার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ী। খুব কাছে কাছে পানা-বোঝাই অসংখ্য ডোবা ও পুকুর; যে ডোবাগুলি বর্ষার আকস্মিক জলে সৃষ্ট হইয়া পথের মাঝখানে পড়িয়াছে,

তাহার উপর দুই-তিনটা বাঁশ ফেলিয়া সরু সাঁকো তৈয়ারী হইয়াছে। গ্রামের ভিতরে পথ বলিতে তেমন কিছু নাই। মাঠের উপর ও ক্ষেতের আলের উপর দিয়া পায়েচলা পথ উঁচু নীচু হইয়া কখনও কাদায় নামিয়া কখনও খানা-খন্দ ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে। পুরুষে কাঁধে বোঝা লইয়া, স্ত্রীলোকে ছেলে কোলে করিয়া, রাখাল বালক গরু তাড়াইয়া সব এই পথেই চলিয়াছে। মাঝে মাঝে চুন বালি খসিয়া-পড়া নোনা-ধরা ফাটা দেয়ালের পাকা বাড়ী খিড়কির পুকুরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

থার্ড ক্লাস গাড়ীতে চড়িয়া সুধাদের সকলকে একটা স্টেশন হইতে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। তপন বলিয়াছে গ্রামে সে গ্রামের মানুষদের মত থার্ড ক্লাসেই যায়। কাজেই সকলেই তাই চলিল। শিবু ও সতু দুই বালকও ইহাদের সঙ্গ লইয়াছে, কারণ তাহারা পাড়াগাঁয়ে হুটোপাটি করিতে ভালবাসে। হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখা গেল কোথা হইতে সুরেশও আসিয়া জুটিয়াছে। সুধা ও হৈমন্তী তাহাকে সচরাচর দেখিতে পায় না, আজ অনেকদিন পরে তাহাকে দেখিয়া দুইজনেই খুশী হইল।

তপনের পিতামাতা এই গ্রামেরই মানুষ। কায-উপলক্ষ্যে নানা দেশ-বিদেশে বাস করিয়া এখন তাঁহারা কলিকাতার বাসিন্দাই হইয়াছেন। কিন্তু গ্রামে তাঁহাদের ঘরবাড়ী সমস্তই আছে। তিন-চার বিঘা জমির উপর পাকা বাড়ী, গোয়াল, ঢেঁকিশাল, পুকুর, নারিকেল গাছের সারি, দুই দশটা আম কাঁঠাল, একোণে-ওকোণে বাঁশঝাড়—কিছুরই অভাব নাই। গ্রীষ্মকালে আম-কাঁঠালের সময় বৎসরে একবার করিয়া তাঁহারা গ্রামে আসেন। গরমের দিনে দুই বেলা পুকুরের জলে ডুব দিয়া স্নান করিতে, সকাল সন্ধ্যায় গাছের ডাব কাটিয়া গেলাস ভর্তি জল খাইতে এবং প্রত্যহ নিজের হাতে ফল পাড়িয়া ফুল তুলিয়া টুকরি বোঝাই করিতে বাড়ীর ছেলে-বুড়া সকলেরই খুব ভাল লাগিত। কিন্তু বৃষ্টির দিনে গ্রামের পথে চলিতে গেলে এক-হাঁটু কাদা না ভাঙিলে চলে না, গ্রামের তাঁতি কুমোর কামারেরা পেটের ভাতের অভাবে পরের বাগান রাতারাতি উজাড় করিয়া কিংবা পোড়োবাড়ীর দরজা জানালা আসবাব চুরি করিয়া অভাব মোচনের চেষ্টা করে দেখিয়া তপনের বড় কষ্ট হইত। প্রত্যেক বৎসরই দেশে আসিয়া দেখা যাইত, বাড়ীর কাঠ-কাঠরা এটা ওটা সেটা কত কি চুরি গিয়াছে। জিনিস কিছুই মূল্যবান নয়, কিন্তু

বার বার চুরি যাওয়ায় অসুবিধা আছে, মানুষের উপর বিশ্বাসও একেবারে চলিয়া যায়।

তপন এম-এ পাস করিবার পর এই গ্রামের কাজ লইয়াই থাকিবে ঠিক করিয়াছিল। গ্রামে একটা স্কুল খুলিয়া ও গোটা দুই-চার তাঁত বসাইয়া প্রথম সে কাজ আরম্ভ করে। উভয় কাজের জন্যই তাহাদের বাড়ীতে স্থান যথেষ্ট ছিল। তার পর ধীরে ধীরে লাইব্রেরী, পথ মেরামত, ঔষধ বিতরণ, বন্ধক রাখিয়া অতি সামান্য সুদে কর্জ দেওয়া, কুস্তির আখড়া, ইত্যাদি নানা জিনিসের সূত্রপাত হইতেছে। মানুষের উপার্জনশক্তি ও সততার উন্নতির দিকেই তাহার সকলের চেয়ে নজর বেশী।

পড়ন্ত রৌদ্রে মাঠের পথ ভাঙিয়া তাহারা যখন গ্রামে পৌছিল তখন সারাদিনের রৌদ্রে মাটি তাতিয়া ঝাঁঝ উঠিতেছে। তপনের স্কুলের ছেলেরা অতিথিদের জন্য তাহার বাড়ীর বারান্দা ঘণ্টাখানিক আগেই ধুইয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহাতে শীতল পাটি পাতিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকের পা ধুইবার জন্য একটি করিয়া মাজা গাড়ুতে জল ও তাহার উপর লাল গামছা দিয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের জন্য বিছানার চাদরের পরদা টাঙাইয়া বাঁশের টাটের ঘেরা হাত মুখ ধুইবার স্থান করিয়াছে।

সকলের হাত পা ধোয়া হইলে তপন বলিল, "এবার তোমাদের আতিথ্যের আসল আয়োজন দেখি।"

বড় বড় পাথরের থালা হাতে ছেলেরা দেখা দিল। থালায় মুগের ডাল ভিজা, ছানার টুকরা, চিনি, পানফল, শাঁকআলুর টুকরা, পাকা কলা, আম, অল্প অল্প করিয়া সব সাজানো। একটি করিয়া পাথর-বাটিতে বেলের পানা ও পাথরের গেলাসে ডাবের জল।

একজন আধুনিক ভাবাপন্ন ছেলে একটা কাঁসার থালার উপর গুটি চার করিয়া পেয়ালা পিরিচ সাজাইয়া আনিয়া বলিল, "আমাদের চা স্টোভ সবই আছে, ক' পেয়ালা চা করব বলুন, ক'রে দিচ্ছি।" মেয়েদের লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে বলা হইতেছিল, কাজেই জবাব তাহাদেরই দিতে হইবে। সুধা বলিল, "আমার বেশী চা খাওয়া অভ্যাস নেই, আমার জন্যে চা করবেন না।"

ছেলেটি না দমিয়া বলিল, "আমি কোকোও ক'রে আনতে পারি, পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগবে, বেশী দেরী হবে না।"

হৈমন্তী বলিল, "কোকোর প্রয়োজন নেই, বেলের পানা ডাবের জল খেয়ে আর কি কিছু খাওয়া যায় ?"

ছেলেটি অগত্যা পেয়ালা পিরিচ লইয়া গেল।

নিখিল বলিল, "ওহে তপন, ছেলেদের শহর ও গ্রামের এমন সমন্বয় করতে শিখিও না। এতে ত মানুষের আয় বাড়বে না, ব্যয়ই বাড়বে।"

তপন বলিল, "সমস্ত বিদ্যাই গুরুর কাছ থেকে শেখা বলতে মানুষের আত্মসম্মানে একটু লাগে, তাদের স্বলব্ধ বিদ্যা এবং জ্ঞানও যে কিছু আছে, তাও ত তারা দেখাতে চাইবে।"

এই বাড়ীতেই স্কুলের ঘর, জলযোগের পর ছেলেরা দেখাইতে লইয়া চলিল। বেশ বড় বড় ঘর, কোন ঘরে মাতুর পাতিয়া ক্লাস হয়, কোন কোন ঘরে বেঞ্চি এবং ডেস্কও আছে।

নিখিল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের স্কুলে এমন জাতিভেদ কেন ? কেউ বসে রাজাসনে আর কেউ বসে একেবারে মাটির কোলে ?"

তপন বলিল, "ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর কেন জাতিভেদ।"

একটি ছেলে রসিকতাটাকে গম্ভীরভাবে গ্রহণ করিয়া উত্তর দিল, "যে সব ছেলেদের বয়স কম তারা নিজেদের জন্যে বেঞ্চি তৈরি করতে পারে না, তাই তাদের মাতুর কিনে দেওয়া হয়। আমরা কাঠের কাজ শেখবার জন্যে নিজেদের জিনিসই আগে তৈরি করতে শিখি।"

মহেন্দ্র বেঞ্চিতে হাত বুলাইয়া বলিল, "কাপড়চোপড় ছেঁড়বার সম্ভাবনা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহলেও এরা জিনিস মন্দ করে নি। নিজেদেরই কাপড় ছিঁড়লে পরের বার সাবধান হয়ে খোঁচা পেরেকগুলোর উপর নজর দেবে।"

ছেলেদের ডেস্কের সঙ্গে দেরাজও ছিল। মহেন্দ্র একটা দেরাজ টানিয়া দেখিল চাবিবন্ধ। তপন বলিল, "চাবি ছেলেদের কাছে আছে। ওহে, আজকে কার চাবির পালা নিয়ে এস দেখি।"

হৈমন্তী বিস্মিত হইয়া বলিল, "চাবির পালা মানে ?"

তপন বলিল, "ছেলেদের জিনিসপত্রের ভার প্রত্যেকের উপর আলাদা ক'রে নয়। এক-এক দিন এক-এক জন সকলের জিনিসপত্রের ভার নেয়। সেদিন সকলের চাবি তার কাছে থাকে। যদি কারুর কোন জিনিস হারায় তার জন্য সে দায়ী হয়।"

নিখিল বলিল, "তুমি কি 'টেমট্-নট'-এর ('লোভে ফেলো না'র) উল্টা থিওরি প্রচার করছ ?"

তপন বলিল, "একটু এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখছি, মানুষ এই রকম ক'রে লোভ জয় করতে পারে কি না। পরকে ঠকানো আর পরের জিনিস চুরি করা মানুষের যে সেকেণ্ড নেচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এর কবল থেকে উদ্ধার না পেলে আর মুক্তি নেই।"

শিবু বলিল, "মুক্তি আছে তপনদা, যদি সেই রকম মার মারা যায়, যাতে জীবনে আর কোনদিন গায়ের ব্যথা না সারে।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। সতু বলিল, "তাহ'লে যাদের গায়ের জোর বেশী, তারা সব চেয়ে বেশী চুরি করবে।"

তপন বলিল, "মানুষের শক্তি আর সুযোগ থাকলেও সে যে নির্লোভ হতে পারে এবং সমাজগত ও ব্যক্তিগত ভাবে তাতেই যে মানুষ লাভবান্ হয়, এটা লোকে কবে শিখবে জানি না।"

মহেন্দ্র বলিল, "যে-দেশের শ্রীকৃষ্ণ ব'লে গিয়েছেন 'মা ফলেষু কদাচন' সে দেশের কাছে তোমার এ ফিলসফি ত অতি সামান্য জিনিস।"

তপন বলিল, "সামান্য হতে পারে, কিন্তু বিরাটটা বোঝবার বুদ্ধি পর্যন্ত যাদের লোপ পেয়ে গেছে, তারা সামান্যটা শিখলেও যে মুমূর্ষুর জল-গণ্ডুষ হয়। ছোট হতে হতে আমরা ত মরতে বসেছি। বিদেশের লোকের কাছে মুখ দেখাতেও আমাদের লজ্জা করে যখন মনে করি আমার দেশের কত লোক স্ত্রীলোককে একলা পেলে তার মান মর্যাদা রাখে না, অসহায় দেখলে তার সর্বস্ব কাড়তে পারে আর সামান্য দু-চার পয়সার জন্যেও চোর কি ঠগ নাম নিতে লজ্জা পায় না।"

স্কুল ঘর ছাড়িয়া সকলে বাগানে চলিল। বাগানে প্রত্যেক ছেলেকে ছোট ছোট জমি দেওয়া হইয়াছে তরকারির ক্ষেত করিবার জন্য।

তপন বলিল, "ছেলেরা নিজেদের বাড়ীতে এই তরকারি নিয়ে যেতে পারে, বিক্রিও করতে পারে। বিক্রির লাভের পয়সা অর্ধেক স্কুল পায়।"

হৈমন্তী বলিল, "বাড়ীর নাম ক'রে সব তরকারি বেচেও ত পয়সা ওরা নিজে নিতে পারে।"

তপন বলিল, "পারে বটে, কিন্তু এটা আমাদের স্কুলের ছেলের পক্ষে একটা

ঘোরতর অন্যায়। কেউ ধরা পড়লে তাকে স্কুল থেকে বার ক'রে দেওয়া হয়। এমন কি কারুর বাড়ীর লোকে বাগানের জিনিস চুরি করেছে জানা গেলে সে বাড়ীর ছেলেদের আর নেওয়া হয় না।"

সুধা বলিল, "আপনি ভয়ানক কড়া মাস্টার। এ সব বিষয়ে এই রকম কড়াই কিন্তু হওয়া উচিত। 'আহা গরীব বেচারী' ব'লে আমরা যে ছেড়ে দি, সেটাই ওদের আরও মাটি করে।"

সুধার কথায় উৎসাহিত হইয়া তপন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই একটা গ্রামের ছেলেগুলোকে যদি মানুষ ক'রে মরতে পারি, বুঝব পৃথিবীর কোন একটা কাজে লাগলাম।"

মহেন্দ্র বলিল, "বিলেত থেকে ঘুরে এসে যখন একটা সার্ভিসে ঢুকবে আর মাস গেলেই এক গোছা নোট পাবে, তখন কি তোমার এত কথা মনে থাকবে?"

তপন বলিল, "পরকে লোভ জয় করতে শেখাতে হ'লে নিজের লোভটা আগে জয় করতে হয়। ওসব সার্ভিস-টার্ভিসের কোন আশা আমি রাখি না, রাখতে চাইও না।"

শিবু বলিল, "আপনি যে কেবল বলেন, 'বিলেত যাব বিলেত যাব', তবে কি করতে যাবেন সেখানে?"

তপন হাসিয়া বলিল, "তোমারও কিউরিওসিটি (কৌতূহল) হয়েছে? যাব শুধু বিলেত নয়, য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, সবত্র পৃথিবীর আর সব মানুষ আমাদের চেয়ে কত উন্নত তাই দেখতে। শুনেছি অনেক, চোখেও ত দেখা দরকার!"

শিবু বলিল, "শুধু দেশ দেখতে আপনার বাবা এত পয়সা দেবেন। আমাকে কেউ দিত ত আমি সারা পৃথিবী ঘুরে আসতাম।"

তপন হাসিয়া বলিল, "বাবা টাকা না দিলে কি আর যাওয়া যায় না? আমি নিজেই না-হয় দেব। মাটি কুপিয়ে একলা মানুষের খরচ কি আর জমাতে পারব না?"

শিবুর আত্মসম্মানে ঘা লাগিল, বলিল, "অল রাইট, আমিও মাটি কুপিয়ে টাকা রোজগার করব। এই পড়াটা শেষ হোক না, দেখুন ঠিক আপনার চেলা হব।"

সুধীন্দ্রবাবু এতক্ষণ নীরবেই দলের সঙ্গে ঘুরিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "গুটি কতক মেয়েকেও তোমার চেলা ক'রে নাও না হে তপন; মেয়েরা যদি কাজে না নামে ত মেয়েদের টেনে তুলবে কে?"

হৈমন্তী ও সুধা সাগ্রহে তপনের মুখের দিকে তাকাইল। সুধা কিছু বলিতে পারিল না; হৈমন্তী বলিল, "আমার পড়া শেষ হয়ে গেলে আমি আপনার গ্রামে কাজ করতে আসব।"

মহেন্দ্র বলিল, "আমাদের দেশ এখনও এতটা উন্নত হয় নি যে ঘর ছেড়ে অল্পবয়স্ক মেয়েরা বাইরে কাজ করতে এলে সেটাকে ভাল চোখে দেখবে। তোমার বাবা কখনই এ সব পছন্দ করবেন না।"

হৈমন্তী বলিল, "যখন যথেষ্ট বড় হব, তখন ভাল কাজে যদি বাবা বাধা দেন, তাহলেও কি বাবার কথা মেনেই চলতে হবে?"

মহেন্দ্র বলিল, "অবশ্য হবে। তুমি যে অন্ন বস্ত্র সব কিছুতেই তাঁর মুখাপেক্ষী।"

হৈমন্তী বলিল, "আচ্ছা, দিন আসুক, দেখা যাবে। বাবা বাধা দেবেন, আগে থেকে ধ'রে নিতে চাই না, আর যদিই দেন তখন অন্য পন্থা আছে কি না সেই দিনই ভাবব।"

মহেন্দ্র সুধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলেন?"

তপনও যেন সুধার উত্তর শুনিবার জন্য সরিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুধার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে একটু থামিয়া একটু ঘামিয়া অনেক কষ্টে বলিল, "আমার এখনও জবাব দেবার সময় আসে নি। আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি যে ঘরে ব'সে যথাসাধ্য এই কাজে আমি আপনাদের সহায় হতে চেষ্টা করব।"

তপন যেন একটু নিরাশ ভাবে অন্যদিকে তাকাইল। সুধা ব্যথিত হইয়া বলিল, "আমার ঘরের কর্তব্য বড় কি বাইরের কর্তব্য বড়, আমি এখনও ভাল ক'রে ঠিক করতে পারি না। মন ত যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, মন এখনও ঘরকেই বড় ক'রে রেখেছে।"

সুধীন্দ্রবাবু বলিলেন, "তুমি খুব ওজন ক'রে কথা বল দেখছি। মেয়েদের পক্ষে ঘরের কর্তব্য ফে'লে বাইরে চ'লে আসা সহজ নয়। তুমি যে উৎসাহের মুখে সে কথাটা ভুলে বড় কথা বলতে চেষ্টা কর নি, দে'খে আশ্চর্য লাগছে।"

মহেন্দ্র বলিল, "কিন্তু ঘরকে ফেলে আসবার শক্তিও এক দল মেয়ের থাকা চাই, না হ'লে দেশকে দেখবে কে? যুদ্ধের সময় স্বামী-পুত্রের কর্তব্য ভুলে যেমন পুরুষকে মরণের মুখে এগিয়ে যেতে হয়, আমাদের এই দুর্গতির দিনে মেয়েদেরও তেমনই ক'রে ঘর ভুলে পথে নেমে আসতে হবে।"

হৈমন্তী বলিল, "কথাটা সত্যি। ঘরকে ভোলার সাধনাও আমাদের করা দরকার। দেখি আমি পেরে উঠি কিনা।"

বাগানের পর তিন-চারটা পুকুরের মাঝখানে বাঁকা বাঁকা আলের মত পথ দিয়া তাহারা ছেলেদের কুস্তির আখড়া দেখিতে চলিল। পুকুরগুলা এত কাছে কাছে যে মাঝের পথটুকু কাটিয়া দিলেই এক হইয়া যায়। পথে পাশাপাশি দুই জন চলা যায় না, একের পিছনে এক করিয়া চলিতে হয়। পুকুরের জলে মেয়েরা বাসন মাজিতে, কাপড় কাচিতে, গা ধুইতে নামিয়াছে, আবার কেহ ঘড়া করিয়া সেই জলই ঘরে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। নিখিল বলিল, "আমাদের দেশে মানুষ এত মরে কেন না ভেবে, এততেও বেঁচে আছে কি ক'রে তাই ভাবা উচিত। দেখছ ত কি খাচ্ছে আর কিসে মুখ ধুচ্ছে?"

তপন বলিল, "তবু ত এ গ্রামে খাবার জলের আমরা একটা আলাদা পুকুর রেখেছি।"

আখড়ার কাছে তেঁতুলতলায় বাঁধানো বেদীতে পাঁচ বৎসর হইতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের নানা বয়সের মানুষ কাজ কর্ম ফেলিয়া জটলা পাকাইতেছে, আর গল্প করিতেছে, কেহ বা বসিয়া অবাক্ হইয়া শুধু শহরের মেয়ে দেখিতেছে।

নিখিল বলিল, "এদের কি কোন কাজ নেই?"

তপন বলিল, "গ্রামের মানুষ কাজ করতে চায় না। যতক্ষণ পেটে এক মুঠো ভাত আছে, ততক্ষণ ওরা ব'সে থাকবে। তবু ত আমাদের পাল্লায় প'ড়ে অনেকে কাজে নেমেছে।"

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, সুধারা বাড়ীর পথে স্টেশনে চলিল। গ্রাম দেখিয়া তাহার ভাল লাগিল বটে, কিন্তু মন অস্বাভাবিক বিষণ্ণ হইয়া গেল। জীবনে বড় আদর্শের প্রতি তাহার অদ্ভুত টান ছিল। আমাদের এই হতভাগ্য দেশেই আদর্শ বড় হওয়ার প্রয়োজন বেশী, ইহা সে বুঝিতে শিখিয়াছিল। ত্যাগের আনন্দ তাহার কাছে মস্ত আনন্দ ছিল, তাই তাহার দুঃখ হইতেছিল, এই দুর্ভাগ্য দেশের জন্য সে ত কিছুই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। দুঃখ

হইতেছিল, ওই দেবমূর্তির মত সুন্দর যুবাটির ত্যাগের আদর্শের কাছে সে ত পৌঁছিতে পারিতেছে না। মনে হইতেছিল, ইহাকে তাহার প্রাণপ্রিয় কাজে একটুখানি সাহায্য করিতে পারিলে যেন সুধার নিজের জীবনটাও ধন্য হইয়া যায়, অথচ তাহা করিবার উপায় নাই।

স্কুল কলেজ থাকিলে সপ্তাহে এক দিনের বেশী হৈমন্তীদের বাড়ী যাওয়া হয় না। ঐ একটা দিনই ছিল সুধার প্রাত্যহিক রুটিনের বাহিরে মুক্তির দিন, কারণ তাহার মা পীড়িত বলিয়া তাঁহার সঙ্গে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ কি কোন উৎসব-আনন্দে যাইবার সুযোগ তাহার ঘটিত না। ঐ একটা দিনের জন্য সারা সপ্তাহ ধরিয়া উন্মুখ হইয়া থাকা সুধার নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে দিনটা কখনও বাদ পড়িলে এমন কিছু দারুণ নৈরাশ্যের কারণ ঘটিত না। হৈমন্তীর সঙ্গে সপ্তাহের আর ছয়টা দিন ত দেখা হয়ই।

অকস্মাৎ ঐ দিনটার আশা-পথ চাহিয়া থাকায় সুধার আগ্রহ যে অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সে আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইল। একদিন সকালে উঠিয়া সে লক্ষ্য করিল যে একটা রাত্রি কাটিয়া যাওয়াতে ছুটির দিনের কতটা কাছে সে আগাইয়া আসিয়াছে তাহা সে গুনিতে আরম্ভ করিয়াছে; সন্ধ্যাতেও সে একটা দিন শেষ হওয়ায় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দিন ও রাত্রিকে দুই ভাগ করিয়া লইয়া দিনের বারোটা ঘণ্টা কাটিয়া গেলে তাহার আনন্দ যেন উপছিয়া পড়ে, কারণ রাত্রির বারোটা ঘণ্টা ত ঘুমাইয়াই কাটিয়া যাইবে। কখন যে তাহার আরম্ভ সেইটুকু জানিলেই চলিবে, শেষটার জন্য দীর্ঘ বারো ঘণ্টা সজ্ঞানে অপেক্ষা করিতে হইবে না।

কিন্তু কেন তাহার এই আগ্রহ? আগ্রহের কারণ বুঝিয়া আপনার কাছে আপনাকেই যেন সে অপরাধী বলিয়া মনে করিত। জীবনে উচ্চ আদর্শের, ত্যাগের আদর্শের প্রতি সুধার টান ছিল। সে যে তাহার জীবনে বড় কিছু ত্যাগ করিতে পারে নাই ইহার জন্য তাহার মনে মনে একটা মস্ত লজ্জাও ছিল। তপনের গ্রামের স্কুল দেখিয়া আসিয়া তাহার সেই লজ্জাটা অনেকখানি বাড়িয়াছে। ইচ্ছা করে, তপনের মত সেও তাহার নয়ানজোড় গ্রামের মেয়েদের লইয়া ইস্কুল পাঠশালা করে, মেয়েদের সততা ও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির জন্য বড় একটা পণ করিয়া কাজে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। কিন্তু স্বার্থপর সে, তাহা পারিতেছে কই? নিকটে যাহারা তাহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া

আছে, রক্তের সম্পর্কের সেই কয়টি মানুষের সুখসুবিধা ভুলিয়া দূরের মানুষের জন্য জীবনের কিছু অংশ সে দিতেছে কই? অথচ তাহার আগ্রহের অন্ত নাই ঐ কর্মী তপনের দেখা সপ্তাহান্তে একবার পাইবার জন্য। সুধার মনে করিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, যখন সে চমকিত হইয়া নিজের দিকে চায়। সে ত তপনের গ্রাম-গঠনের কাহিনী শুনিবার জন্য দিনের পর দিন আশাপথ চাহিয়া থাকে না। সে চায় তপনের নবীন ভাস্করের মত উজ্জ্বল সুন্দর মূর্তিটি বারবার দেখিতে, সে চায় তাহার জলকল্লোলের মত মধুর গভীর কণ্ঠস্বর প্রাণ ভরিয়া শুনিতে, সে চায় তপনের সহিত আর একটু নিকট বন্ধুর মত সম্পর্ক পাতাইতে। যাহার ত্যাগের এক কণাও সে নিজের জীবনে দেখাইতে পারিতেছে না, তাহার প্রতি এ অহেতুক আকর্ষণকে সুধা ভীত হইয়া ভাবে এ বুঝি তাহার পতন, এ বুঝি তাহার স্খলন!

এক-একবার মনে করে হৈমন্তীর বাড়ী এ সপ্তাহে যাইবে না। সে ত তপনের কোন কাজে সাহায্য করে নাই, তবে কেন সে তপনকে দেখিবার জন্য তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইবে? কিন্তু মনের এই ক্ষীণ ইচ্ছা টিকে না ওই বিপুল আগ্রহের কাছে। রবিবার বিকালে সুধা না গিয়া থাকিতে পারে না। তপন কি সব দিনই আসে? সব দিন সে আসে না। সুধা ঘণ্টা মিনিট গুনিয়া যখন নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরে, তখন রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় কবে কোথায় তপনের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, কবে সে কি কথা বলিয়াছিল, কোন্ দিনকার কথাটা যেন একটু আত্মীয়ের মত, যেন বিশেষ করিয়া সুধারই উদ্দেশে বলা। তাহাদের বাড়ীতে ইতিপূর্বে তপন আসে নাই; আচ্ছা, যদি তপনকে এক দিন এ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে, তবে কি তপন কিছু মনে করিবে? আসিলে সে সুধার কাছে মস্ত একটা কাজের ভবিষ্যৎ আশায়ই নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু যখন দেখিবে সুধা কোন কাজই করিবার স্পষ্ট আশা দিতেছে না, কেবল চা খাওয়াইয়া গান শুনিয়া বিদায় দিল, তখন সুধাকে কি একটা অপদার্থই না জানি সে মনে করিবে। ভয়ে ভয়ে সুধার সঙ্কল্প মনেই শুকাইয়া যাইত। কিন্তু তবু মন হইতে এ চিন্তাকে সে সরাইতে পারিত না। তপন কি দেশের সেবা ছাড়া জীবনে আর কোন কথা ভাবে না? মানুষ যে মানুষের সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়ায়, মানুষের বন্ধুত্বের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই অতি সাধারণ

মানব-ধর্ম কি তপনের মধ্যে নাই? যদি না থাকে তবে সে গানের সুরের ভিতর দিয়া মানুষের প্রাণের কথাকে এমন করিয়া ব্যক্ত করে কি করিয়া? কেন ঐ বিষাদ-মধুর গানগুলিই তাহার কণ্ঠে এমন অপূর্ব হইয়া ধ্বনিয়া উঠে? কেন সে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিদের সন্ধানে না ঘুরিয়া তাহাদের এই ক্ষুদ্র সান্ধ্যসভার তুচ্ছ হাসিগল্প হাল্কা কথার মাঝখানে এমন করিয়া জমিয়া যায়? সেখানে তপন ত মহেন্দ্রের মত গুরুগম্ভীর কথা বলিয়া আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করে না। সুধারা যতই সাধারণ মানুষ হউক না কেন, বোধ হয় তাহাদের সঙ্গ তপনের নিতান্ত মন্দ লাগে না। কিন্তু ঠিক যে কতটুকু ভাল লাগে, মনের কোন কোণে কোন্ বন্ধুর জন্য তাহার কতখানি স্থান আছে তাহা ত কিছু বোঝা যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে আপনার উপর সুধার করুণা হয়। এই মাত্র অল্প কিছুদিন আগেই হৈমন্তীর উদাস মনোভাব ও চিন্তামগ্ন দৃষ্টি দেখিয়া সুধার অভিমান হইত, কেন তাহার মনের বেদনার কথা সে সুধাকে বলে না, কেন সে বন্ধুর সমবেদনার মাঝখানে আপনার বিষাদের বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া মুক্ত হইতে চায় না। আর আজ সুধাও কি তাহাই করিতেছে না? সে ত আরোই বেশী করিতেছে। সপ্তাহান্তে হৈমন্তীর কাছে যখন সে যায় তখন তাহার অর্ধেকের বেশী মন পড়িয়া থাকে হৈমন্তীর চেয়ে অনেক দূরে। অথচ হৈমন্তী মনে করে, সুধা বুঝি শুধু তাহারই জন্য আকুল আগ্রহে এত দূর ছুটিয়া আসিয়াছে। কি জানি সুধার ইহা ন্যায়সঙ্গত কাজ হইতেছে কি না।

সুধা ঠিক করিল একটুখানি কিছু কাজ করিয়া তপনের বন্ধুত্বলাভের যোগ্যতা তাহাকে অর্জন করিতে হইবে। এই কলিকাতা শহরে ঘরে বসিয়া বাহিরের কিছু কাজও কি করা যায় না? নিশ্চয় যায়। সুধা ও শিবু মিলিয়া তাহাদের বাড়ীর চারতলার চিলেকোঠায় একটা পাঠশালা খুলিবে। ননীর মায়ের ছোট মেয়ে ফেনি আর মেথরাণীর মেয়ে কুসি ত রোজ দুই বেলা তাহাদের বাড়ী আসে। এই মেয়ে দুইটাকে লইয়া কাজ শুরু বেশ করা যায়। ইহাদের বর্ণপরিচয় ও ভদ্রতা শিক্ষা দিতে পারিলে পৃথিবীর দুইটা মানুষের ত উপকার করা হয়। সুধা সামান্য মানুষ। তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট না হইলেও কিছু ত বটে!

শিবু স্কুল হইতে আসিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মস্ত দুখানা খাতায় পৃথিবীর নানা দেশের স্ট্যাম্প সুশৃঙ্খল করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত ছিল। সুধাকে সে বলিয়াছিল তাহার বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কিছু কিছু স্ট্যাম্প যোগাড় করিয়া দিতে। সুধা এত দিন গা করে নাই। আজ সে অকস্মাৎ বলিল, "শিবু, তুই যদি ভাই, আমার একটা কাজ ক'রে দিস ত আমি তোকে অনেক স্ট্যাম্প এনে দেব।"

শিবু বলিল, "কি কাজ? মার্কেটে সাত বার জুতো বদ্‌লাতে যেতে হবে, না ফ্লস সিল্ক এনে দিতে হবে, না ধোপা নাপিত কাউকে চাঁটি মারতে হবে? শেষের কাজটা বললেই পারব, অন্যগুলো হ'লে একটু দেরী হবে।"

সুধা হাসিয়া বলিল, "না বাপু না, আমার জুতো এই সবে গত মাসে কিনেছি আর ফ্লস সিল্ক জন্মদিনে এক বাক্স পেয়েছিলাম গতবার। ও সব চাই না। ধোপাকে তুমি যদি চাঁটি মারতে ভালবাস আমার আপত্তি নেই, ও ভীষণ জ্বালাচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা কাজ আছে। আমাদের চারতলার টিনের ঘরে আমি একটা পাঠশালা করব হপ্তায় তিন সন্ধ্যা। তাতে ফেনি আর কুসি প্রথম ছাত্রী। তুই যদি আমাকে একটু সাহায্য করিস ত একটু কাজ হয়।"

শিবু নাকটা সিঁটকাইয়া বলিল, "রা—ম—চ—ন্দ্র! ফেনি আর কুসি পৃথিবীর সেরা দুটি পেত্নীকে পড়াবে আর আমি হাত গুটিয়ে তাদের মাস্টারি করব? ওদের টিকি ছেঁড়বার জন্যে আমার হাত ত সারাক্ষণ নিস্‌পিস্ করবে, আর তুমি উপদেশ দেবে যে মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই! তার চেয়ে ধোপার ওই নম্বর ওয়ান্ পাজি ছেলেটাকে নাও না! পাড়ার ছেলেদের ঢিল মেরে কেমন বকধার্মিকের মত মুখ ক'রে এসে আমাদের বাড়ীতে লুকোয়। ঢিল কাকে বলে তাই নাকি ও জানে না।"

সুধা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তুই যদি ওটাকে জোটাতে পারিস, আর ওর ভার নিতে পারিস তা'হলে ত ভালই হয়। পাঠশালের ছেলেমেয়ে বাড়াতে ত হবে!"

কুসির মাকে বলিবামাত্র সে রাজি হইয়া গেল। "দাও না দিদিমণি, লক্ষ্মীছাড়ীটাকে মানুষ করে, তাহলে ত আমার হাড় জুড়োয়। সারাদিন রাস্তায় ধুলো মেখে আর আমাকে সুদ্ধ বাপ মা তুলে গাল দিয়ে ত দিন

কাটাচ্ছে। ভদ্দর নোকের পায়ের কাছে বসতে যদি পায়, সেও ত ওর সাত-জন্মের ভাগ্যি !"

কিন্তু ননীর মা ফেনিকে দিতে অত সহজে রাজী হইল না। মেথরের মেয়ের সঙ্গে তাহার মেয়ে একাসনে বসিয়া পড়িবে শুনিয়া সে ত প্রায় আকাশ হইতে পড়িল। "ঈ কী মেলেচ্ছ কাণ্ড দিদিমণি। আমরা গরীব লোক ব'লে আমাদের কি আর জাত জন্ম সব গেছে ? মেথরের সঙ্গে পড়তে বসলে আর কোনও কালে কি ওর বে-থা হবে, না ওর হাতে কেউ জল খাবে ? বই প'ড়ে ত মেয়ে চাকরি করবে না আপিসে, কিন্তু জাত গেলে যে সব যাবে।"

শেষ রফা হইল কুসি আলাদা চটের আসনে বসিবে। ফেনি ইচ্ছা করিলে নিজের অন্য আসন আনিতে পারে অথবা সকলের সঙ্গে মাদুরেও বসিতে পারে।

রজকনন্দনকেও আসন সম্বন্ধে নিজ ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। পাঠশালা শুরুর দিন দেখা গেল তিন জনেই তিন টুকরা ছেঁড়া চট আনিয়াছে বসিবার জন্য। কিন্তু পাঠারম্ভের পর সকলেই ভূমি-আসনে বেশী সুখকর মনে করিয়া চটের আসনের মায়া ত্যাগ করিল। দুই-চার বার পাঠশাল করিতে করিতে চট আনার অভ্যাসটাও ক্রমে তাহারা ভুলিয়া গেল। পাড়ার আরও গোটা দুই ছেলে জুটিয়াছে, সবাই সবাইকার ঘাড়ে পড়িয়া মেজের উপর বসিয়াই পড়াশুনা করে। কে যে মেথর আর কে যে চামার তাহা অত মনে রাখিবার আর কাহারও আগ্রহ নাই।

সুধা ইস্কুল ভাল করিয়া সাজাইবার জন্য নিজেদের ছেলেবেলার যত ছেঁড়া গল্পের বই একটা কেরাসিন কাঠের তাকে আনিয়া জড় করিয়াছে। দুই-একখানা ছেঁড়া ধারাপাত কি বর্ণ-পরিচয়ের বইও তাহাদের শৈশবের অত্যাচার অতিক্রম করিয়া এতদিন টিঁকিয়া আছে। সুধার উৎসাহ দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বলিয়াছেন, এই বইগুলি সস্তায় তাঁহার ইস্কুলের দপ্তরীকে দিয়া বাঁধাইয়া দিবেন এবং যদি ছাত্রদের কাছে পুরানো কিছু বই পাওয়া যায় তাহাও আনিয়া দিবেন। মহামায়া বলিয়াছেন একটা নূতন হ্যারিকেন লণ্ঠন সুধার ইস্কুলে উপহার দিতে রাজি আছেন। হৈমন্তী ত পারিলে তাহার সব বইখাতাই দান করিয়া বসে। সুধা লইতে আপত্তি করাতে সে ছেলেমেয়েদের

ইংরেজী বই ও শ্লেট পেনসিল জোগাইবার ভার লইয়াছে। শিবু দানধ্যানের ধার ধারে না, তবে সে সপ্তাহে তিন সন্ধ্যায়ই সুযোগ্য শিক্ষকের মত কাজ করিয়া যায়।

পাঠশালের কাজ মহোৎসাহে চলিতে লাগিল। ছেলে-মেয়েগুলা আকাট মূর্খ ছিল, এক মাসের মধ্যেই বর্ণ-পরিচয় সারিয়া একটু আধটু পড়িতে শুরু করিয়াছে, ইহাতে সুধার মনে গর্বের ও আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু ঐ আনন্দের উপর আরও একটা আনন্দের ক্ষুধাও যে তাহার আছে। ছোট বটে তাহার এই কাজটুকু, তবু ইহা তাহার দেখাইতে ইচ্ছা করে তপনকে। শুধু দেখানো বলিলেও ঠিক বলা হয় না, দেখাইবার উপলক্ষ্য করিয়া তপনকে একবার তাহাদের এই ছোট বাড়ীটিতে লইয়া আসিতে, তাহার মুখে দুই-একটা উৎসাহের কথা শুনিতে সুধার যতখানি আগ্রহ হয়, আর অন্য কোন কাজে ততখানি হয় না। তপনের মুখের দিকে চাহিয়া সুধা বুঝিতে চায় সুধার এ কাজে তপন সত্যই খুশী হইয়াছে কিনা। তপনের বন্ধু বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা সুধা অর্জন করিয়াছে কিনা তাহা কোন উপায়ে সে একবার ভাল করিয়া জানিতে চায়। সুধা মনে করিয়াছিল তপনের প্রিয় কার্যের মধ্যে ডুবিয়া সে তপনকে লইয়া অলস স্বপ্নের জাল বোনার অভ্যাস ভুলিতে পারিবে। কিন্তু দেখিল তাহার এ অনুমান মিথ্যা; "তস্মিন্ প্রীতি" ও "তস্য প্রিয় কার্য" তাহার জীবনে পরস্পরকে বাড়াইয়াই তুলিতেছে। কাজ ও অকাজের মাঝখানে ঐ চিন্তা যেন তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিতেছে।

মনে মনে কথা বলার অভ্যাস সুধার অনেক দিনের। সে অভ্যাস কিছুমাত্র দূর হয় নাই; কিন্তু তাহাতে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। আগে সুধার মানস-নাট্যে কথা বলিত অনেক জন, এখন সেখানে ক্রমে দুইটি মানুষই প্রায় সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া বসিয়াছে। সুধা ও তপন মনে মনে প্রতিদিন যত কথা বলে, লিখিয়া রাখিতে পারিলে তাহাতে বহু কাব্য রচনা হইয়া যাইত। অবশ্য, তপনের কথাগুলিও বলে সুধাই, কিন্তু সুধাই তাহা এমন তন্ময় হইয়া শোনে যে, সে-ই যে নাট্যরচয়িত্রী তাহা তাহার নিজেরই মনে থাকে না। তপনকে লইয়া সুধা মনে মনে চলিয়া যায় তাহাদের সেই শৈশবের নয়ানজোড়ে। সেখানে বিশালকাণ্ড মহুয়া গাছের তলায় কালো পাথরের উপরে বসিয়া তাহারা দীঘি-পাড়ের বকেদের সাদা ডানার দ্যুতি দেখে

আর কত তুচ্ছ কথায় জীবনের মাধুর্যকে উপভোগ করে। কথা বলিতে বলিতেই পট পরিবর্ত্তিত হয়, সুধা ও তপন চলিয়াছে রূপাই নদীর জলে পা ডুবাইয়া ওপারের ধানের ক্ষেতের দিকে। সেখানে তাহারা সাঁওতাল মেয়েদের নিকট দুধ কিনিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। তপনের অঞ্জলিতে সুধা দুধ ঢালিয়া দিতেছে। তপন খাইতে খাইতে হাসিয়া ফেলাতে অধেক দুধ মাটিতে পড়িয়া গেল। সুধা সরোষে ভ্রূভঙ্গী করিল, কিন্তু রাগ তাহার আসে না যে! সেও হাসিয়া ফেলিল।

আবার পট-পরিবর্ত্তন। সুধা নয়ানজোড় হইতে হাঁটিয়া রতনজোড়ে যাইতে যাইতে ঘন মেঘ করিয়া চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুধা অজানা পথে বিপথে চলিয়াছে, অন্ধকারে পথের মাঝখানে ত দাঁড়াইয়া থাকা যায় না! কে যেন গানের সুরের ভিতর সুধার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। এত তাহার পরিচিত কণ্ঠ। ঐ ত তপন। সে বলিতেছে, "সুধা, তোমার এত ভয়!"

মনের ভিতর এই সকল মনগড়া গল্প জমা হইতে হইতে কতক সে ভুলিয়া যাইত, কতক বার বার দেখা দিয়া যেন সত্য হইয়া উঠিয়া সমস্ত জীবনটা মধুর রসে ভরিয়া তুলিত। আপনি আপনার আনন্দ-নিকেতন গড়িয়া সে তাহার ভিতর সুখে বিচরণ করিত। কিন্তু জীবনের সমস্তটাই ত স্বপ্ন নয়, অর্ধজাগ্রত মুহূর্তের মালাও নয়। এই স্বপ্নাবেশ চোখ হইতে কাটিয়া গেলে প্রকৃত মানুষটাকে কাছে দেখিতে, বন্ধু বলিয়া জানিতে যে দুরন্ত আগ্রহ তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত, তাহাকে সে সহজে সামলাইতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃতি তাহার শান্ত বলিয়া বাহিরে কোন প্রকাশ ছিল না।

তাহার মনে পড়িত শৈশবে-দেখা তাহার মাসিমা সুরধুনীর কথা। মাসীমার স্মৃতির সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে শোনা যে সব ছিন্নসূত্র গল্প ও বেদনার সুর তাহার মনের ভিতর এখনও জড়াইয়া আছে, তাহাতে মনে হইত যেন আপনাকে সে অনেকখানি সুরধুনীর সঙ্গেই মিলাইতে পারিতেছে। শৈশবে যে-সুরধুনীর দুঃখের কথা সে বুঝিতে পারিত না, কিন্তু যাঁহার ঐকান্তিকতার সুর, যাঁহার তন্ময়তার ছবি তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সুরধুনী এতদিন পরে তাহার হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতেন, ছিন্নসূত্র সে সকল কাহিনী,

গভীর মনোবেদনার সে ইতিহাস, আত্ম-বিলোপী সে অনুরাগ যে কেমন ছিল, সুধা তাহা আপনি গড়িয়া লইতে পারিত।

মনে পড়িত মিলিদিদির কথা। মিলিদিদি তাহার এত বিলাস আরাম ছাড়িয়া যোগিনী বেশে যে কোন্ দূরদেশে চলিয়া গেল, সে কি তাহার মত এই গভীর অনুরাগের জন্য? একবার মনে হয় তাহার মত এমন করিয়া উচ্চাসনে প্রিয়কে বসাইবার ক্ষমতা মিলিদিদির নাই, আবার মনে হয় মিলিদিদির মত এমন করিয়া সব ভাসাইয়া যাইবার ক্ষমতা বোধ হয় সুধার নাই।

অনুরাগের ঐশ্বর্যে মিলি বড় কি সুধা বড়, কি তাহার মাসিমা সুরধুনীই বড় ছিলেন, ভাবিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; এই তিন জনের অনুরাগ একই পর্যায়ের কিনা তাহাও সুধা সাহস করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে এ সকল কথা বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসিত।

মনে পড়িত তাহাদের স্কুলে মনীষা ও স্নেহলতার তর্কের বিষয়। সেদিন সে ইহাদের তর্কে ঠিক কোন্ স্থানটি লইবে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু আজ তাহার মন যেন স্নেহলতার দিকেই ঝুঁকিতেছে। বিবাহের আদর্শে প্রেম আগে কি বিবাহ আগে এ সব বড় কথা লইয়া তর্ক করিতে সে পারিবে না। কিন্তু বিবাহের আগে হউক আর পরেই হউক, ওই একনিষ্ঠ প্রেমের অঞ্জলি পাইবার অধিকার যে প্রত্যেক নারীর জন্মস্বত্ব সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শিশু যেমন শিশুরূপে মার মনের নিঃস্বার্থ অনাবিল স্নেহ-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার অধিকার লইয়াই জন্মায়, তেমনি তরুণ জীবনের প্রথম প্রভাতে কোন একজন পুরুষের নবজাগ্রত-পূত প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য পাইবার অধিকার লইয়াই প্রত্যেক নারী জন্মায়। বিধাতা কি সুধাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন?

সুধা নারী-মাধুর্যের প্রতিরূপ নয় সত্য; কিন্তু তবু তাহার ইচ্ছা করে তাহাকে দেখিয়া নারী-মাধুর্যের ও নারী-মহিমার প্রথম পরিচয়ে বিশেষ একজনের উন্মেষিত নবীন যৌবন বিস্ময়ে ও পুলক-হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া উঠুক; সেই একজন নারীহৃদয়ের অক্ষয় সৌন্দর্য নির্ঝরের উৎস খুঁজিতে ও সেই সৌন্দর্যধারায় আপন অনন্ত তৃষ্ণা মিটাইতে বিশ্বসংসার ভুলিয়া অন্ধ

আবেগে তাহারই দিকে ছুটিয়া আসুক। জীবনে একবার অন্তত এই আনন্দরসটুকু আস্বাদ করিবার অধিকার তাহার আছে।

বিবাহের কথা, প্রেমের কথা কোনদিন সে ভাবে নাই। কিন্তু ভাবিবার আগেই আপনার অজ্ঞাতে তাহার মন যে সূর্যমুখী ফুলের মত বিশেষ একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না জীবনে ইহা তাহাকে কোন্ সমস্যার সম্মুখে আনিয়া ফেলিবে। জানি না আনন্দের অধিকার তাহার পূর্ণ হইবে, কি সমস্যার ঘূর্ণিপাকে জীবনযাত্রা সঙ্কটময় হইয়া উঠিবে।

তপন সুন্দর, দেবমূর্তির মত অপূর্ব সুন্দর। সুধা ত সুন্দর নয়, পৃথিবীর মাপকাঠিতে সে ঐ স্তরে পৌছিবার অধিকার লইয়া আসে নাই। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য কি শুধু তাহার দেহে থাকে, দ্রষ্টার চোখেই যে তাহার অর্ধেক অধিষ্ঠান! নহিলে এই সুধাকেই হৈমন্তী একদিন এত সুন্দর কি করিয়া ভাবিয়াছিল? শিশুর অসহায় কচিমুখে জননী যে-রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যান, সে-রূপ কি শুধু শিশুর মুখের না সে জননীর স্নেহবিগলিত হৃদয়ের যৌগিক রসায়নে সৃষ্ট? নারীর নিষ্কলঙ্ক প্রেমের যে অম্লান দীপ্তি, মুগ্ধ প্রেমিকের দৃষ্টির স্পর্শমণিতে তাহাই ত নিমেষে শ্যামা ধরণার সামান্যা মেয়েটিকে উর্বশী করিয়া তোলে। সে রূপ জগতের সকলের চক্ষে ধরা দিবার জন্য নয়। সে শুধু তাহারই হৃদয়দেবতার আরাধনার পুষ্পাঞ্জলি। কৃষ্ণচূড়ার রক্তস্তবকের মত পথের ধারে গাছ আলো করিয়া ফুটে নাই বলিয়া কি ক্ষুদ্র যূথিকার রূপ নাই? শ্যামপত্রের অন্তরালে মধু ও গন্ধে বুক ভরিয়া অমল শোভাতে যে লুকাইয়া জলিতেছে, তাহার রূপের মূল্য বুঝিতে গুণীজনের প্রয়োজন আছে।

সে যে নিজের মনের কাছে নিজের হইয়া ওকালতি করিতেছে, ইহা মনে করিয়া সুধা লজ্জা পাইত, আপনাকে ধিক্কার দিত, আবার কাজের মাঝখানে গভীরভাবে ডুবিবার চেষ্টা করিত। তাহার কলেজের পড়া, গৃহসংসারের সেবা, চারতলার স্কুলের শিক্ষকতা—সবগুলিকে আবার দ্বিগুণ আগ্রহে চাপিয়া ধরিত।

২৩

যেদিন হৈমন্তী ও সুধা তপনের ইস্কুল দেখিতে যায়, সেই দিনই তাহারা সুরেশের নিকট খবর পাইয়াছিল যে মিলি তাহার জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছ। রেঙ্গুনে তাহার পিসিমা তাহাকে বছর তিনেক ধরিয়া জর্জেটের শাড়ী, হাতকাটা জম্পার ও বুক পর্যন্ত লম্বা দুল পরাইয়া, গালে রুজ, ঠোঁটে লিপষ্টিক দিয়া, দুই কানের উপর দুই খোঁপা বাঁধিয়া, কখনও বা জোড়া বিনুনি দুলাইয়া তাহার পূর্বতন ফ্যাসান-প্রিয়তাকে ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে কিছুই যে তিনি সমর্থ হন নাই তাহা নহে। প্রথম প্রথম আপত্তির সহিত এই সমস্ত প্রসাধন সহ্য করিলেও শেষে মিলি ইহাতে সানন্দেই মন দিত। কিন্তু যে-মন লোকসমক্ষে প্রসাধনের ক্ষুদ্র আনন্দে গভীর দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিত, সেই মনই লোকের চোখের আড়ালে আপনার অতীত আনন্দ ও বর্তমান দুঃখকে লইয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল বুনিত ও দিনের পর দিন গুনিয়া চলিত। পিসিমা যখন সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত কোন ব্যারিস্টার কিংবা বিলাত-না-যাওয়া কোন ধনকুবেরের সঙ্গে মিলির আলাপ করাইয়া দিতেন তখনই মিলি কেমন শামুকের মত তাহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের খোলার ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। গান গাহিতে বলিলে সে পদ ভুলিয়া যাইত, বাজনা বাজাইতে বলিলে তাহার হাত ব্যথা করিত এবং সকল বিষয়েই পিসিমার কন্যাকে সে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত।

দেখিতে দেখিতে মিলির বয়স প্রায় বাইশ হইল, কিন্তু রেঙ্গুনে তাহার বিবাহ হইবার কোনও আশা দেখা গেল না। পালিত-গৃহিণী মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেমন করিয়াই হউক মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। বেশী ভাল করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত মেয়ের যদি মোটে বিবাহই না হয়, তখন ও-মেয়ের দশা কি হইবে? তিনি তলে তলে খোঁজ লইতে লাগিলেন সুরেশ কিছু কাজকর্ম করে কিনা। শোনা গেল, সে একটা আপিসে একশত

টাকা মাহিনায় কাজে ঢুকিয়াছে। অন্য ছোটখাট কাজও কিছু কিছু করিবার চেষ্টা করে। গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত পালিত-গৃহিণী বলিলেন; "মেয়েটার অদৃষ্টে এই লেখা ছিল!"

দেবরের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে মিনিকে দেশে আনাইয়া সুরেশের সহিতই বিবাহ দিবেন। কিন্তু নরেশ্বর গেলেন ক্ষেপিয়া। তিনি বলিলেন, "আমি চললাম এদেশ ছেড়ে। তোমাদের যা খুশী তোমরা করগে যাও।"

রণেন্দ্র বলিলেন, "দাদা ভুলে যান যে তিনি যেমন জেদী, তাঁর মেয়েটিও ঠিক তেমনি হতে পারে। ওর কপালে টাকা নেই তুমি ত বলছই। এই বেলা বিয়ে দিয়ে দাও, তবু স্বামী ভদ্রলোক হবে, সে একটা সান্ত্বনা।"

মিনি আসিয়াছে। তাহার পিতা পলাতক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহা ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন লাগিয়া গিয়াছে। পালিত-গৃহিণী প্রথম শুভদিনেই বিবাহ দিবেন। আর একদিনও অকারণ নষ্ট করিবেন না। বাড়ীতে সকল জাতীয় কর্মীরই খুব প্রয়োজন। কাজেই মিনি ও হৈমন্তীর যত বন্ধুবান্ধব আছে সকলেরই সর্বক্ষণ আনাগোনা চলিতেছে। মেয়েরা দূরে থাকে, গাড়ী না পাইলে তাহাদের আসা শক্ত, সুতরাং তাহাদের চেয়ে ছেলেদেরই বেশী দেখা যায়। তপন, নিখিল, মহেন্দ্র প্রত্যহ দুই বেলাই আসে। আসবাব, খাবার, ফরাস, চেয়ার, আলো, পাখা, চিঠি, কবিতা, কত রকমের জিনিসের যে ঐ একদিনের ব্যাপারের জন্য প্রয়োজন তাহার ঠিক নাই। কাপড়-গহনাটা মেয়েদের এলাকায় পড়ে, কাজেই হৈমন্তী ও সুধা তাহার ভার লইয়াছে। আর বাকি সব কাজই ছেলেদের। চিঠির কাজটায় ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া মেয়েদেরও দলে লইয়াছে। নিখিল বলে, "মেয়েদেরই হাতের লেখা ভাল। তাঁরা যদি চিঠির ঠিকানা লিখে দেন, তাহ'লে আমরা চিঠি ভাঁজ ক'রে পুরবার ভার নিতে পারি।"

হৈমন্তীর এরকম কার্য-বিভাগে আপত্তি। সে বলে, "তার মানে আপনারা শক্ত কাজগুলো আমাদের দিয়ে করিয়ে, নিজেরা খালি একটু হাত নাড়বেন।"

মহেন্দ্র বলিল, "তা নয়! পৃথিবীতে কাজ পুরুষেই করে। মেয়েরা কেবল একটু মিষ্টি কথা ব'লে তাদের মনটা খুশী রাখে।"

মিলি বলিল, "শুধু মিষ্টি কথা বলার ভার নিয়ে যদি সংসারে আমরা একবার বেরোই, তা'হলে পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার মত দু-দিনে পুরুষজাতি সব স্ত্রীলোকের মাথা কেটে রেখে দেবে।"

নিখিল বলিল, "বাপ রে, বিয়ের কনে হয়ে আপনি পুরুষজাতির নামে এমন কথা বলছেন! আপনার চক্ষে কোন মোহের অঞ্জন আছে ব'লে ত মনে হচ্ছে না।"

মিলি বলিল, "আছে ব'লেই ত জেনেশুনেও এমন পাগলামি করছি। ভাল মন্দ সব জেনেও মানুষের নিজের সম্বন্ধে সর্বদাই মনে কতকগুলো দুরাশা থাকে।"

নিখিল বলিল, "আচ্ছা, ভাগাভাগি করলে হয় না? আমরা যতক্ষণ কাজ করব ততক্ষণ আপনারা মিষ্টি কথা বলবেন অর্থাৎ গান করবেন, এবং আপনারা যতক্ষণ কাজ করবেন ততক্ষন আমরা আমাদের সাধ্যমত মিষ্টি কথা বলব।"

হৈমন্তী হাত জোড় করিয়া বলিল "দোহাই নিখিলদা, আপনি ওকাজের ভার নেবেন না, তাহ'লে আমাদের সব ঠিকানা ভুল হয়ে যাবে।"

নিখিল বলিল, "আমি বুঝতে পেরেছি, তপন ছাড়া আর কারুর গান এ সভায় মঞ্জুর নয়।"

তপন লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "না, না, তা কেন? আপনার গানই আজ সকলের আগে শোনা হবে।"

সুধাও ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সত্যি হৈমন্তী, এ তোমার অন্যায়। ওঁর অমন সুন্দর গলা, কেন তুমি ওঁকে যা তা বলছ? আপনাকে আজ গান করতেই হবে দেখুন। আপনি গান না করলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।"

তপনের অনুরোধ নিখিল বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে আনে নাই, কিন্তু সুধার অনুরোধে সে আনন্দে ও লজ্জায় একটু যেন বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলিয়া সুধাও ঘামিয়া উঠিবার যোগাড়। কিন্তু যখন একটা অনুরোধের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, তখন মাঝপথে ত থামিয়া যাওয়া যায় না? নিখিল একতাড়া চিঠি লইয়া সতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া লাল কালিতে কলম ডুবাইয়া মহা উৎসাহে ঠিকানা লিখিতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া সুধা আবার বলিল, "ও কি, এখন ত আপনার

ঠিকানা লেখার পালা নয়, আপনাকে এখন গান শোনাতে হবে। চিঠির তাড়াটা আমায় দিন দেখি।"

নিখিল সুধাকে এমন জোরজবরদস্তি করিতে কখনও দেখে নাই, সে কতকটা নিরুপায় হইয়া কতকটা খুশী হইয়াই কলমটা নামাইয়া রাখিল। বলিল, "আমি ত ভাল গান কিছুই জানি না। কি গাইব বলুন।"

সুধা বলিল, আপনি ত সত্যেন দত্তর খুব ভক্ত, তাঁর একটা গান করুন না।"

নিখিলের গলাটা ছিল ভালই, কিন্তু তাহার একটা অপবাদ বন্ধুসমাজে ছিল যে, সে কখনও সঙ্গীত রচয়িতার সুরের শাসন মানিত না। সকল গানের সুরই নাকি তাহার স্বরচিত। এই জন্যই তাহার গান বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টার বিষয় ছিল। কিন্তু আজ সুধাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া সে গান ধরিল,

(হায়) তোমার আমি কেউ নহি গো,
সকল তুমি মোর।
(আজ) চাইলে তোমায় পাই যে কাছে
নাই যে তেমন জোর।
(ওগো) হৃদয় তবু হাহাকারে
(কেন) কেবল ডাকে হায় তোমারে,
(আমার) আকুল আঁখি তোমায় খোঁজে
খোঁজে আঁখির লোর।
(এই) ভুবন-ভরা শূন্যতা আর সইতে পারি নে,
অন্ধ-করা অন্ধকারের অন্ত হেরি নে,
(আমি) সকল বেলা কেবল ভাবি
কোথাও কিছু নাইক দাবী,
(হায়) বিনি সুতার মালা মোদের
(মাঝে) নাই রে বাঁধন ডোর।"

সুধা ও হৈমন্তী একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার গানটা!"

নিখিল বলিল, কবির চোখের দৃষ্টি যাবার উপক্রম হওয়ার সময় এ গানটা লিখেছেন শুনেছি।"

মহেন্দ্র বলিল, "কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি যেন,

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে,
স্বরের ভিতর লুকাইয়া কহ তাহারে।"

মিলি বলিল, "যদি তাই হয়, তাতে আপনার কি? মানুষকে অকারণে খোঁচা দিতে আপনার এত ভাল লাগে কেন?"

মহেন্দ্র ও নিখিল একসঙ্গেই লাল হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার ভিতরেই বলিল, "আপনার এলাকায় খোঁচাটা একটু লেগেছে ব'লে বুঝি আপনার এত রাগ?"

তপন বলিল, "ওহে মহেন্দ্র, শুভদিনে মূর্তিমান নারদের মত তুমি যত তিক্ত রসের আমদানি করছ কেন বল দেখি?"

মহেন্দ্র বলিল, "আমার দুরদৃষ্ট! আমি যা বলি তাই তোমাদের কানে তেতো শোনায়। একজন গণৎকার আমার হাত দে'খে বলেছিল যে আমি মানুষের মনোহরণ-বিদ্যায় খুব পারদর্শী হব। এটা বোধ হয় তারই প্রথম ধাপ।"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

পালিত-গৃহিণী খেরো-বাঁধানো একটা লাল খাতা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "ওরে, আজ যে গয়না-কাপড় আনতে যাবার দিন, তোরা চিঠি-পত্রগুলো খানিক সেরে একবার বেরুবি?"

মিলি নাকিস্বরে বলিল, "আমি যেতে পারব না মা।"

মা বলিলেন, "তোর কি সব তাতে অনাছিষ্টি কাণ্ড! আজকাল ত সবাই যায় বাপু। নিজের জিনিস নিজে পছন্দ ক'রে নিতে দোষ কি?"

হৈমন্তী বলিল, "তুমি বলছ বটে জ্যাঠাইমা, কিন্তু জ্যাঠামশায় ত এখনও তোমার কথায় সায় দিলেন না।"

পালিত-গৃহিণী বলিলেন, "থাক্, থাক্, তোকে আর পাকামি করতে হবে না। তুইই-না হয় যা, ওর গয়না ক'টা উদ্ধার ক'রে নিয়ে আয়।"

হৈমন্তী বলিল, আচ্ছা, তাই না-হয় যাচ্ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে কে যাবে?"

ছেলেরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। নিখিল বলিল, "যাকে আপনি হুকুম করবেন। আমরা সবাই রাজি আছি, কিন্তু যাকে আপনি না নিয়ে যাবেন সেই কাল থেকে কাজে আসা বন্ধ করবে।"

হৈমন্তী বিপদগ্রস্ত মুখ করিয়া বলিল, "তাহ'লে ত সকলকে নিয়ে যেতে হয় দেখছি। সেই ভাল, এখানকার কাজকর্ম ফে'লে সবাই যাওয়া যাক দিদির গয়না আনতে।"

সুধা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমি ভাই থাকছি। আমার দ্বারা যতটা হয় কাজ এগিয়ে রাখব।"

নিখিল বলিল, "আমি প্রথম আপনাকে সমস্যায় ফেলেছিলাম, আমিও থাকছি।"

হৈমন্তী ভীত মুখ করিয়া বলিল, "আস্তে আস্তে সবাই থেকে যেও না, আমি কি শেষে একলাই যাব?"

তপন ও মহেন্দ্র তখনও 'না' বলে নাই, সুতরাং তাহারাই দুইজনে যাইবে ঠিক হইল।

তপন চলিয়া গেল, হৈমন্তীও চলিয়া গেল। সুধার ইচ্ছা করিতেছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সে যে কাজ করিবে কথা দিয়াছে, এখন ত আর কথা ফিরানো যায় না। জোর করিয়া খুশী মুখ করিয়া সে কাগজকলম কালি লইয়া বসিল। দলের অর্ধেক মানুষ উঠিয়া যাওয়াতে মিলিকেও একটু ম্লান দেখাইতেছিল। একমাত্র খুশী দেখা গেল নিখিলকেই। সে আবার একতাড়া খাম লইয়া কলম চালাইতে চালাইতে বলিল, "দিদি ত উমার তপস্যায় মগ্ন, আর সবাই মহোৎসাহে দিল দৌড়, ভাগ্যিস্ আপনি রইলেন, না'হলে আমি বেচারা একলা মাঠে মারা যেতাম।"

সুধা বলিল, "এমন উৎসব-আয়োজনের ঘটাকে আপনি মাঠ বলেন!" কিন্তু মনে মনে তাহারও উৎসব-গৃহকে আজ শূন্য মাঠ বলিয়া মনে হইতেছিল। হৈমন্তীদের বাড়ীর উৎসব এই কয়দিন ধরিয়া তাহারও নিকট যে উৎসব-সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল তাহা ত এই বাহিরের আয়োজন দেখিয়া নয়। তাহার মনে যে একটা উৎসবের পর্ব আসিয়াছে। এ-বাড়ীতে এই কয়দিন যতবার আসিয়াছে ততবারই তপনের দেখা মিলিয়াছে, তপনের সঙ্গে বসিয়া কাজ করিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়াছে, ইহাই ত উৎসব-সমারোহ!

গামলার ভিতর জল ঢালিয়া কিসমিস ভিজাইয়া তাহারা সকলে মিলিয়া কিসমিস বাছিয়া ডালায় তুলিত, তোলা রূপার বাসন বাহির করিয়া সকলে

পালিশ করিত। তপনের পালিশ সকলের চেয়ে ভাল হইত, কারণ তাহার হাতখাটানো অভ্যাস আছে। কিন্তু বাকি আর সকলের চেয়ে সুধার কাজ হইত ভাল, ইহা ছিল সুধার একটা মস্ত আনন্দের বিষয়। অন্যদের হারানোর আনন্দের চেয়ে বেশী আনন্দ ছিল তাহার তপনের প্রায় সমকক্ষ হওয়ার আনন্দ। তপন বলিত, "আমার চেয়ে আপনারই কাজ ভাল।"

অবশ্য, সুধা তাহা স্বীকার করিত না। খামের ঠিকানা লিখিতে গিয়াও দেখা গেল সুধা ও তপনের হস্তাক্ষরই সর্বশ্রেষ্ঠ। নিখিল বলিত, "তোমরা আমাদের সব বিষয়ে হারাবে ঠিক করেছ?"

এই যে দুইজনকে একসঙ্গে 'তোমরা' বলিয়া উল্লেখ করা ইহাতে সুধার মনে পুলকের শিহরণ খেলিয়া যাইত। যে কোন কারণেই হউক না কেন, তাহারা দুই-এক জায়গায় এক পর্যায়ের ত মানুষ? এই একজাতীয়তা যদি তাহাদের সর্বত্র হইত!

সুধা আত্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আপনার কথার উত্তরের অপেক্ষাও করে নাই। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল নিখিলের কথায়। নিখিল বলিতেছে, "আপনি যেখানে আছেন তাকে আর মাঠ বলি কি ক'রে? সে ত মালঞ্চ?"

সুধা বলিল, "আপনি সব কথাতে ঠাট্টা করেন।"

নিখিল বলিল, "মহেন্দ্রের মত আমারও কপাল খারাপ। সে যা বলে সবাই তাতে চ'টে যায়; আমি যা বলি সবই আপনাদের কানে ঠাট্টা শোনায়।"

সুধা বলিল, "সেটা মোটেই আপনার ঠিক ধারণা নয়। আমাদের এই দলের মধ্যে একমাত্র আপনিই ত ভাল ক'রে কথা বলতে পারেন। আমি ত না জানি চটাতে, না জানি হাসাতে, না জানি খুশী করতে।

নিখিল বলিল, "তার চাইতেও ভাল হয়ত কিছু জানেন, সেটা যে কি আপনার নিজের ধরবার ক্ষমতা নেই!"

সুধা বলিল, "আচ্ছা অত ক'রে আর মানুষকে বাড়াবেন না। যেটা আমার যোগ্য নিন্দা সেটা মেনে নিলে কিছু অভদ্রতা হয় না।"

নিখিল বলিল, "আমি হয় ঠাট্টা করি, নয় ভদ্রতা করি, এরকম একটা ধারণা আপনার কেন হয়েছে বলুন ত? এই দুটোর মাঝামাঝি সত্য কথা ব'লে যে একটা জিনিস আছে, সেটা কি আমার মধ্যে একেবারেই খুঁজে পাওয়া যায় না?"

সুধা চুপ করিয়াই রহিল, মনে করিয়াছিল বলে, "আমি সামান্য মানুষ, আমার সম্বন্ধে এরকম সত্য কথা বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।" কিন্তু কথা আর বাড়াইয়া লাভ কি, মনে করিয়া সেইখানেই থামিয়া গেল।

তাহার মন তখন ঘুরিতেছিল অন্য চিন্তায়। আজ মিলির বিবাহ, কিছুদিন পরে তাহাদেরও ত পালা আসিবে? এমনই ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ হইবে কি? সেই বিবাহ-উৎসবে এমনই প্রত্যহ কি তপনকে দেখা যাইবে? সুধা আপন মনেই হাসিল। কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে সে কথা না ভাবিয়া উৎসব-গৃহে প্রত্যহ তপন আসিবে কি না এইটা তাহার মাথায় ঢুকিল আগে! সে পাগল। আপনার মনের কাছে আপনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া একবার যেন ভয়ে ভয়ে ভাবিল,—আচ্ছা, তপন বর হইলে কেমন হয়? মনে পড়িল, দিন কয়েক আগে রাত্রে সে নিজের বিবাহের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কিন্তু বরের মুখটা কিছুতেই দেখিতে পায় নাই। তাহার মুখটা মুসলমান বরের মত ঝালর দিয়া ঢাকা ছিল। সুধা সাহস করিয়া তুলিয়া দেখিতে পারে নাই। যদি তুলিয়া দেখিত, তপন!

কিন্তু তাহা কি সম্ভব! তপন যে মস্ত বড়লোকের ছেলে। তাহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন কেহ ত সুধাকে চেনেন না। সুধার মত গরীবের কালো মেয়েকে অকস্মাৎ তাহারা কেন বউ করিয়া লইয়া যাইবেন? তাহাদের কাহারও কল্পনায়ই ইহা আসিবে না। এই বিবাহ-উৎসবের আগে স্পষ্ট করিয়া তপনের সহিত বিবাহের কথা সুধা কোন দিন ভাবে নাই। আজ তাহা ভাবিয়া দেখিতে মনটা ভয়ে ভাঙিয়া পড়িল। যদি তপনের আর কাহারও সঙ্গে বিবাহ হইয়া যায়! তবে তপন ত একেবারে পর হইয়া যাইবে। সুধা কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে! চোখ বুজিয়া সুধা এই চিন্তাটাকে মন হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিল। না, না, তপন বিবাহ করিবে না। সে এমনই করিয়া গরীব-দুঃখীর সেবা করিয়া দেশের হিতচিন্তা করিয়া দিন কাটাইবে। সপ্তাহ-অন্তে একবার তাহাদের বন্ধুসভায় দেখা যাইবে তাহার প্রসন্ন মুখের ধ্যানমগ্নভাব। সুধা তাহাতেই খুশী থাকিবে।

নিখিল বলিতেছে, "আপনি বড় কম কথা বলেন। আপনার সঙ্গে গল্প জমানো যায় না।"

সুধা কাগজের পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "হুঁ।"

মিলি বাহিরে গিয়াছিল জামার মাপ দিতে। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল
"আমাকেও এক তাড়া খাম দাও, আমারও কিছু কাজ করা উচিত।"

তিন জনেই নীরবে কলম চালাইতে লাগিল।

গহনার দোকানে নামিয়া গহনার বাক্সগুলি খুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া হৈমন্তী একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। মহেন্দ্র বলিল, "তুমি কবিতা পড়, লুকিয়ে লেখও কিছু কিছু, এই ত জানতাম। গহনার যে তুমি এত ভক্ত তা ত জানতাম না। বাহিরে যে যেমনই দেখাক, স্ত্রীলোকেরা এক জায়গায় সব এক রকম। শুধু গহনার গল্প ক'রে আর গহনা দেখেই তারা এক যুগ কাটিয়ে দিতে পারে।"

হৈমন্তী সে কথায় কান না দিয়া একটা মস্ত সরস্বতী-হার দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "মহেন্দ্রদা, isn't it a beauty ?" হারের দিকে তিন-চার মিনিট সে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

মহেন্দ্র বলিল, "সুন্দর বটে, তবে তোমার চোখ দিয়ে ত আমি দেখতে পাই না। জানি না তোমরা এক তাল সোনা কি এক সার মুক্তোর ভিতর কি খুঁজে পাও।

হৈমন্তী বলিল, "Work of art তারিফ করতে হ'লে মনটাকে তেমনি ক'রে তৈরি করতে হয়। আগে থেকেই গহনার প্রশংসায় স্ত্রীজনোচিত দুর্বলতা আছে মনে ক'রে চোখ বুজে থাকলে দেখতে পাবেন কি ক'রে?"

মহেন্দ্র বলিল, "তোমার এই হারটা ভয়ানক ভাল লেগেচে দেখছি, পেলে একটা নাও?"

হৈমন্তী বলিল, "নিশ্চয়, একশ বার নিই।"

মহেন্দ্র একটু মিষ্ট হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখি আমি একটা দিতে পারি কি না।"

হৈমন্তী মুখটা লাল করিয়া বলিল, "থাক্, আপনাকে আর আমায় সরস্বতী-হার দিতে হবে না।"

গহনা লইয়া তর্কবিতর্কে তপন বিশেষ যোগ দিতে পারিতেছিল না। বাক্সগুলা গাড়ীতে তুলিয়া সে বলিল, "আমার ইস্কুলে জন-কতক বাইরের লোককে দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু বলাব ঠিক করেছি। আজ তাঁদের সঙ্গে

আমাকে একবার দেখা করতে হবে। আমি সে কাজটা সেরে রাত্রে খাবার সময় ঠিক এসে যথাস্থানে হাজির হব। আমাকে খানিকক্ষণের জন্যে মাপ করবেন।"

তপন গাড়ী ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়াই চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, গাড়ীটা যদি এক চক্কর গড়ের মাঠ দিয়ে ঘুরে যায়, তোমার আপত্তি আছে?"

হৈমন্তী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "না, আপত্তি ঠিক নেই, কিন্তু প্রয়োজন কি?"

মহেন্দ্র যেন একটু রাগিয়াই বলিল, "প্রয়োজন আমার এই মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করা। তোমরা ত আমাকে নারদ মুনি ব'লে নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমার ঘাড় থেকে তিক্ত রসের বোঝাটা নামাতে ত কাউকে একটু চেষ্টা করতে দেখলাম না।"

হৈমন্তী অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলিল, "আমি কি করব বলুন না মহেন্দ্রদা, আমি ত কোন অন্যায় জেনেশুনে করি নি।"

মহেন্দ্র হৈমন্তীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "অন্যায় কর নি বটে, কিন্তু ন্যায়ই বা কি করেছ? আমি যে একটা মানুষ পৃথিবীতে আছি, তোমাদের দরজায় রোজ এসে ঘুরছি, তা তোমরা কি একবার দেখতেও পাও না? কবিতা প'ড়ে এই বুঝি মানুষের মন বুঝতে শিখেছ?"

হৈমন্তী চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র জোর দিয়া বলিল, "বল না, তোমারও কি আমাকে একটা ঝগড়ুটে তার্কিক ছাড়া আর কিছু মনে হয় না? আমি ত তোমাকে কত দিন ধ'রে পড়িয়েছি, কত কাছে থেকে তুমি আমায় দেখেছ, তখন কি আমি কেবল ঝগড়াই করতাম? তার চেয়ে ভাল কোন গুণ তুমিও কি আমার মধ্যে দেখ নি?"

হৈমন্তী সহাস্যে বলিল, "ও কি কথা মহেন্দ্রদা, আপনি আমাকে কত যত্ন ক'রে মেঘদূত পড়িয়েছিলেন, কত ভাল ভাল কন্টিনেণ্টাল বই এনে দিয়েছেন আমি তা একদিনের জন্যেও ভুলি নি।"

মহেন্দ্র হৈমন্তীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "দেখ, আমি ভূমিকা ক'রে কথা বলতে জানি না। তুমি ত জানই, আমি অসহিষ্ণু মানুষ। তা ছাড়া আমার ব'সে ব'সে দিন গোন্‌বার সময়ও নেই। এই বছরই আমি জার্মানীতে

পড়তে চ'লে যাব ঠিক হয়েছে। তার আগে আমি আমার অদৃষ্টটা জেনে নিতে চাই। তুমি কি সে কাজে আমায় একটু সাহায্য করবে?"

হৈমন্তী চুপ করিয়াই রহিল। মহেন্দ্র বলিল, "মনে ক'রো না আমার মধ্যে আনন্দ দেবার কোন ক্ষমতাই নেই। এই তেতো খোলার আড়ালে মধুর রসও কিছু আছে। যে দয়া ক'রে কাছে আসবে তাকে সুখী করতে পারব ব'লে মনে মনে একটা অহঙ্কার আছে। তুমি আমাকে সে সুযোগ একবার দিয়ে দেখবে কি হৈমন্তী?"

পথের ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছের সারির দিকে হৈমন্তী নিস্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া ছিল। দক্ষিণ সমীরণ লাল ফুলের তোড়া আর সবুজ পাতার রাশির ভিতর মাতামাতি লাগাইয়াছিল। তাহারও ভিতর থামিয়া উঠিয়া হৈমন্তী বলিল, "মহেন্দ্রদা, এককথায় জবাব আমি দিতে পারব না। আপনাকে আমি পরে বলব।"

মহেন্দ্র বলিল, "অন্ধ। তোমরা অন্ধ। পরে বলবার কি আছে এতে? আমাকে কি তুমি এত দিন ধ'রে দেখ নি? আমার ভিতর কোন যোগ্যতা খুঁজে পাওনি? আরও কি বাজিয়ে দেখতে চাও? বিশ্বাস কর, আমার কাছে তুমি যা চাইবে আমি বিনাবাক্যে তা ক'রে যেতে পারব। আমাকে সন্দেহ করবার তোমার কোন কারণ নাই। যদি এতদিনে না বুঝে থাক, আজ একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে।"

হৈমন্তী বলিল, "মহেন্দ্রদা, আপনি রাগ করবেন না। কিন্তু সব মানুষের সময় একসঙ্গে আসে না। তাই ব'লে তার দ্বারা আর একজনের অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না। আমরা অন্ধ বইকি অনেক দিকে। কিন্তু সে অন্ধতার মায়া কাটিয়ে ওঠবার ক্ষমতাও যে আমাদের নেই।"

মহেন্দ্র বলিল, "সময় যদি না এসে থাকে, আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করব। দুঃখ অনেক সয়েছি, না-হয় আর কিছুদিন সইব। আমার অযোগ্যতার প্রমাণ যদি না পেয়ে থাক, তবে যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয় কেন মনে করছ না? কেন তোমার অন্ধতাকেই দুই হাতে এমন ক'রে চেপে ধরে রাখতে চাইছ। ওই সুন্দর চোখ দুটির ভিতর দৃষ্টির এতটা অভাবই কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

হৈমন্তী বলিল, "সব কথারই কি সব সময় জবাব দিতে হবে, মহেন্দ্রদা?

আপনার যা শুনতে ভাল লাগবে, তা যখন বলতে পারছি না, তখন শুনতে খারাপ লাগবে এমন কথা না-হয় কিছু নাই বললাম।"

মহেন্দ্র ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি অদৃষ্টকে অত ভয় করি না হৈমন্তী। অপ্রিয় সত্যই যদি তোমার বলবার থাকে, তবে আমি তাই শুনতে চাই।"

হৈমন্তীর চোখে জল আসিয়া গেল। সে বলিল, "মহেন্দ্রদা, আপনি আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। আমাদের বন্ধুসভার এতদিনের ব্যবহারে, তারও আগে যখন আপনার ছাত্রী ছিলাম তখন, কোনওদিন কি অপ্রিয় কিছু বলতে আমায় উন্মুখ দেখেছেন? আপনাকে আমরা ঠাট্টা করি বটে, কিন্তু সে যে শত্রুর ঠাট্টা নয় তা কি আপনি বোঝেন না? মানুষের বন্ধুত্বের মূল্য সামান্য নয়, কিন্তু সখ্য যা তা সখ্য, তার চেয়ে বেশী সেক্ষেত্রে কিছু আশা করা চলে না। কেন যে কখন্ চলে না তা বলাও যায় না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তুমি যদি আমার সম্বন্ধে তোমার সখ্যকে স্বীকার কর, তবে সেই সখ্যের চেয়ে আর একটু উপরে ওঠা, তাকে আর একটু বড় ক'রে দেখা কি তোমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব?

হৈমন্তী বলিল, "মহেন্দ্রদা, আপনার হাতে ধ'রে বলছি, আপনি আমাকে আর তর্কে টানবেন না। মানুষ তর্কশাস্ত্র সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সে তাকে মেনে চলতে পারে না। ঐ দেখুন, আকাশে মেঘ ক'রে আসছে। প্রচণ্ড গরমের পর আজ বোধ হয় বৃষ্টি দেখা দেবে। আমাদের এখনই বাড়ী ফেরা উচিত, না হ'লে লোকে মনে করবে হয় আমরা ডাকাতের হাতে পড়েছি, নয় গাড়ী চাপা পড়েছি,।"

মহেন্দ্র তখনও আপন মনেই কথা বলিতে বলিতে চলিল। সে বলিল, "আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ। আমার সঙ্গে তোমার সখ্য, সেটা একটা কথার কথা মাত্র? আলাপী সবাইকেই ত লোকে বন্ধু বলে। কিন্তু তোমার মন চলেছে অন্য দিকে, না? তুমি কি জান যে আজ চার পাঁচ বৎসর ধ'রে এই চিন্তাই আমার মনে দিবারাত্রি অঙ্কুরের মত ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে? এত দিন বলবার অবস্থায় আসে নি, আজ দিন এসেছে মনে ক'রে তোমায় এ কথা বললাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তুমি তার ওজন একটুও বুঝতে পারলে না। মমতার একটু চিহ্নও তোমার মধ্যে দেখলাম না।"

হৈমন্তী বলিল, "আপনি বিশ্বাস করুন, মহেন্দ্রদা, আমি আপনাকে আঘাত দেবার জন্যে ইচ্ছা ক'রে কোন চেষ্টা করি নি। আপনি আর আমি সিঁড়ির ভিন্ন ভিন্ন ধাপে রয়েছি, কাজেই এ জিনিসকে এক ভাবে দে'খে এক উত্তর দেওয়া ত দু-জনের পক্ষে সম্ভব নয়?"

মহেন্দ্র বলিল, "এবারেও ত সেই একই উত্তর। তুমি আমার প্রশ্নের ত জবাব দিলে না।"

হৈমন্তী বলিল, "আজ আমাকে আর পীড়ন করবেন না, লক্ষ্মীটি। একদিন আমি উত্তর দেব, তবে কবে তা বলতে পারি না।"

মহেন্দ্রর কথা ফুরাইতে চাহিতেছিল না। সে বলিল, "তুমি কি জবাব দেবে আমি কি বুঝি নি, হৈমন্তী? আজ যে কঠিন কথাটা আমার মুখের উপর বলতে তোমার বাধছে, সেই কথাটাই একদিন হাল্কা ক'রে আমায় জানিয়ে দিতে চাও, তা আমি বুঝেছি। তোমরা কথা বলতে জান, নিষ্ঠুর আঘাতকেও নরম কথায় মুড়ে সামনে এনে ধরবে; কিন্তু আমি মূর্খ, আমার মনের শ্রেষ্ঠ কথাটাও তোমায় সাজিয়ে বলতে পারলাম কই? যা বলতে চেয়েছিলাম, মনে হচ্ছে তার কিছুই বলতে পারি নি, মনের যেখানটা তোমায় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমার দৃষ্টিই সেখানে আনতে পারলাম না। হয়ত আমারই মূর্খতায় তুমি আমার কিছুই বুঝলে না। হৈমন্তী, যদি জানতে কত কাল ধ'রে কত কথা এই বোবা মনের ভিতর জমা হয়ে মাথা খুঁড়ছে, তাহ'লে হয়ত এতখানি কঠিন হতে না।"

হৈমন্তী আর কথা বলিবার চেষ্টা করিল না। সে আরক্ত মুখ নত করিয়াই কোন রকমে মুহূর্তগুলা গুনিয়া সময় কাটাইতেছিল। মহেন্দ্রের প্রতি তাহার একটা টান ছিল, তাই নিজে মহেন্দ্রের কষ্টের কারণ হইতে তাহার মনে একটা অপরাধ বোধ হয় খোঁচা দিতেছিল।

বাড়ীতে নামিয়াই যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হৈমন্তী তাহার বেগুনফুলি রঙের মান্দ্রাজী শাড়ীর উপর কোমরে একটা ফরসা তোয়ালে জড়াইয়া রান্নঘর হইতে এক ট্রে খাবার ও সরবত আনিয়া বসিবার ঘরে হাজির করিল। মহেন্দ্রকে খাইতে ডাকিয়া কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। সে আজ গহনা বিষয়ে মস্ত বিশেষজ্ঞের মত মিলিকে নানা কথা বুঝাইতে বসিয়াছে।

নিখিল বলিল, "আমরা সেই কখন থেকে ব'সে ব'সে হাত চালাচ্ছি, আপনি এক গেলাস সরবত, দিতে পারলেন না, সবার আগে দিতে গেলেন মহেন্দ্রকে। সে ত প্রচুর হাওয়া খেয়ে এল এইমাত্র।"

মহেন্দ্র আজ ঠাট্টার জবাব দিল না। বাঙালীর গায়ের রঙে মুক্তা যে মানায় না এই বিষয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে সে মিলিকে বক্তৃতা শুনাইতে লাগিল। মিলি বলিল, "না মানায়, না মানাক্, আপনার বউকে না-হয় আপনি একটাও মুক্তো পরতে দেবেন না। আমরা কালো রঙেই প্রাণে যা সখ আছে প'রে নেব।"

হৈমন্তী একটা সরবতের গেলাস আনিয়া মহেন্দ্রর হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিল। মহেন্দ্র ফিরাইয়া দিতে যাইতেছিল, নিখিল বলিল, "আর ক'দিনই বা এত আদরযত্ন পাবে, এখন বেশী চাল দেখিও না। বেশ কাটছে এই দিনগুলো। একান্নবর্তী পরিবারের মত, রোজ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, কাজ, গল্পগাছা, ঝগড়াঝাঁটি সব নিয়ে জিনিসটা জমেছে ভাল। দুঃখ এই যে, দিন ফুরিয়ে এল।"

মহেন্দ্র এতক্ষণে ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল। "তুমি কার সঙ্গে একান্নে খেতে চাও বল না, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখব কিছু করা যায় কি না। পরোপকার কখনও করি নি, তোমরা মহৎ লোক, তোমাদের উপকার করলে আমারও পুণ্য হবে কিছু।"

মিলি বলিল, "আপনার হাতে অন্নচিন্তার ভার অর্পণ করতে ওঁর বিশেষ ভরসা নেই, নিজের চেষ্টা নিজেই না-হয় তিনি দেখুন।"

তপন আসিয়া সবে ঘরে দাঁড়াইয়াছে। মহেন্দ্র তাহার দিকে মুখ করিয়া বলিল, "আর তোমার মতলব কি হে তপন, অন্ন না নিরন্ন?"

তপন বলিল, "মতলব ত মানুষের কতই থাকে। কিন্তু অন্ন কি আর বিধাতা সকলের অদৃষ্টে লেখেন?"

মহেন্দ্র যেন মার খাইয়া পাল্টা মার দিবার জন্য উগ্র হইয়া বলিল, "আমাদের মত অভাজনদের অদৃষ্টে না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাগ্যবান পুরুষের অদৃষ্ট নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হবে। বিধাতার বিচারেও পক্ষপাত আছে।"

তপন বিস্মিত হইয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল,

সামান্য একটা ঠাট্টার কথায় মহেন্দ্রর এত চটিয়া উঠিবার কি কারণ হইল? সে যেন কি একটা গায়ের জ্বালা মিটাইবার জন্য একবার তপন ও একবার নিখিলকে ধরিয়া মাথা ঠুকিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। নিখিল তাহার কি করিয়াছে জানা নাই, কিন্তু তপন ত জ্ঞানত মহেন্দ্রর কোন অনিষ্ট করে নাই। তাহাদের কথা-কাটাকাটি প্রায়ই চলে বটে, কিন্তু একে ত তাহাতে তপনের দিক্‌টা হয় খুবই হাল্কা, তার উপর সে-সব তর্কের শিকড় ত একটুও গভীর বলিয়া কোনওদিন মনে হয় নাই। মহেন্দ্র যে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আসিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। তপন তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিল, "কি এমন হৃদয়বিদারক ব্যাপার এর মধ্যে ঘ'টে গেল যে নিজেকে একেবারে অভাজনের দলে চালিয়ে দিচ্ছ?"

মহেন্দ্র বলিল, "হৃদয় টৃদয় ওসব তোমাদের আছে, গরীব লোকের ওসব থাকে না।"

হৈমন্তী অকারণেই লাল হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। সুধা তাহা লক্ষ্য কবিয়া একটু ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রর কথাগুলি যে রুদ্ধ অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে সুধার দেরী হইল না। কেন সে এমন কথা বলিতেছে? তাহার মনে কি কোন নিরাশার বেদনা বিঁধিয়া আছে? অথবা হয়ত কোন আশাই তাহার মনে জাগিয়াছে যাহার পল্লবিত রূপ দেখিবার পূর্বে মনের সংশয়কে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সে পারিতেছে না। মহেন্দ্রর মত এমন প্রকৃতির মানুষেরও কি সুধার মত অবস্থা? সুধারই মত কি সে মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করিয়া কবিতার ছন্দে ও গানের সুরে আপনার জীবনকাব্যকে ঝঙ্কৃত কবিয়া তুলিয়াছে? হৈমন্তীর উপর বুঝি মহেন্দ্রর মন ঝুঁকিয়েছে?

সুধার মনে পড়িল, আজ কতদিন ধরিয়াই হৈমন্তীকে সে কেমন যেন উন্মনা দেখিতেছে, কিন্তু মহেন্দ্রর কথা সুধার একবারও মনে হয় নাই। চিত্রকরের তুলির মুখ হইতে হৈমন্তী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহাকে মহেন্দ্রর মত মূর্তিমান তর্কশাস্ত্রের পাশে কি রকম মানাইবে? সুধার মন এতটুকুও সায় দিল না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে তাহার এ অনুমানটাকে মিথ্যা মনে করিয়াই সে উহার হাত এড়াইতে চেষ্টা করিল। অথবা মহেন্দ্রর নিজের দিকে সত্য হইলেও হৈমন্তীর দিকে ইহা মিথ্যা

হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু কে সে, কাহার আশায় হৈমন্তী তাহার হৃদয়-শতদলে আসন পাতিয়া রাখিয়াছে, কাহার পিছনে দূরে দূরান্তরে তাহার উতলা মন উড়িয়া চলিয়া যায়, নিকটের সকল কিছু ভুলিয়া? তাহাদের এই ক্ষুদ্র বন্ধু-সভার বাহিরেও ত হৈমন্তীর আনাগোনা আছে। এই ত সেদিন বিকালের চায়ে দেখা গেল, নবীন অধ্যাপক বিমলকান্তি দত্তকে আর তরুণ চিকিৎসক খ্যাতনামা অমরপ্রিয় দেবকে। হৈমন্তীর তাহাদের সঙ্গে খুবই আলাপ আছে বোঝা যায়, তাহারা মাঝে মাঝে আসেও এ-বাড়ীতে, হৈমন্তীকেও ত অমরপ্রিয়ের মা দুদিন নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভারী সুন্দর শিষ্ট সংযত কথাবার্তা এই ভদ্রলোকটির। হৈমন্তীর মন এদিকে গিয়াছে কি? কি জানি? সুধার মনটা কি ভাবিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল। আবার সে-চিন্তা সে মন হইতে দূর করিয়া দিল জোর করিয়া। দুই হাতে যেন কি একটা ভয়াবহ জিনিসকে সে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে, এমনই ভাবে মনটাকে শক্ত করিয়া তুলিল। সেই চেষ্টায় তাহার দুই চক্ষু একবার যেন পলকের জন্য বন্ধ হইয়া আসিল। আবার সে আপনার কাজে মন দিল।

মিলি তাহার হাত হইতে কাগজগুলা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আজ বন্ধ কর ভাই, আর ত বেশী নেই। ওক'টা কালকে করলেও চলবে, তোমরা আজ ভয়ানক খেটেছ। একটু গানেগল্পে খেলাধূলোয় সময়টা কাটালে হ'ত না"

মহেন্দ্র বলিল, "আপনার যেমন দিবারাত্রি গান ভাল লাগে, আর সকলের তা না লাগতে পারে। অবশ্য, আমি যে সকলের মন জানিনা সেটাও ঠিক কথা।"

মিলি বলিল, "গানই যে করতে হবে এমন কথা আমি বলি নি। ইচ্ছে করলে স্নেক্‌স এণ্ড ল্যাডার্স কিংবা আগডুম-বাগডুম খেলতেও পারেন। আমি কাজ বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। সেইটুকু মাত্র আমার উদ্দেশ্য।"

মহেন্দ্র আর কিছু বলিল না। তাহার মনের ভিতর মস্ত একটা তোলপাড় চলিতেছিল। বহুদিন ধরিয়া এই যে প্রিয় চিন্তাটিকে ধীরে ধীরে সে পরিণতির দিকে আনিতেছিল, তাহা যে এমন একটা বাধার গায়ে আসিয়া ঘা খাইবে ইহা সে আশা করে নাই। তাহার বলিবার ভাষা মোলায়েম নয়, ধরণধারণ সুকোমল নয়, কিন্তু মনে যে তাহার প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠিয়াছে

ইহা নিশ্চয়ই সে হৈমন্তীকে বুঝাইতে পারিয়াছে। ভালবাসার এতখানি আবেগকে মেয়েরা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না বলিয়াই মহেন্দ্রর বিশ্বাস, যদি না ইতিমধ্যে তাহার মনে আর কেহ আসন পাতিয়া বসিয়া থাকে। তা ছাড়া, উনিশ-কুড়ি বৎসরের মেয়ের মন একেবারে শূন্য, বালিকার খেলার খেয়ালে সে দিন কাটাইতেছে, ইহাও মহেন্দ্র বিশ্বাস করে না। হৈমন্তী কেন বলিল, তাহার সময় আসে নাই? যে এসব কথা এমন গুছাইয়া বলিতে পারে, তাহার মনে এ-চিন্তা নিশ্চয়ই প্রবেশ করিয়াছে। নিশ্চয় সে আর কাহারও দিকে মনের মোড় ফিরাইতেছে। সেই ত্রয়োদশী বালিকা হৈমন্তীকে মহেন্দ্র যখন প্রথমে দেখে তখন ত ইহারা কেহ তাহার ধারে-কাছে ছিল না। তাহার এতদিনের পরিচয়, এতকালের প্রভাবকে অনায়াসে ডিঙাইয়া গেল কে, জানিবার জন্য মহেন্দ্রের মন ছটফট করিতে লাগিল। সভ্য-সমাজে সর্বত্রই সভ্য হইয়া চলিতে হয়, না হইলে তাহার মাথাটা সে একবার অন্তত দেয়ালে ঠুকিয়া দিয়া কিছু আনন্দ সংগ্রহ করিত। মূর্খ মানুষগুলার ভিতর ত সব মরুভূমি, কিন্তু বাহিরে মমতার নির্ঝর ছুটাইয়া অনভিজ্ঞ মেয়েগুলিকে হাত করিয়া লইতে তাহাদের পাণ্ডিত্যের অভাব দেখা যায় না! সত্যকার যোগ্যতা অর্জন করিবার দিকে মন না দিয়া মহেন্দ্রও যদি এই ভুয়া পালিশের দিকে মন দিত তাহা হইলে হয়ত তাহাকে আজ এমন করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে হইত না। সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার বয়সে এতখানি অধিকার আজকালকার কোন ছেলের নাই, ইংরেজী সাহিত্যের খোঁজই বা তাহার সমান কে রাখে? কিন্তু বিধাতা তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠটাও করিয়াছেন কর্কশ, পথে ঘাটে সব্ ওয়াল্টার র‍্যালির মত গায়ের জামা খুলিয়া প্রেয়সীর পদতলে পাতিয়া দিবার বিদ্যাও সে আয়ত্ত করে নাই, এইসব অপরাধেই হয়ত তাহাকে অযোগ্যতার শাস্তি মাথায় বহিয়া ফিরিতে হইবে।

বেলতলার দিকে প্রকাণ্ড একটা ময়দানওয়ালা বাড়ী। বহুকাল পূর্বে তপনের পিতামহ তাঁহারই কোন্ মক্কেলের নিকট হইতে মাটির দরে এই জমিটা কিনিয়াছিলেন। বাড়ীর অর্ধেকটা তিনিই করিয়াছিলেন, বাকি অর্ধেকটা তপনের পিতা। তপনের পিতার বাগানে সখ ছিল বলিয়া বাড়ীটার দিকে খুব বেশী ঝোঁক তিনি দেন নাই, জমি বেচিয়া লক্ষপতি হইবার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার সখ ছিল বড় বড় গাছের; কৃষ্ণচূড়া, সোনাল, বিলাতি, নিম, বকুল, কাঠচাঁপা, কনকচাঁপা, ইত্যাদি সব রকম বড় ফুলের গাছ পথের দুই ধারে তিনি লাগাইয়াছিলেন। আম, কাঁঠাল, দেবদারু, ইউকালিপ্‌টসের অভাবও সেখানে ছিল না।

বাড়ীটার বেশীর ভাগ একতলা, দোতলায় খান-তিনেক মাত্র ঘর। একদিকে চওড়া ঢাকা বারান্দা, অন্যদিকে মস্ত চৌকা গাড়ীবারান্দার ছাদ লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। দক্ষিণের এই গাড়ীবারান্দার দিকে মুখ করিয়া তপনের ঘর। ঘরে খাট নাই, পুরু গদির উপর পাতা বিছানা মস্ত একটা সুচিত্রিত কাঁথা দিয়া ঢাকা, আর একদিকে হাত-খানিক উঁচু একটা টেবিলের সামনে বড় পিঁড়ির উপর সালুর তৈরী ঐ মাপের ছোট একটি তোশক। পাশে একটা কাচহীন বই রাখিবার তাক, দেখিলেই বোঝা যায় বইগুলি সর্বদা নাড়াচাড়া হয়। সংস্কৃত ও বাংলা রামায়ণ মহাভারত ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ও গানের বই তাহাতে সাজানো। টলষ্টয়, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির দুই-চারিখানা করিয়া বই তাহাতে আছে আর আছে গীতা ও উপনিষদ্। নীচের দিকে কৃষক নামক বাংলা মাসিকপত্র, বাগান সম্বন্ধে ইংরেজী কয়েকটা বই, ও ছুতার, কামার ইত্যাদির যন্ত্রপাতি সমেত সুচিক্কণ একটি কাঠের বাক্স। তাকের মাথায় কুমারটুলির গড়া একটি লক্ষ্মীমূর্তির দুই পাশে দুইটি মাজা পিতলের ঘটিতে তাজা ফুল। নীচু টেবিলটায় শ্বেত পাথরের ছোট একটি রেকাবীতে মোটা অনেকগুলি বেলফুল। একটা সুচিত্রিত মাটির ছোট ঘটে অনেকগুলি কলম ও পেনসিল মুখ উঁচু করিয়া আছে আর একটা রংকরা গোল

কাঠের কৌটায় নিব, রবার, আলপিন, ইত্যাদি ভরা। দেয়ালে প্রকাণ্ড একখানি রেখাচিত্র—একটি গ্রাম্য বালিকা কোমরে কাপড় জড়াইয়া খোড়ো ঘরের বাহিরের দেয়ালে আলপনা দিতেছে, চিত্রকরের নাম লেখা নাই। ঘরের একেবারে কোণে ছোট একটি কাঠের আলনায় দুই-চারিটা সাদা জামা কাপড়।

তপন সকালে উঠিয়া গাড়ীবারান্দায় ভোরের সূর্যের আলোর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে, পাখীর ডাকে ইহাকে আর কলিকাতা শহর মনে হইতেছে না। তপনের ইচ্ছা করিতেছিল না যে এখান হইতে সরিয়া যায়। কিছু দিন হইতে তাহার মনটা কেন জানি না কাজে বসিতে চায় না।

মনে হয় তাহার ওই গ্রামের ইস্কুল, ওই ক্ষেত বাগান—এ ত তাহার জীবনে কই সত্য হইয়া উঠে নাই। ছেলেবেলা যেমন সে পুতুল লইয়া খেলা করিত, বড় হইয়া তেমনই যেন মানুষ, ক্ষেত, খামার লইয়া খেলা করিতেছে। পুরুষ বুঝি সারাজীবন এমনই খেলা করে, নিত্য নূতন নূতন খেলা রচনা করিয়া তাহাকে বড় বড় নাম দিয়া আপনাকে ও পরকে ভোলায়। এই খেলার উন্মাদনাই আসল তাহাদের কাছে। কয়জনের কাছে কাজ সত্য হইয়া উঠিয়া জীবনের পরতে পরতে মিশিয়া যায়?

দৌড়ধাপের খেলায় প্রথম হইবার উন্মাদনা ও বাহবা পাইবার নেশা যেমন ছেলেদের মাতাইয়া তুলে, আজ মনে হইতেছে, তেমনই একটা বড় রকম বাহবা পাইবার লোভেই যেন সে এ-খেলায় নামিয়াছিল। এখন ইচ্ছা করিতেছে, এই পুরাতন খেলা ফেলিয়া দিয়া জীবনের আর একদিকের আহ্বানের প্রতি সে তাহার মনটা একটু দেয়। এই পাখীর ডাক, ফুলের গন্ধ, এই বসন্ত-সঙ্গীত গ্রামের মাটিতে বসিয়াও তাহার জীবনে কি এতদিন মিথ্যা ছিল না? আজ কে যেন এই ইটকাঠে-গড়া কঠিন কলিকাতার বুকে বসিয়াই বসন্তের সিংহদ্বার তাহার চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে। ফলশস্যশ্যামলা পল্লীশ্রী তাহার ফলফুলপত্রের ডালা তুলিয়া ধরিয়া এতদিন তাহাকে যাহা দেখাইতে পারে নাই, নগরীর একটি শ্যামাঙ্গিনী বালিকা তাহার স্নিগ্ধ রূপের ভিতর দিয়াই কেমন করিয়া সে অনন্ত সৌন্দর্য তপনের দৃষ্টিপথে আনিয়া দিয়াছে। এই রূপের পসরা তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ইচ্ছা করে ইহারই ভিতর ডুবিয়া থাকিতে, কাজ-কাজ খেলায় তাই আর মন বসে না।

ইচ্ছা করে, মানুষের গড়া এই ঘড়ির শাসনকে দিন কয়েকের জন্য উপেক্ষা করিয়া তাহার আনন্দ উপলব্ধির অতলে সব ভুলিয়া তলাইয়া যাইতে। কেন কাজের দিন তিনটা না বাজিলে কাজ ছাড়িয়া যাওয়া যাইবে না, কেন বিদায়বেলায় ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিলেই আর সকলের সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া তাহাকেও আপনার নিরানন্দ গৃহকোণে ফিরিয়া আসিতে হইবে? ভোরবেলা এই গন্ধ-বিধুর সমীরণের মাঝখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কল্পনায় তাহার চুলের মালার গন্ধটুকু অনুভব করিতে গেলে, সেই স্মিতহাস্যজড়িত মুখখানি মনে করিতে গেলে কেন তাহার কাজ তাহা সহ্য করিবে না? যে-বন্ধনে আপনাকে আপনি সে স্বেচ্ছায় বাঁধিয়াছে, তাহাই কেন তাহার প্রভু হইয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে?

কিন্তু মন বিদ্রোহ করিলে কি হয়? পৃথিবীতে কয়টা পুরুষ মনের ক্ষুধায় তাহার দৈনন্দিন কাজ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিয়াছে? ইহা যেন স্ত্রীলোকেরই ধর্ম। পুরুষ চিরদিন স্ত্রীলোককে বলিয়াছে,—প্রেমেই তোমার জীবন, আমার জীবনে উহা দিনান্তের বিশ্রামস্থান মাত্র। নবযৌবনের এই উন্মাদনা কাটিয়া গেলে তপনও কি তাহাই বলিবে না? আজিকার এই কাজ যদি জীবনে সত্য না হয়, তাহা হইলে শিশুর খেলনার মত তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেও নূতন একটা গড়িয়া তুলিতে কতক্ষণ? প্রেম ভুলিয়া তখন তাহাতেই হয়ত সে ডুবিয়া যাইবে!

তপন আপনাকে পুরুষধর্ম বুঝাইতেছিল, কিন্তু ভোরের ফুলদলের সৌরভের ভিতর দিয়া সেই মুখখানির ছায়া ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতেছিল,—আমাকে তুমি ভুলিতে পারিবে না, তোমার সকল খেলা সকল কাজে বাধা দিয়া আমি তোমাকে বসন্ত-সমারোহের স্বপ্নের মাঝখানে টানিয়া লইয়া যাইব। নারীর জীবনই প্রেমে, পুরুষের নয়? মিথ্যা কথা! তবে পৃথিবীর এত কাব্যে, এত চিত্রে, এত গানে পুরুষই কেন নারীকে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছে? তোমার কণ্ঠের ঐ গানের প্রাণ কে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সত্য করিয়া বল দেখি! দু-দিনের উন্মাদনা এই আকুলতা কি আনিতে পারে?

কিন্তু ফুলের গন্ধে যে ছায়াময়ী তাহার সহিত কথা বলিয়া যায়, তাহার কাছে আপনার মনের একটা কথাও তপন বলিতে পারে কই? এ কি তাহার ভীরুতা? ভীরুতাই বা কি করিয়া বলে? এ তাহার যোগ্যতার অভাব। ক্ষেতে

লাঙ্গল চষে সে, সত্যই ত সে কাব্যের নায়ক নয়? প্রেমের দায়িত্ববোধ তাহার আছে, তাহার অনুরাগের বাতি যথাস্থানে জ্বালিয়া রাখিবার অধিকার কি তাহার আছে? সে বুঝিতে পারে না, কি করিয়া আপনার অধিকার প্রমাণ করা যায়। এই প্রমাণ না দিয়া কাঙালের মত কাছে গিয়া দাঁড়াইতে যে তাহার আত্মসম্মানে লাগে।

এ যদি প্রাচীন উপন্যাসের যুগ হইত তবে বর্ষার তরঙ্গসঙ্কুল নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ওই পুষ্পকোমলার প্রাণ বাঁচাইতে সে অনায়াসে যাইতে পারিত; যদি মহাভারতের যুগ হইত, সুভদ্রার মত রথে বসাইয়া না-হয় তাহাকে হরণ করিত, অথবা আপনার ভাগ্য পরীক্ষার আশায় স্বয়ংবর সভায় ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা দিত; ইউরোপের নাইটদের যুগ হইলে বন্দিনী রাজকুমারীকে উদ্ধার করিতে হয়ত সকল বিপদ বরণ করিত।

কিন্তু এই আধুনিক কলিকাতায় তাহার যে কোন সুযোগই নাই। যে যোগ্যতা এখানকার মানুষের চোখে তাহার আছে, তাহা যে আর পাঁচজনেরও নাই একথা ত তপন বলিতে পারে না।

শুধু এইটুকু সে বলিতে পারে যে তাহার অন্তরের বাতায়নের মত ওই উজ্জ্বল চোখ দুইটির দিকে চাহিলে তপন যে শুভ্র যূথিকাদলের মত হৃদয়ের ছবিটি দেখিতে পায়, আর কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। ওই শুভ্রতাকে বাহিরের আবরণের অন্তরালে খুঁজিয়া পাইবার ক্ষমতা সকলের নাই। তপন আপনার অন্তরের আলো দিয়াই তাহাকে চিনিয়া বাহির করিয়াছে। আপনার অনুরাগের অঞ্জলি স্তরে স্তরে ঢালিয়া মাটির পৃথিবীর চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে সে যে-বেদী রচনা করিয়া হৃদয়লক্ষ্মীকে বসাইয়াছে সে বেদী রচনা করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। আপনাদের বাজারদরের তৌল-দাঁড়িতে যাহারা এই লক্ষ্মীপ্রতিমার মূল্য যাচাই করিবে তাহাদের কাছেও সে-প্রতিমা তুচ্ছ নয় তাহা তপন জানে, কিন্তু তপন যে-তুলাদণ্ডে তাহাকে ওজন করিয়াছে তাহা সত্যভামার তুলাদণ্ডের মত। এক দিকে তাহার অন্তরলক্ষ্মী, অন্য দিকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে হার মানাইয়া ওই লক্ষ্মীরূপিণীর নামের অক্ষর কয়টি মাত্র। তাহার তুল্য শুধু সেই।

রোদের ঝাঁজে সমস্ত গাড়ীবারান্দা ভরিয়া গিয়াছে। আর বেলা করা যায় না। তপনকে কাজে যাইতেই হইবে। সকাল সকাল গ্রামের কাজ সারিয়া

বিবাহ-উৎসবের আয়োজনে ইন্ধন যোগাইতে আবার যথাকালে ছুটিয়া আসিতে হইবে। মিলির বিবাহ-সভাকে ঘিরিয়া তাহাদের সকলের মনের উৎসব-দেবতারা যে মর্ত্যলোকে দেখা দিয়াছেন।

মা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, খাবার সাজানো হইয়াছে। তপন তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। সকালবেলা এক রাশ ভাত মাছ খাইতে সে ভালবাসিত না। পিঁড়ির সামনে শ্বেত পাথরের থালায় চারখানা লুচি, কালজিরা ও কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন-দেওয়া বিনা মসলার একটা তরকারী, ছোট একটা বাটিতে ঘন ক্ষীর ও ছোট রেকাবিতে কাটা গোলাপী খরমুজা। খাওয়াদাওয়া সারিয়া মোটা একখানা ধোপ কাপড়ের উপর পাশে ফিতা-বাঁধা সাদা মারাঠি জামা পরিয়া ও পুরু কাবুলী চটি পায়ে দিয়া তপন কাজে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

গ্রামের স্টেশনে তাহার একটা সাইক্‌ল্ থাকে, গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাতে চড়িয়াই সে স্কুলে যায়। আবার ফিরিবার সময় স্টেশনে সেটি জমা রাখিয়া ট্রেন ধরে।

গ্রামের পথে বৃষ্টি বাদল হইলে কি খানাখন্দ পড়িলে তাহার বাহন তাহারই স্কন্ধে আরোহণ করে। তবু মোটের উপর জিনিসটার সাহায্যে তাহার পথ একটু সংক্ষিপ্ত হয়।

তপন পথে চলিয়াছে। গ্রামের মেয়েরা স্নান সারিয়া জলের কলসী লইয়া বাড়ী চলিয়াছে, মেছুনীরা টুকরিতে রূপার মত ঝক্‌ঝকে ছোট ছোট মাছগুলি শালপাতার তলায় ঢাকা দিয়া বেচিতে চলিয়াছে, চাষীরা প্রথম বৃষ্টির পরেই মাঠে লাঙ্গল চষিতে শুরু করিয়াছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর প্রথম ধারাস্নানে প্রকৃতির শ্যামশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। তপনের চোখে এই মাটির পৃথিবীকে আজ যেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী মনে হইতেছে। তাহার চোখে সে বুঝি মায়ার অঞ্জন পরিয়া আসিয়াছে! সে বিস্মিত হইয়া ভাবে এই কলসীর ছলছল, এই মলিন অঞ্চলের তল সিক্ত কেশপাশ, এই লাঙ্গলের ফলার দুপাশে ভাঙিয়া-পড়া মাটির ডেলা, এই পুকুরঘাটের শ্যাওলা-পড়া পাথর সে ত জন্মাবধি দেখিতেছে, কিন্তু তাহা অনবদ্য হইয়া উঠিল আজ এতকাল পরে! একজনের চোখে একদিন এগুলি সুন্দর লাগিয়াছিল সে জানে, সেই দিন হইতে তপনও ইহাদের সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। সেই চোখ দুটি যাহা দেখিয়াছে তাহাতেই বুঝি আপনার দৃষ্টির অমৃত বুলাইয়া দিয়া গিয়াছে!

কাল মিলির গায়েহলুদ, পরশু বিবাহ। তার পর এই জমাট উৎসব-আয়োজন ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে [illegible] তাহারও [illegible] কি না কে জানে? কি ছল করিলে কাহার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নিত্য নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। তবুও হয়ত নিত্য দেখা করিবার সাহস সঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিবে বহু দীর্ঘ কাল। তাহার ভিতর পৃথিবীতে ত কতই অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতে পারে। পৃথিবীতে শুধু প্রলয়, মহামারী, আকস্মিক দুর্ঘটনাই যে ঘটে তাহা নয়, তপনের অপেক্ষা দুঃসাহসিক মানুষ, যোগ্য মানুষও পৃথিবীতে অনেক আছে। তাহারা যে ইতিমধ্যে তপনের অন্তরলক্ষ্মীকে জয় করিবার চেষ্টা না করিতে পারে এমন নয়। বাঙালীর মেয়ের পিতামাতাও তাহার ভবিষ্যৎ ভাবেন, তাঁহারাও হয়ত কত কল্পনাজল্পনায় ব্যস্ত আছেন, যাহা দুই দিন পরে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মতই তপনের চিত্তাকাশ অন্ধকার করিয়া মূর্ত হইয়া উঠিবে। ভাবিতে ভাবিতে তপনের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মিলির গায়ে-হলুদে মহা কোলাহল। সকালবেলাই সকলের চেয়ে জমাট উৎসব লাগিয়াছে। সুধা ও হৈমন্তী ত প্রত্যহই আছে, তাহার উপর মিলির স্নানযাত্রার সমারোহ বৃদ্ধি করিবার জন্য আসিয়াছে স্নেহলতা, মনীষা, ইন্দুপ্রভা, পঙ্কজিনী, ইত্যাদি সখীর দল। আত্মীয়-গোষ্ঠীর দুই-চারিজন মেয়েও জুটিয়াছে। বাকী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই নিমন্ত্রণের সময় মত আসিবেন। বিবাহ-উৎসবের দিনে বড় সভায় সামাজিক আইন-কানুনের বাঁধনের ভিতর যাহাদের সংযত হইয়া চলিতে হইবে, আজিকার ঘরোয়া উৎসবে সেই তরুণী সখীর দল আদিম মানবীদের মত উন্মত্ত উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভদ্রতার মুখোস টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এ যেন হোলির উৎসবের রং-খেলা। মনীষা ও ইন্দুপ্রভার কিছুদিন পূর্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাহারাই নেত্রী হইয়া এক-একতাল হলুদ লইয়া মেয়েমহলে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া বেড়াইতেছে। যে তাহাদের সম্মুখে পড়িবে তাহার আর রক্ষা নাই, আগাগোড়া তাহাকে রাঙাইয়া দিয়া তবে ছাড়িবে। বয়স্যাদের ভিতর সুধা, হৈমন্তী ও স্নেহলতারই সকলের চেয়ে দুর্গতি বেশী। এখনও অবিবাহিতা থাকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মনীষা ও ইন্দুপ্রভার সকল অত্যাচার তাহাদের সহিতে হইতেছে। মিলির গায়ে হলুদ দিয়াই যাহার হাতে যত হলুদ ছিল সব গিয়া পড়িল সুধা, হৈমন্তী ও স্নেহলতার মাথায়। বেচারী স্নেহলতা স্ত্রী-আচারের শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা, তাই একখানা সুন্দর ঢাকাই শাড়ী ও রেশমের পাড়-তোলা ব্লাউস পরিয়া আসিয়াছিল। সখীদের অত্যাচারে তাহার সখের কাপড়-জামার যা চেহারা হইল তাহাতে সাত ধোপেও সেগুলি আর ভদ্র-সমাজে পরিবার মত হইবে না।

হৈমন্তী বলিয়াছিল, "বেচারীর ভাল কাপড়খানা নষ্ট ক'রে দিলে?" মনীষা দুই হাতে দুই তাল হলুদ লইয়া মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া মুখ নাড়া দিয়া বলিল, "গেলই বা একখানা ভাল কাপড়! এখনও ত ওর বিয়েই হয় নি। বিয়ে হ'লে কত কাপড়-জামা পাবে, একখানার কথা অত মনেও থাকবে না। এই হলুদ গায়ে পড়া কত ভাগ্যি, ওর পরেই বিয়ে এগিয়ে আসবে।"

সুধা বলিল, "ভাগ্যি হোক বা না-হোক, তোমার মত রণরঙ্গিণীর সঙ্গে ত আর ও পারবে না?"

মনীষা বলিল, "ভুলে গিয়েছিলাম তোর কথা। এখনও অনেক কাপড় সাদা, আবার পরের হয়ে ওকালতি! দাঁড়া, তোকে একটু ভাল ক'রে ছুপিয়ে দি। স্নেহর মুখখানাও একটু সোনার বরণ না হ'লে ভাল দেখাচ্ছে না।"

ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি অনেক হইল, কিন্তু মনীষার হাত হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইল না।

স্নেহলতা বেচারীর কাপড় ত গিয়াছিল, তাহার উপর সমস্ত মুখখানাও হলুদে রাঙা হইয়া গেল। সুধার শাড়ীর পিঠটুকু বাকী ছিল, এবার সেটুকুও রহিল না। পালিতগৃহিণী বলিতে আসিয়াছিলেন, "ওরে, যা'ল, ভাল কাপড়-চোপড় প'রে এসেছে তাদের শুধু একটা ক'রে কপালে টিপ দিয়ে ছেড়ে দিবি, অমন ক'রে সব ধ্বংস ক'রে দিস নে।

মনীষা বলিল, "তা বইকি জ্যাঠাইমা, বিয়ে মেয়েমানুষের একবারই হয়, জেনে শুনে যারা ভাল কাপড় প'রে আসে তাদের কাপড় বাঁচাতে গেলে আমাদের আর ফুর্তি করা কপালে হয় না। ওদের ত দেবই সং সাজিয়ে, আপনাকেও আজ অমনি ছাড়ব না।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "ওমা, আমাকেও কি ছেলেমানুষ পেলি? কুটুমবাড়ীর লোকের সামনে বেরোব কি ক'রে ওই মূর্তি ক'রে?"

ইন্দুপ্রভা বলিল, "আহা, কুটুমবাড়ীর লোকেরা সব বিলেতের জাহাজ থেকে এই নামল কিনা, গায়ে হলুদ কাকে বলে জানে না। আজকের দিনে কারুর কাপড় সাদা থাকতে নেই।"

এমন একটা হুল্লোড়ের ব্যাপার দেখিয়া সতু এবং শিবুও মেয়েদের দলে ভিড়িয়া গেল। অন্য মেয়েদের গায়ে রং দিবার সাহস তাহাদের ততটা ছিল না। কি আর করে? খানিকক্ষণ দুইবন্ধু পরস্পরকেই হলুদ মাখাইল। সুধা, হৈমন্তী ও জ্যাঠাইমার গায়ে হলুদ মাখাইবার আর স্থান ছিল না, মনীষা ও ইন্দুপ্রভার কল্যাণে তাঁহাদের গায়ের রং কিংবা কাপড়ের রং চেনাও শক্ত। তবু শিবু ও সতু সেখানে গিয়াও কিছু ছুটোপাটি করিল। কিন্তু তেলা মাথায় তেল দিয়া কি সুখ? মেয়েদের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা বাহিরবাড়ীতে ছুটিল। সকলে ফর্দ মিলাইতে জিনিস সামলাইতে ব্যস্ত, পিছনে চাহিয়া কেহ

দেখে নাই অকস্মাৎ তপন, নিখিল ও মহেন্দ্রকে সচকিত করিয়া শিবু ও সতু তাহাদের তিনজনের মাথায় এক-এক ঘটি হলুদ-জল ঢালিয়া দিল।

এমন অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া যদিও তাহারা একটু বিস্মিত হইয়াছিল, তবু উপস্থিত বুদ্ধি যোগাইতে নিখিলের দেরি হইল না। সে দুই হাতে লাল ও কালো কালির দোয়াত দুইটা তুলিয়া দুই জনের মাথায় উপুড় করিয়া দিল।

মহেন্দ্র কেবল বলিল, "ছি, ছি, শুভদিনে কালো কালিটা ঢেলে কি বিশ্রী কাণ্ড করলে!"

তপন বলিল, "মূর্তিমান অমঙ্গলদের মাথায় কালো কালি ঢাললেই মানুষের কিছু শুভ হবার সম্ভাবনা থাকে।"

শিবু বলিল, "আমি অত ঠাণ্ডা ছেলে নই, এক দোয়াত কালি ঢেলেই আমায় দমিয়ে দিতে পারবেন না। যুদ্ধ ঘোষণা আজ আমিই করেছি, আমার প্রতিশোধ নেওয়া সাজে না, না হ'লে আরও অনেক সুদৃশ্য ও সুগন্ধি জিনিস ছুঁড়তে আমি পারি।"

নিখিল শিবুকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে অথচ সজোরে বলিল, "এই কার্তিক গণেশ দুটিকে হলুদ মেখে ত দিব্যি দেখাচ্ছে। আজ অনেক ফুলের মালা এসেছে। দু-জনের হাতে দু-ছড়া দিয়ে ভিতরে নিয়ে যাও না। হয়ত ওদেরও অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'তে পারে। মহেন্দ্র আর তপন দু-জনেরই অবস্থা সঙ্গীন।"

শিবু বলিল, "বাপ রে, ওসব বাঁদরামি করতে গেলে আমায় সবাই মিলে মেরে শেষ ক'রে রাখবে।"

মেয়েরা উঁকি দিয়া বাহিরের ব্যাপার দেখিল, কিছু আন্দাজ করিল, কিন্তু কেহ কাছে আসিল না।

দুপুরেই নিমন্ত্রিতাদের আহারের পাট, কাজেই ভোরের পালা বেলা বারোটায় শেষ করিয়া এই দিকেই সকলকে মন দিতে হইল। কলিকাতার মেয়েযজ্ঞি, সহজে ত নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। যাঁহার বাড়ীতে যে সময়ে নিমন্ত্রণ খাওয়ার রীতি, কিংবা যাঁহার সংসারে যখন ছাড়া বাহিরে যাওয়া চলে না, তিনি সেই সময় আসিবেন। বারোটা-একটার পর হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত যাহার যখন খুশী আসিয়া হাজির, কতবার যে খাবার আসন

পড়িল তাহার ঠিক নাই। সেদিনকার মত বাড়ীর লোকদের মধ্যাহ্নভোজনটা বাদ গেল; সেই রাত-দুপুরে তাহাদের প্রথম ও শেষ আহার। ছেলেরা পাত পাড়িয়া বসিতে না পাইলেও পরিবেষণ করার ফাঁকে ফাঁকে সুবিধা পাইলেই বেগুনীভাজা, সন্দেশ ও চা দিয়া জঠরাগ্নিকে অনেকখানি সংযত রাখিয়াছিল, মেয়েদের অনেকের ভাগ্যে সেটুকুও জোটে নাই।

মহিলা-সভায় একদল আসিয়াছিলেন বাড়ী হইতে খাইয়া, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে শুধু গহনা-কাপড় দেখিতে ও দেখাইতে। তাঁহারা অলঙ্কারের দ্যুতি চারিধারে ঠিকরাইয়া একটু দ্রুত গতিতেই বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। আর একদল বাড়ীর সকল ঝি-বৌকে একত্রে জুটাইয়া আনিয়া সাধ্যমত খাইয়া ও সাধ্যমত বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। তৃতীয় দল ক্ষুধার মুখে যতখানি ভাল লাগিল মুখে দিয়া, বহুকাল পরে বন্ধুবান্ধবের সহিত সুদীর্ঘ আলাপে মনটা খুশীতে হাল্কা করিয়া মন্থর গতিতে বাড়ী ফিরিলেন।

এই সকল দলের মেয়েদের যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা মিটাইয়া যখন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পাত পড়িল তখন খাইবার ইচ্ছা বিশেষ কাহারও না থাকিলেও একসঙ্গে বসিবার আগ্রহেই সকলে বসিল। মনীষা ও ইন্দুপ্রভা পরের বাড়ীর বৌ, তাহাদের সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। পঙ্কজিনী ও স্নেহলতার খাওয়া হইলেই এই বাড়ীর গাড়ীতেই তাহাদের পৌঁছাইয়া দিবে। সুধাকে কিন্তু হৈমন্তী যাইতে দিবে না। সুধা এত বৎসরের মধ্যে একরাত্রিও হৈমন্তীদের বাড়ীতে কাটায় নাই, আজ তাহাকে থাকিতেই হইবে। হৈমন্তীর একলার ঘরে পুরু গদি-দেওয়া প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর পাখা চলিতেছে, সেইখানে দুই বন্ধুতে শুইয়া আজিকার রাত্রিটা গল্পে কাটাইয়া দিলে কি আনন্দেরই না হয়! কতক্ষণই বা আর রাত আছে! এই কয়টা ঘণ্টা এমনই গল্পেগুজবে কাটিলে মিলিদিদির বিয়েটা চিরকাল মনে থাকিবে। এই বয়সের গল্প সহজে ত ফুরাইতে চাহে না, তাহা পাখীর মত ডানা মেলিয়া কত দেশদেশান্তরে কালকালান্তরে ঘুরিবে।

সুধা রাজী হইল সহজেই। হয়ত এ সুযোগ আর আসিবে না, দুই দিন বাদে হৈমন্তীরও বিবাহ হইয়া যাইবে, তখন আর এ বাড়ীর সঙ্গে তাহার কিসের সম্পর্ক থাকিবে? জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বটা শেষ হওয়ার সূচনা যেন আজ হাওয়ায় ভাসিতেছে।

শিবু এখন মস্ত ছেলে, সে ঘর-সংসারের কাজ মেয়েদের মতই বুঝিয়া-সুঝিয়া করিতে পারে। সুধা তাহাকে সকাল হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিল, আজ যদি তাহার বাড়ী ফেরা না হয়, শিবু যেন সব কাজকর্ম একটু দেখে। শিবু বলিল, "ওইটুকু কাজের জন্য এত ভাবছ কেন? তুমি দু-দিনই থাক না, আমি তোমার তেল ঘি চিনি আটা বেশ সামলাতে পারব। ফিরে এসে দেখো এখন সংসার ছারখার হয়ে যায় নি।"

তার পর একটু থামিয়া বলিল, "নিখিলদারা কি সব বলাবলি করছে, ইচ্ছে কর ত মিলিদির সঙ্গে তোমরা দু-জনেও লাগিয়ে দিতে পার, তাহলে আর ভাঁড়ারের চাবি ফিরে নিতে হবে না।"

সুধা একবার চমকাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই শিবুকে ধমক দিয়া বলিল, "একরত্তি ছেলের বাঁদরামি করতে হবে না, থাম।"

খাওয়া-দাওয়ার পর সুধা ও হৈমন্তী সেই দক্ষিণের বারান্দাওয়ালা ঘরখানায় শুইতে গেল। বাড়ীতে আজ বাহিরের লোক আরও আছে, কিন্তু হৈমন্তী বেশীর ভাগকে জ্যাঠাইমার ঘরে চালান করিয়াছে। নিতান্ত যাহাদের কুলায় নাই তাহারা বসিবার ঘরে ঢালা বিছানায় স্থান লইয়াছে। হৈমন্তীর ঘরে শুধু সুধা থাকিবে। হলুদ-পর্বের পর সকলেই নূতন করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছিল, সুধা তেমন ভাল কাপড় আনে নাই বলিয়া হৈমন্তীরই একখানা চাঁপা-রঙের বেনারসী সে তাহাকে সখ করিয়া পরাইয়াছিল। এখানা তাহার সবচেয়ে প্রিয় কাপড়।

আলনার উপর বেনারসীখানা রাখিতে রাখিতে সুধা বলিল, "কি সুন্দর শাড়ী ভাই এখানা, আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল, কখন বুঝি ডাল ঝোল কিছু একটা ফে'লে বসি। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়্‌চড় করে।"

হৈমন্তী তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "ওঃ, বড় যে মুখে কথা ফুটেছে তোমার! শীগগির অভ্যাস হবে দেখো। দিদির পালা হয়ে গেল, এই বেলা ত তোমার পালা।"

সুধা একখানা ডুরে কাপড় পরিয়া খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল, "আহা, কি যে বল তার ঠিক নেই। তুমি থাকতে আমি আগে? কোন্ গুণে শুনি?"

হৈমন্তী সুধার এলোখোঁপার কাঁটাগুলা খুলিয়া চিরুনি দিয়া তাহার চুলের

গোছা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল, "গুণ তোমার বোঝবার দরকার নেই। যে তোমায় নিয়ে যাবে সে ভাল ক'রেই বুঝবে কোন্ গুণে তার ঘর আলো হবে। সত্যি ভাই, তোমার যে বর হবে সে যদি একেবারে সাগর-ছেঁচা মানিকও হয় তবু আমার মনে হবে না তোমার উপযুক্ত হয়েছে।"

সুধা বলিল, "এমন একটি অমূল্য রত্ন কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? তাও ত আবার একটি হ'লে হবে না। তোমারই কি আর যেমন-তেমন একটা হ'লে আমি তার হাতে তোমায় দিতে পারব? তোমার আগে সংসার সাজিয়ে দিয়ে তবে ত আমি নিজের কথা ভাবব। তুমি কি মনে কর, তোমায় একেবারে ভুলে সাগর-ছেঁচার সঙ্গে সাগরে তলিয়ে যেতে আমি পারব?"

হৈমন্তী সুধার লম্বা বিনুনীর আগায় নীল রঙের চওড়া ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "তবে তোমার আর আমার বিয়ে এক দিনে দু দিকে দুটো সভা সাজিয়ে হবে, কেমন? তাতে রাজী আছ ত?"

সুধা বলিল, "আমার রাজী থাকার উপরেই সব নির্ভর করছে কি না! যা দেখছি, তুমি একলার সভাই শীগগির সাজাবে। সেদিন মজুমদার সঙ্গে তোমার কি একটা মানভঞ্জনের পালা হয়ে গেল! কি বল দিখি! তাঁকে দেখে আমার কেমন যেন লাগল। কিন্তু ভাই যদি তোমার আমাকে বলতে আপত্তি না থাকে তাহলেই ব'লো, আমি জোর ক'রে শুনতে চাইছি না।"

সুধার চুল বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল, হৈমন্তী নিজের চুলগুলা এলাইয়া, দুই হাতে সুধার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার দুই চোখের ভিতর তাকাইয়া, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বলি নি ব'লে তোমার অভিমান হয়েছে বুঝি? তুমি নাকি আবার রাগ করতে জান না!"

সুধা হাসিয়া বলিল, "রাগ কেন করব? তুমি কি আর আজকাল সব কথাই আমাকে বল? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের চিন্তা নিয়ে নিজে থাকে, তখন যে সব কথায়ই অন্য লোকের কৌতূহল দেখানো ভাল নয় এইটুকু কি আর আমি জানি না?"

হৈমন্তী হাসিয়া সুধার গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "ও, তুমি বুঝি এখন অন্য লোক হয়েছ? আচ্ছা, আমি নিজেই অন্য লোককে সব বলব।"

সুধা বলিল, "এস আগে তোমার চুলটা আমি বেঁধে দি। পরে ওসব কথা হবে এখন।"

হৈমন্তী কিন্তু কথা থামাইল না। "মহেন্দ্রদার ওই ত নারদমুনির ধরণ-ধারণ, কিন্তু মানুষটা ভাই ভারি সেন্টিমেন্টাল। তুমি ভাবতেই পার না কি রকম বিপদে ওকে নিয়ে পড়েছিলাম।"

সুধা বলিল, "কি আবার বিপদে পড়লে? বেশ ত আস্ত ফিরে এলে দেখলাম দু-জনেই।"

হৈমন্তী বলিল, "আস্ত ত এলাম। কিন্তু দিদির বিয়ের গয়না গড়াতে গিয়ে নিজের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে তা ত ভাবি নি। মহেন্দ্রদাকে আমি খুবই পছন্দ করি, ওকে নিয়ে ঠাট্টার সুরে কথা বলতে যে আমার ভাল লাগে তা নয়। কিন্তু এ সব কথার দুটো মাত্র সুর আছে, যদি মত থাকে তবে গভীর সুর, আর যদি মত না থাকে তাহলেই ঠাট্টা। সুতরাং আমার কথাগুলো ঠাট্টার মত শোনালেও ওকে আমি ঠাট্টা করছি মনে ক'রো না।"

সুধা বলিল, "বেচারীর মনের যেটা সত্যি কথা সেটা নিয়ে ঠাট্টা তুমি করছ এ আমি কখনই ভাবতে পারি না।

হৈমন্তীরও চুল বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল। জানালার দিকে মাথা করিয়া দুই জনে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। বর্ষার জলো-হাওয়া ঘরের ভিতর হু হু করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। দুই বন্ধুর বিনিদ্র চোখে হাওয়াটা ভালই লাগিতেছিল। হৈমন্তী বলিতে লাগিল, "মহেন্দ্রদা জার্মানী চ'লে যাবে ব'লে ভয়ানক মাথা গোলমাল ক'রে ব'সে আছে। তার নাকি যাবার আগেই এদিক্‌কার সব ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া দরকার। কিন্তু দরকার এক জনের হ'লেই ত পৃথিবীতে সব জিনিস সেই মত হয় না?"

সুধা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তার দরকার হয়েছে বিশেষ ক'রে? তোমাকে দরকার ত?"

হৈমন্তী একটু লাল হইয়া বলিল, "তাই ত মনে হচ্ছে। আমি ভাই, মহেন্দ্রদার সম্বন্ধে এ সব কথা কখনও ভাবি নি। ওর কাছে পড়েছি, ওর সঙ্গে বেড়িয়ে গল্প ক'রে কত দিন কাটিয়েছি, ও যেন আমাদেরই এক জন হয়ে গিয়েছে। ওকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তবু আমার পক্ষে ওর ইচ্ছা পূর্ণ করা যে সম্ভব নয় এটা আমাকে বলতেই হবে।"

সুধা বলিল, "তুমি কি তাঁকে কিছুই বল নি? তাঁকে দেখে ত তা মনে হ'ল না। একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটেছেই বরং মনে হ'ল।"

হৈমন্তী বলিল, "স্পষ্ট কথাটা উচ্চারণ ক'রে বলে নি বটে, কিন্তু যতভাবে কথাটাকে এড়িয়ে চলেছি তাতে কার আর বুঝতে বাকী থাক। মহেন্দ্রদা রেগেই অস্থির। আমি কি ক'রে যে বাড়ী পালিয়ে আসব ভেবে পাচ্ছিলাম না।"

সুধা বলিল, "বেচারী মহেন্দ্রদা! তোমার মত জিনিসের উপর তার যে লোভ হয়েছে তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কথায় বলে বটে জহুরীই মানিক চেনে। কিন্তু সত্যি মানিক এক্ষেত্রে জহুরী না হ'লেও চেনা যায়। সে ত চাইবেই ভাল জিনিস। তবে সংসারে মেয়ের পছন্দটার কথাও ত ভাবতে হবে? ছেলেবেলা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন দেখছি..."

সুধা কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। হৈমন্তী তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, "এখন কি দেখছ? বললে না যে বড়!"

সুধা হৈমন্তীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এই মিনিদিকে দেখলাম, তোমাকে দেখছি।" একটুখানি হাসিয়া সুধা আবার বলিল, "কয়েক বছর আগেও আমি কি ভীষণ হাবা ছিলাম। বাইরের একটা মানুষের জন্যে মানুষ কি ক'রে যে এত মাথা ঘামাতে পারে, আর কেনই বা এত মাথা-কোটাকুটি তার জন্যে চলে তা ভেবেই পেতাম না।"

হৈমন্তী তাহার চিবুকটা নাড়া দিয়া বলিল, "এখন সব বুঝতে পেরেছ ত? আর কিছুদিন যাক্ না, একেবারে হাতে-কলমে শিখবে।"

সুধা বলিল, "ও সব জিনিস যত না-শেখা যায়, ততই পৃথিবীতে সুখে থাকা যায়। দেখছ না মহেন্দ্রদার অবস্থা!"

হৈমন্তী বলিল, "সত্যি, বেচারীর জন্যে বড় দুঃখ হয়। মিনিদির বিয়ে হয়ে গেলে ও বোধ হয় রাগ ক'রে আর আমাদের বাড়ী আসবেই না। ও না এলে ওকে খুবই 'মিস্' করি আমি।"

সুধা বলিল, "তবে আর একবার ভেবে দেখ না, ওর কথায় রাজী হওয়া যায় কি না। মহেন্দ্রদা ত হাতে স্বর্গ পাবেন।"

হৈমন্তী সুধাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "সে যে আমার সাধ্যের অতীত হয়ে গেছে ভাই, কোন উপায়েই তা আর হয় না। আমাকে দে'খে যে বুঝেছ বল, ঠিক জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছ? বল ত কে সে?"

সুধার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া যে-সত্যের ছায়াকে একদিন সে এড়াইতে চাহিয়াছিল, তাহা আজ চোখের সম্মুখে আগুনের মত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কথার সুরে যে হতাশা ধ্বনিয়া উঠিল তাহা হৈমন্তী বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, "ঠিক কি ক'রে বলব ভাই? আন্দাজে যা তা বলতে চাই না।"

হৈমন্তী মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তাকে তুমি প্রতিদিনই ত দেখছ। তুমি উদাসীন কবি, তাই এত দিন আমার এত কাছে থেকেও বুঝতে পার নি। আমার সমস্ত মন জুড়ে যে আকাশের আলো রয়েছে তাকে চেন না? তপন…"

সুধার বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘায়ের মত একটা আঘাত সজোরে লাগিল। এক মুহূর্তে যেন তাহার সমস্ত সংজ্ঞা লোপ পাইয়া গেল। সে শুইয়া না থাকিলে পড়িয়া যাইত। হৈমন্তীর অনেকগুলি কথাই সুধার কানে আসে নাই। হঠাৎ সে শুনিল হৈমন্তী বলিতেছে, "আমি বক্‌বক্ ক'রে অনেক ব'কে গেলাম, তুমি আমার একটা কথারও জবাব দিলে না। তোমাকে এত দিন কিছুই বলি নি ব'লে খুব কি রাগ করেছ? এক-তরফা ব্যাপারের কথা বলতে মানুষের সব সময় সাহসে কুলোয় না। কোনও দিন বলতে পারব ভাবি নি, আজ তোমার কাছে আপনি কথা বেরিয়ে এল।"

সুধা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সজাগ হইয়া বলিল, "না ভাই, আমি একটুও রাগ করি নি। আমি কি এমনই মূর্খ যে এতেও রাগ করব? তুমি যে আজ আমায় বললে এই ত আমার মহাভাগ্য! আমাকে যদি তুমি আগের চোখে না দেখতে তাহ'লে বলতে পারতে না।"

হৈমন্তী বলিল, "যে-কথা কাউকে বলা যায় না, তা তোমাকে বলতে পেরে আমার মনটা হাল্কা হ'ল। আর যাকে বলা যায় সে নিজে না শুনতে চাইলে আমি ত বলতে পারব না। কিন্তু তার উদাসীন দৃষ্টি, তার বিশ্বভোলা ধরণ দে'খে মনে ত হয় না যে সে কোনও দিন আমার এ-কথা শুনতে চাইবে। এ আমার দুঃখ ও সুখের বোঝা আমি একলাই বয়ে বেড়াব।"

সুধা কথা বলিল না, সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। হৈমন্তী তাহার বুকের আরও কাছে সরিয়া আসিল। সুধা হৈমন্তীর ঘন চুলের উপর ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চূর্ণ বৃষ্টির কণা হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের মুখেচোখে পড়িতে লাগিল, কেহ উঠিয়া জানালা বন্ধ করিল না।

ঘরের মেঝেতে অন্ধকারে জল গড়াইয়া চলিতে লাগিল। বাহিরে বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দে শহরের শেষরাত্রের অন্য সব শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে।

সুধার চোখের জলে হৈমন্তীর অর্ধসিক্ত চুলগুলি আরও ভিজিয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ হৈমন্তী মুখ তুলিয়া সুধার দিকে চাহিয়া বলিল, "সুধা, তুমি কাঁদছ? ছি ভাই, তোমার মন এত নরম জানলে তোমাকে কোন কথা আমি বলতাম না। পৃথিবীতে সুখদুঃখ এক সুতোয় গাঁথা, তাকে চোখে দেখবার সুখ এত বড় ব'লেই, না-দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনায় আমার এত ভয়। এর জন্য কেঁদো না। দুঃখ যদি কম পেতাম তাহ'লে সুখও এমন গভীর ক'রে জানতাম না, এটা মনে রাখতে হবে।"

হৈমন্তী সুধার কপালের উপর একটি চুম্বন করিল। তাহাদের দুই জনের চোখের জল একত্রে মিশিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সুধা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "রাত শেষ হয়ে এল, তুমি ঘুমোও ভাই, আর আমি কাঁদব না। আমাদের নিছক হাসির দিন শেষ হয়েছে, এবার জীবনে আঘাতের পালা, পরীক্ষার পালা। তাতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?"

হৈমন্তী বলিল, "কাল মিলিদির বিয়ে, ভুলে গিয়েছিলাম। চোখের জল ফেলে তার অকল্যাণ করব না। আমার পাগলামিতে তোমাকে শুদ্ধ কাঁদালাম।"

মিলির বিবাহের পর সুধা ও হৈমন্তীর সঙ্গে তপন-নিখিলদের দেখাশুনা কিছুদিন হয়ত হইবে না, এই জন্য তাহারা সকলেই মনে মনে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মহেন্দ্র ত মনের কথা প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছিল, তপন-নিখিলও ওই কথাই মনে মনে জপ করিতেছিল।

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে তোলা বহু পুরাতন একখানা ছবি হইতে একটি মুখ এনলার্জ করাইয়া তপন আপনার দেরাজের ভিতর রাখিয়াছিল। দিনে দুই বেলা সেই ছবির উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকাইয়া সে বলিত, "তোমাকে আমার পূজার অর্ঘ্য আজও নিবেদন করতে পারলাম না। জানি না কত দিনে আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

মিলির বিবাহের দিন ভোরবেলা উঠিয়া তপন ছবিখানি বাহির করিয়াছিল। একটু বেলা হইলেই আজ ও-বাড়ী যাইতে হইবে। তাহার আগে নিরিবিলিতে সে ছবিখানি একবার দেখিয়া লইতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখের তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। তপন বলিল, "তুমি এতই সুন্দর যে তোমার চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে কিছু আছে কিনা এটা ভাববার অবসর কি ইচ্ছাও আমার হয় না।"

হঠাৎ দরজার পিছনে কাহার পদধ্বনি শুনিয়া তপন চম্‌কাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, সহাস্য মুখে নিখিল দাঁড়াইয়া। তপন ছবিখানি উল্টাইয়া আবার দেরাজের ভিতর রাখিল।

নিখিল বলিল, "কার ছবি দেখছিলে দেখি না?"

তপন একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "নাই বা দেখলে! না দেখলে কিছু ক্ষতি হবে না।"

নিখিল বলিল, "তথাস্তু। তবে ভোরবেলা যা মনে ক'রে তোমার বাড়ী এসেছিলাম তা সত্যিই প্রমাণ হ'ল। 'হেড ওভার ইয়াস' ইন লভ্' কি বল?"

তপন শুধু হাসিল। নিখিল বলিল, 'যৌবনের ধর্ম, তার হাত থেকে রক্ষা

পাওয়া শক্ত। আমিও যে পেয়েছি তা বলতে পারি না, তবে ঠিক তোমাদের মত নয়।"

তপন বেশী কৌতূহল না দেখাইয়া বলিল, "নানা রকম হওয়াই ত জগতের নিয়ম। সব যদি এক রকম হ'ত তাহ'লে পৃথিবীতে কোনও নূতনত্ব থাকত না।"

নিখিল বলিল, "আমার ওই দুটি মেয়েকেই ভারী চমৎকার লাগে। কোন্ দিকে যে মন দেব তা বুঝতে পারি না। তবে আমি জানি, মনটা স্থির করতে পারলে আমার মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব হবে না। যদি একান্তই কাউকেই না পাই, তা হ'লেও আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব না। নিজের অদৃষ্টলিপিতে সন্তুষ্ট থাকতে আমি জানি। তা ছাড়া যাকে একান্ত নিজের ক'রে চাওয়া যায় তাকে তেমন ক'রে না পেলেও আজীবন বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রে যাওয়ার একটা সৌন্দর্য আছে। আমার সম্পত্তি সে হ'ল না ব'লে তাকে একেবারে ভুলতে চেষ্টা কেন করব?"

তপন বলিল, "ভুলতে না চাও ভুলো না; তবে মানুষ যেখানে দুরন্ত আগ্রহে কাউকে চায়, সেখানে না পেলে অধিকাংশ মানুষই বন্ধুত্বের সীমার মধ্যে নিজের মনকে স্বাভাবিক ভাবে প্রথম প্রথম শান্ত ক'রে রাখতে পারে না। তাই একেবারে পলায়নের পথ তারা ধরে। যার নিজেকে নিজের হাতের মুঠির ভিতর রাখবার ক্ষমতা আছে তার বন্ধুকে সম্পূর্ণ পর ক'রে দেবার প্রয়োজন হয় না।"

নিখিল বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে তাই হবে। এস, তোমার সঙ্গে একটা সর্ত করা যাক্। বেশী ভূমিকা করব না, আমি জানি তুমি আর মহেন্দ্র দু-জনেই হৈমন্তীকে ভালবাস। হৈমন্তীর মত মেয়েকে সকলেই যে চাইবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সুধার মধ্যে যে ঝরনার জলের মত একটা 'ফ্রেশনেস্' আর নির্মলতা আছে, সেটার তুলনা হয় না। ওর উপর কালি ঢেলে দিলেও এক ফোঁটা দাঁড়াবে না। আবার দেখবে বরফগলা জলের মত ঝলমল করছে। কিন্তু আশ্চর্য যে ও নিজে নিজের এ অপূর্ব শ্রী কখনও দেখতে পায় না। হয়ত দেখতে পেলে এটা থাকত না।"

তপন একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তুমি মন স্থির করতে পার নি ব'লে ত মনে হচ্ছে না, বেশ ত পেরেছ দেখছি।"

নিখিল বলিল, "তা নয়। পৃথিবীতে অথবা তার চেয়ে অনেক ছোট গণ্ডীর ভিতর একটি মাত্র ভাল জিনিস অথবা একটি মাত্র আশ্চর্য মেয়ে আছে যারা বলে, তারা মিথ্যা কথা বলে। ওরা দু-জনেই আশ্চর্য সুন্দর দু-দিক দিয়ে। কিন্তু হৈমন্তীর কথা আমি বলব না, তোমরা 'জেলস্' হবে। মানুষ ঘর বাঁধে এক জনকে নিয়ে এবং তাকে এতটা আপনার ক'রে তোলে ও তার কাছে এতখানি পায় যে পৃথিবীতে আর সব আশ্চর্য জিনিস সম্বন্ধে তার মন উদাসীন হয়ে যায়। অবশ্য, যদি তার ভাগ্য ভাল না হয় তবে এটা ঘটে না।"

তপন বলিল, "আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, কিন্তু তোমার আসল বক্তব্য কি?"

নিখিল বলিল, "আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে যে তোমরা দু-জনেই একদিকে ঝুঁকেছ! কিন্তু মনে রেখো, দু-জনের মধ্যে যে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে না, তাকে হাসিমুখে নিজের দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে। আমি তোমাদের তৃতীয় 'রাইভ্যাল' হ'তে চাই না, তাই আমি চেষ্টা ক'রে দেখব সুধার কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পড়ে কি না। তোমরা কিন্তু ওখান থেকে তাড়া খেয়ে এদিকে আসতে পাবে না। এ কথাটা দিতে পারবে আমাকে? মহেন্দ্রকে এখন বলতে গেলে সে আমার মাথা ভেঙে দেবে, তাই তাকে আপাততঃ কিছু বললাম না, শুধু তোমাকেই বলছি। তুমি এই সহজ কাজটুকু পারবে কি না বল!"

তপন বলিল, "কাজ সহজ হ'লে পারা ত উচিত। তবে তোমার নিজের মনটাকে ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে এ-কাজে হাত দিও। পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য ও অপূর্ব জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পছন্দ ও ভাললাগার একটু বিশেষত্ব থাকে। সব ভাল জিনিসই সকলের কাছে ঠিক সমান ওজনে দেখা দেয় না, কাউকে একটা জিনিস আকর্ষণ করে বেশী, কাউকে আর একটা। তোমার ভাললাগার মধ্যে ওজনের কম-বেশী কি আর নেই? আমার বুদ্ধি আর মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে আমার ত মনে হয় কোথাও একটু কম-বেশী আছেই। যদি তা থাকে তবে তাকে অগ্রাহ্য ক'রো না। যে খুব পেটুক সেও অনেক সুখাদ্য পেলে তার ভিতর একটা আগে বাছবার চেষ্টা করে। মহেন্দ্রর কথা আমি জানি না, কিন্তু আমি কারুর পাণিপ্রার্থী হয়েছি এটা তুমি আগে-ভাগে ধ'রে নিও না। তুমি নিজের মনের প্রয়োজন বুঝে কাজ ক'রো। তার পর কোথাও কৃতকার্য্য হ'লে বা না-হ'লে না-হয় আমাকে ব'লো। তোমার মন যদি হৈমন্তীর দিকে ঝুঁকে থাকে,

কারুর কথা না ভেবে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা ক'রে দেখ, যদি সুধার দিকে ঝুঁকে থাকে তাহ'লে সেখানেও চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। আমি তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না।"

নিখিল তপনের বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিজের দুই হাতের ভিতর মুখখানা অনেকক্ষণ রাখিয়া শেষে বলিল, "কাজটা বড় শক্ত। এখন যদি নূতন ক'রে আবার ভাবতে বসি, হয়ত আমার প্ল্যান সব ওলটপালট হয়ে যাবে। তার চেয়ে যেখানে তিন জনে টুঁসোটুঁসি করবার সম্ভাবনা নেই, সেইখানে যাওয়াই ভাল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পক্ষে উনিশ-বিশ ঠিক করা সহজ নয়।"

তপন বলিল, "তুমি যে এমন অদ্ভুত মানুষ তা জানতাম না! তোমাকেই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে স্বাভাবিক আমি মনে করতাম।"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি অদ্ভুত সে ত মেনেই নিচ্ছি। তবে আমি জানি পৃথিবীতে আমার মত মানুষ আরও আছে। সে যাই হোক্, তোমার কাছে আমি এক মাসের সময় চাই, তার পর আমার ভাগ্যে জয়পরাজয় যাই থাক্, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। তুমি যে দরজায়ই প্রার্থী হয়ে দাঁড়াও না, আমি সেখানে বন্ধুভাবে তোমার সাহায্য করব।"

তপন হাসিয়া বলিল, "আমার কথা অত নাই ভাবলে!"

নিখিল তপনের একটা হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিল, "ভাবছি কই? আমিই ত তোমার কাছে সাহায্যভিক্ষা করছি।"

রাত্রির অন্ধকারে একলা সুধার কাছে আপনার মনের কথা বলিয়া হৈমন্তী বুঝিতে পারে নাই দিনের আলোতে পাঁচজনের সম্মুখে একথা ভাবিতে তাহার কি রকম লাগিবে। পরদিনই মিলির বিবাহ। চারিদিকে মহা ব্যস্ততা; হৈমন্তীও যে কিছু কম ব্যস্ত ছিল তাহা নয়। কিন্তু আজ তাহার সুধা তপন মহেন্দ্র সকলের সম্বন্ধেই মনে একটা প্রবল সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিতেছে বিবাহ-উৎসব ফেলিয়া দিন-কতকের মত কোথাও পলাইয়া যায়। কিন্তু সে উপায় ত নাই। যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকিয়াই কোনও রকমে তাহাকে দিনটা কাটাইতে হইবে।

ছেলেদের অবস্থা ঠিক সে রকম না হইলেও সকলেই আগের দিনের তুলনায় একটু যেন সঙ্কুচিত। নিখিল তপনের নিকট সঙ্কুচিত, তপনও সুধা-হৈমন্তীকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিতেছে, পাছে নিখিল তাহার কোনও ব্যবহার কি কথার বিশেষ কিছু অর্থ ভাবিয়া বসে, পাছে সে মনে করে যে তপন তাড়াতাড়ি আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রও রাগে এবং অভিমানে আজ কয়দিনই একটু বেশী গম্ভীর হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। সুধা ত মনে করিয়াছিল সকালবেলা উঠিয়াই সে বাড়ী চলিয়া যাইবে। সেখানে নির্জনে নিজের মনের সঙ্গে যা-হয় একটা বোঝাপড়া তাহাকে শুরু করিতে হইবে। কিন্তু আজ মিলিদিদির বিবাহ। আজ বাড়ী চলিয়া গেলে লোকে তাহাকে বলিবে কি? সে কি কৈফিয়ৎ দিয়াই বা বাড়ী যাইতে পারে? বাড়ীতে অকস্মাৎ অঘটন ত কিছু ঘটে নাই। তাছাড়া এখানে সে আজ অনেক কাজের ভার লইয়াছিল, সে সব কাজই বা কাহার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া যাওয়া যায়! তাহাকে আজ সকলের সঙ্গে মিলিয়া হাসিমুখেই সমস্ত কর্তব্য ও আনন্দকোলাহলে যোগ দিতে হইবে। মনের একটা দিকে একেবারে চাবি বন্ধ করিয়া উৎসবের মাঝখানে তাহাকে নামিতেই হইবে।

কিন্তু একই বাড়ীতে যাহার সহিত প্রত্যেক কাজেই দেখা হইবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া থাকিবে সে কি করিয়া? চোখ বুজিয়াও যাহাকে সুধা দেখিতে

পায়, চোখের সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া কি ভুলিয়া থাকিতে পারে? তপনের গ্রীক দেবতার মত সুন্দর মুখচ্ছবি তাহার মানস-দর্পণে যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তপন কি আশ্চর্য সুন্দর! সুধার মতই আর পাঁচজনের যদি তপনকে ভাল লাগিয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। সুন্দরকে কাহার না ভাল লাগে? মানুষ ত রূপের চাবি দিয়াই মানুষকে প্রথম যাচাই করে। পরিচয় পাইবার আগেই মানুষের চোখ অপরের একটা মূল্য-নির্ধারণ করিয়া রাখে ইহারই সাহায্যে। সুধাও কি তাহাই করিয়াছে? শুধু রূপের মোহেই কি সে এমন করিয়া আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে? নিজের সম্বন্ধে একথা ভাবিতেও তাহার মাথা হেঁট হয়। যদি ইহা সত্য হয় তবে আপনার এ মোহ সে চূর্ণ করিয়া চোখের জলের সহিত বিসর্জন দিবে।

সুধা আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নীরবে আপনার মনেই নানা উপায় খুঁজিতে লাগিল। সে ভাবিতে চেষ্টা করিল যেন কোনও ভয়াবহ রোগে তপনের ঐ দেবকান্তি কালিমাময় হইয়া গিয়াছে, যেন আকস্মিক অগ্নির উৎপাতে তপনের মুখশ্রী আর মানুষের চিনিবার উপায় নাই। তখনও কি সুধা এমনই করিয়া ঐ বিগতশ্রী তপনের ধ্যান করিতে পারিবে? শঙ্কিত হইয়া সুধার মন যেন 'না' 'না' বলিয়া উঠিল। যে-তপন তপনই নয়, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, তাহাকে কি করিয়া সে অমন করিয়া ধ্যান করিতে পারে? কিন্তু তখনই লজ্জায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। এই তাহার ভালবাসা? রূপের মুখোসটুকুকেই কি শুধু সে ভালবাসিয়াছিল, মুখোস খুলিয়া লইলেই আর সেদিকে ফিরিয়া তাকাইবে না? তবে তাহার এ ভালবাসার মূল্য কি?

কানে আসিয়া বাজিল জলকল্লোলের মত তপনের মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। সুধা ওই কণ্ঠস্বর কি ভুলিতে পারে? যদি পুড়িয়া ঝলসিয়া যায় ওই দেবকান্তি, যদি সুধার দুই চক্ষুও অন্ধ হইয়া যায়, তবু বুকের দরজায় আসিয়া আঘাত করিবে ওই পরিচিত কণ্ঠের মন-মাতানো স্বর। সুধা শুধু রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই। তাহা হইলে এত সহজেই রূপহীনতার ভয়কে কাটাইয়া উঠিতে পারিত না। মন প্রথম শাসনে শঙ্কিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পলকের মধ্যে সে ভয় কাটাইয়া উঠিতেছে কিরূপে? আপনার মনুষ্যত্বে সুধার বিশ্বাস আর একটুখানি দৃঢ় হইল, আপনার প্রতি অবজ্ঞা তাহার মন হইতে দূর হইয়া মনটা

অনেকখানি হাল্কা বোধ হইল। তপনের কণ্ঠস্বরও যদি বিধাতা হরণ করিয়া লন, তবুও তপনকে সে ভুলিবে না, এ-কথা বলিবার যোগ্যতা যেন তাহার থাকে, মনে এই প্রার্থনা তাহার জাগিয়া উঠিল।

হৈমন্তীর প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমতায় সুধা আপনার প্রেম বিশ্লেষণ করিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিল। যদি তাহার প্রেমকে সে রূপের মোহ বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে তখনই যেন হৈমন্তীর পথ উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়া সে আপনি সরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় নামিয়া দেখিল, আপনাকে ওই হীনপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেই তাহার প্রেম যেন দ্বিগুণ বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে। মানুষের রূপ-যৌবন দুদিনের, কিন্তু প্রেম অবিনাশী, এ-কথা সে বহুবার পড়িয়াছে শুনিয়াছে, কিন্তু বয়োধর্ম এ-কথা কখনও ভাবিবার ইচ্ছা কি অবসর তাহাকে দেয় নাই। আজ যেন প্রৌঢ়ত্বের তত্ত্বজ্ঞান তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল।—পুষ্পের সৌরভ ক্ষণিকের হইলেও অনন্তের কণা তাহার মধ্যে জাগিয়া আছে, ঝরা ফুল হারানো ফুলের স্মৃতির ভিতরেও সেই ক্ষণিক সৌরভ চিরদিন থাকে। মানুষের যে-রূপ আজ অতীতের গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, একদিন তাহা সত্য ছিল, তাহাকেই এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চিরদিন সত্য বলিয়া দেখিবে এ ক্ষমতা কেন তাহার থাকিবে না? তপনকে এমন করিয়া ভালবাসাতেই ত সুধার ভালবাসার গৌরব।

কিন্তু হৈমন্তী? সেও কি এমনই করিয়া ভালবাসে নাই? সুধার ভালবাসা পার্থিব অর্থে হৈমন্তীর দুঃখকামনা নয় কি? মানুষ ভালবাসার যে প্রতিদান চায়, পরস্পরের ভালবাসা পরস্পরকে জানাইবার নিবেদন করিবার যে চিরপুরাতন অপূর্ব আনন্দটুকু চায়, তাহার ভিতর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই, তাহাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা চালাইতে ত সে পারে না। কিন্তু বিধাতা যে তাহার ভাগ্যে তৃতীয় ব্যক্তিই লিখিয়াছেন। সুধা যদি সাধারণ মানুষের মত ভালবাসার আদান-প্রদানের আনন্দ কামনা করে তবে সে ত হৈমন্তীর দুঃখকামনাই করিতেছে। তপন সুধাকে ভালবাসুক এই ইচ্ছাই ত হৈমন্তীর দুঃখকামনা! হৈমন্তী সুধার মনের কথা জানে না, সে যদি আকুল আগ্রহে তপনকে চায়, তাহাকে পাইবার চেষ্টা আপ্রাণ করে, তবে তাহাকে প্রেমধর্মের অনুকূল কামনাই বলিতে হইবে। কিন্তু সুধা যে হৈমন্তীর মনের কথা জানিয়াছে, সুধা যে এত দীর্ঘদিন ধরিয়া হৈমন্তীকে এমন গভীরভাবে

ভালবাসিয়াছে, সে যদি হৈমন্তীর মত কামনা করে, তবে আপনাকে যে অপরাধী মনে হয় আপন দেবতার নিকট। তপনকে আপনার অধিকারের গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে চাওয়া, তপনের কাছে যে কথা একদিন শুনিবার আশা সে করিয়াছিল সে কথা আর শুনিতে চাওয়া, হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে কি তবে ভুলিতে হইবে?

উৎসব-আয়োজনের মাঝখানে সুধার চোখে জল আসিল। মিলি তাহার জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল শুধু ধৈর্যের জোরে, শুধু আপনার দৃঢ়-চিত্ততার জোরে। হয়ত সুধাও একদিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে ধৈর্য ও দৃঢ়চিত্ততার জোরে। কিন্তু মিলির মত প্রবন্ধার কি তাহার জীবনে আসিবে? আজ ত তাহার পথ সে কোথাও দেখিতে পাইতেছে না। কেন বিধাতা তাহাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন যাহাতে জীবনের প্রথম সুখস্বপ্নের মধ্যেই তাহাকে ত্যাগের মন্ত্র জপ করিতে হইবে? তাহার যে সোনার স্বপ্নের মধ্যে বিধাতার সৃষ্টির কি বিধানের কোনও অন্যথাচরণ নাই, কোনও মানুষ কি জীবের অমঙ্গলকামনা নাই, তাহা এক মুহূর্তে তাহারই মনের কাছে এমন অপরাধ হইয়া উঠিল কেন? কেন ইহা হইতে মুক্তির উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছে না?

শৈশবের স্বপ্নে একদিন যেমন সে তলাইয়া গিয়াছিল, তাহার এ যৌবন-স্বপ্নেও সে তেমনই করিয়া ডুবিয়া যাইবে বলিয়া কত মায়ায়, কত সাধে, কত রহস্যে ইহাকে সে অপূর্ব করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। এই প্রথম ধাপের পর হয়ত কত দীর্ঘদিনের দীর্ঘ পথ পড়িয়াছিল বিস্ময়ে আনন্দে ও সৌন্দর্যে অপরূপ। কিন্তু মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে সে স্বপ্ন-কাননের ছায়া?

তপনের মনে সুধা কি হৈমন্তী কাহারও সম্বন্ধে কোনও চিন্তা উঠিয়াছে কি না, জীবনে সঙ্গীর কোনও প্রয়োজন কি আহ্বান সে অনুভব করিয়াছে কি না সুধা কিছুই জানে না। হইতে পারে সে এ-বিষয়ে কিছু ভাবে না, যদিও সুধার সে-কথা বিশ্বাস হয় না। তবে যাহার কোন প্রমাণ সে কিছু পায় নাই তাহা বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করাই ভাল। হইতে পারে মহেন্দ্রের মত সেও ওই উপকথার রাজকন্যাটিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিয়াছে। সুধা তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইবে না। আপনি যখন তাহা সুধার নিকট প্রকাশ হইবে তখন ত সে জানিতেই পারিবে।

ভোরবেলা কখন বিছানা ছাড়িয়া হৈমন্তী চলিয়া গিয়াছিল, ভোরের সামান্য একটু ঘুমের মধ্যে সুধা তাহা জানিতে পারে নাই। সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া এই সব চিন্তায় ঘরের বাহির হইতে তাহার দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি তৈয়ারী হইয়া লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। হয়ত নীচে কাজকর্ম সুরু হইয়া গিয়াছে, কত লোকজন আসিয়া পড়িয়াছে, হয়ত তপন নিখিলরাও আসিয়া কাজে লাগিয়াছে। সে সকলের চেয়ে দেরী করিয়া নীচে নামিলে লোকের কাছে বলিবে কি?

সকলেই কাজে ব্যস্ত দেখা গেল। কিন্তু আজ কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না। হৈমন্তী তরকারি কোটায় মোটেই অভ্যস্ত নয়। হয় লেখাপড়ার কাজ, না-হয় ঘর সাজানো, এই দুইটার একটাতেই তাহার হাত-যশ বেশী। কথা ছিল বাসরঘর সাজাইবার ভার সে লইবে, তাহার কথামতই ছেলেরা ঘর সাজাইবে। কিন্তু অকস্মাৎ সকালে উঠিয়া সে বলিল, "আমার এত হুড়াহুড়ির কাজ ভাল লাগছে না। আমি এক জায়গায় ব'সে তরকারি কুটি। স্নেহ এসেছে, ওর বেশ টেষ্ট আছে, ওই ঘর সাজাতে সাহায্য করতে পারবে।"

অগত্যা তপন স্নেহলতার সাহায্যেই ঘর সাজাইতে লাগিয়াছে। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারিয়া সে চলিয়া যাইবে। আজ এ-বাড়ী বেশীক্ষণ সে থাকিবে না, সুরেশের বাড়ীতে বরযাত্রীর আদর-অভ্যর্থনার কাজেও তাহার প্রয়োজন আছে। সেখানে কাজ করিবার মানুষ বিশেষ কেহই নাই। এতদিন সকলে মিলিয়া মেয়ের বাড়ীর কাজে মাতিয়াছিল, একটা দিন অন্ততঃ কিছুক্ষণ বরের বাড়ীর কাজও করা দরকার। বিবাহ ব্যাপারে কন্যার স্থান যতই উপরে হউক, বরের অন্ততঃ সভা জাঁকাইয়া একবার আসার আয়োজন ত আছে।

সভার চেয়ার সাজানো ও কার্পেট পাতার কাজে নিখিলের খুব যে প্রয়োজন ছিল তাহা নয়, কিন্তু সে গিয়া জুটিয়াছে সেইখানে। যত মুটের মাথা হইতে চেয়ার নামাইয়া ও কার্পেটের রোল খুলিয়া সে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হৈমন্তীদের গ্রামের আত্মীয় আর দুই-তিনটি ছেলে তাহার সহিত কাজে মাতিয়াছে; মানুষগুলি একেবারেই অচেনা বলিয়া নিখিলের সঙ্কুচিত ভাবটা অনেকখানিই এখানে কাটিয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র গিয়া সুরু করিয়াছে আহারের ঠাঁই করার কাজ। ছাত জুড়িয়া আসন পাতা, ফুটা গেলাস বাছিয়া ফেলা, ছোট ছেলেমেয়েরা ছেড়ান্তাকড়ায় করিয়া সব পাতা মুছিয়াছে কিনা তদারক করা, এই সব নানা কাজ। এখানে বেশীর ভাগই কুচোকাচার দল। সুধা আর-সকলের অপেক্ষা মহেন্দ্রকেই আজ বেশী নিরাপদ মনে করিয়া এইখানেই গিয়া জুটিল।

কিছুক্ষণ দুই জনেই নীরবে কাজ করিল। তার পর মহেন্দ্রই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আপনাদের সভায় আমিই ছিলাম 'হংসমধ্যে বকো যথা,' এবার ত আমি চললাম, আপনারা নিষ্কণ্টক হবেন।"

সুধা বলিল, "এরই মধ্যে আপনি আবার কোথায় চললেন?"

মহেন্দ্র বলিল, "আমি খুব শীগগিরই জার্মানী চ'লে যাচ্ছি। আগে মনে করেছিলাম, কিছুদিন পরে গেলেও চলবে। এখন ভাবছি, যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। আপনার বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে দেবেন, তাদের চক্ষুশূল কেউ আর থাকবে না।"

সুধা বলিল, "আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার সঙ্গে আমাদের কি ওই রকম সম্পর্ক? আমার ত কোনওদিন তা মনে হয় নি।"

মহেন্দ্র বলিল, "আপনার না হতে পারে, আমারও এক সময় মনে হত না। কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সকলের ঘ্যাটিচুড দেখে তাই মনে হচ্ছে।"

দুঃখের ভিতরও সুধার হাসি আসিল। মহেন্দ্র "বন্ধুবান্ধব, সকলে" ইত্যাদি সকল কথাতেই গৌরবে বহুবচন বসাইতেছে।

কাজ ফেলিয়া সে একবার ভাঁড়ার-ঘরের দিকে চলিল। হৈমন্তী তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে সুধা বুঝিয়াছিল, তবু মহেন্দ্র-বেচারার বিদায়বার্তাটা তাহার নিজের মুখেই হৈমন্তীর শোনা উচিত মনে করিয়া সুধা তাহাকে একবার ছাদে ডাকিয়া আনিবে ঠিক করিল।

মস্ত বড় একটা পাকা কুমড়াকে দুইখানা করিবার চেষ্টায় হৈমন্তী তখন ব্যস্ত। পালিত-গৃহিণী তাহার কাজে বাধা দিতেছিলেন কারণ স্ত্রীলোকের নাকি লাউ-কুমড়া দুখানা করা শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্রের কথা অমান্য করিবার জন্যই হৈমন্তীর জেদ বেশী।

সুধা আসিয়া বলিল, "একবারটি উপরে এস দেখি। ছাদে একটা কাজ আছে।"

কুমড়াটা তখনকার মত রাখিয়া হৈমন্তী সুধার পিছন পিছন চলিল। একবার সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সুধার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সুধা কোনই জবাব দিল না।

ছাদের দরজার পাশে চিলেকোঠায় মহেন্দ্র বড় বড় জালায় জল বোঝাই করাইতেছিল, উড়ে ভারীদের চীৎকার-চেঁচামেচিতে ছাদ তখন মুখরিত। অকস্মাৎ সুধা ও হৈমন্তীকে সেখানে দেখিয়া মহেন্দ্র কুঠরির বাহিরে বাহির হইয়া আসিল।

সুধা বলিল, "জালার ভিতর একটা ক'রে কর্পূরের ছোট পুঁটলি ফে'লে রাখলে কেমন হয়? অনেকে বলে ওতে জল সুগন্ধিও হয়, আর জলের দোষও কেটে যায়"

হৈমন্তী বলিল, "ভাল হয় ব'লেই ত আমারও মনে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, দাঁড়াও আমি কিছু কর্পূর জোগাড় ক'রে আনি।" বলিয়া সুধা তখনই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সুধা চলিয়া যাইতেই মহেন্দ্র বলিল, "হৈমন্তী, তুমি সেদিন থেকে আমার সঙ্গে আর কথা বল না, আমার উপর তুমি খুব রাগ করেছ, না?"

হৈমন্তী বলিল, 'রাগ কেন করব? রাগ আমি এক ফোঁটাও করি নি। আপনি কিছু অন্যায় কাজ ত আর করেন নি। আপনার সঙ্গে আমার যদি কোনও বিষয়ে মতভেদ হয় তাতে কিছু রাগ করবার কারণ আছে ব'লে আমি মনে করি না।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এটা ঠিক মতভেদ নয়। আমি তোমার দরজায় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি দরিদ্রের প্রার্থনা শুনতে রাজি নও, এই তোমার আমার ঝগড়া। কিন্তু তা ব'লে আর কি এদিকে ফিরেও তাকাবে না?"

হৈমন্তী বলিল, "আপনার সব বাড়াবাড়ি কথা। আমি রোজই ত আপনার সঙ্গে কথা বলছি। কোন দিন কথা বলিনি বলুন।"

মহেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ বল বটে, পাচফোড়নের একফোড়নের মত। ওটা আমার সঙ্গে কথা বলাও যত আর ভেমো গোয়ালার সঙ্গে বলাও তত। আমি কানে তোমার গলার স্বরটা শুনতে পাই, এতে যদি আমার সঙ্গে কথা বলা হয় তবে নিশ্চয়ই বল।"

হৈমন্তী ম্লান হাসিয়া বলিল, "কি করব মহেন্দ্রদা, আপনি আবার কিসে

রাগ ক'রে বস্‌বেন; তাছাড়া ওইরকম সব কথার পর আমার কি রকম অপ্রস্তুত লাগে আগের মত বক্ বক্ করতে।"

মহেন্দ্র হঠাৎ কথার সুর বদলাইয়া বলিল, "হৈমন্তী, তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ ঠিক ক'রে ফেলেছ? আমার একথাটুকুর অন্তত: ঠিক জবাব দিও।"

হৈমন্তী বলিল, "না, আমি কিছু ঠিক ক'রে ফেলিনি। কোনওদিন ঠিক ক'রে ফেলব কি না তাও জানি না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তবে আমি মনে একটু ক্ষীণ আশা রাখতে পারি না কি?"

হৈমন্তী বলিল, "একবার ত ওসব কথা হয়ে গিয়েছে মহেন্দ্রদা। আমার অনেক কাজ রয়েছে, আমি এখন নীচে যাই। আবার কেন মিথ্যা কথা কাটাকাটি ক'রে আপনাকে রাগাব?"

মহেন্দ্র বলিল, "না, তুমি এখন নীচে যাবে না। তোমাকে কয়েকটা কথা শুনে যেতেই হবে। তুমি আমার কথার জবাব দেবে না জানি, তবু আর একবার বলছি, যদি আমার উপর বিন্দুমাত্র করুণাও তোমার হৃদে থাকে চ'লে যাবার আগে আমায় সেটা জানতে দিও। আর এক মাসের মধ্যেই আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি। তার ভিতর তোমার সঙ্গে দুই একদিনের বেশী বোধ হয় দেখাই হবে না। আমার দুরদৃষ্ট তার ভিতর প্রসন্ন হবে এমন আশা করি না। কিন্তু জেনো, যতদিন তুমি নিতান্তই না পর হয়ে যাচ্ছ ততদিন যেখানেই থাকি না কেন তোমার আশা আমি ছেড়ে দেব না।"

হৈমন্তী বলিল, "আপনাকে কোনও কাজে কি চিন্তায় বাধা দেবার অধিকার ত আমার নেই, আমি আর কি বলব? আমি নিজেকে এমন মূল্যবান্ মনে করি না, যার জন্য মিথ্যা আশায় আপনার মত মানুষের এত দীর্ঘকাল নষ্ট করা উচিত। আপনি বিদ্যালাভের আশায় বিদেশে যাচ্ছেন, বিদ্যা আপনার মনের এ-সব ক্ষোভ ভুলিয়ে দিক, এই প্রার্থনা করি।"

মহেন্দ্র বলিল, "তোমার গুড্ উইশেসের জন্য অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার মনের ক্ষোভ আমার জিনিস, আমি ভুলি না-ভুলি সে আমার ভাবনা। সে-বিষয়ে তোমার কোনও সাহায্য আমি চাইছি না। একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি, যদি ইচ্ছা হয় আমার এই অনুরোধটুকু রক্ষা ক'রো। আমি ত শীগগীরই চ'লে যাব, আমি চ'লে যাবার আগে কি পরে যদি তুমি নিজের সম্বন্ধে পাকা বন্দোবস্ত কিছু ক'রে ফেল, আমাকে দয়া ক'রে জানিও। যতদিন

তোমার কাছ থেকে খবর না পাব, তোমার সম্বন্ধে দুরাশা আমার মন থেকে যাবে না।"

হৈমন্তী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, "যদি জানাবার মত কিছু ঘটে তবে জানাব। কিন্তু কেন আপনি বিশেষ ক'রে ওই দিকে ঝোঁক দিচ্ছেন? আমি একলা কিছুকাল পৃথিবীতে বাস করতে কি পারি না?

মহেন্দ্র বলিল, "তুমি করতে পার, তবে তোমাকে একলা না থাকতে দেবার লোক ঢের আছে।"

হৈমন্তী বলিল, "কে বলেছে আপনাকে এ-কথা?"

মহেন্দ্র বলিল, "কে আবার বলবে? আমি কি চোখে দেখতে পাই না? তপন নিখিল সকলেরই মনে ওই এক চিন্তা। আমি চলে গেলে ওদের পথ পরিষ্কার হবে।"

হৈমন্তীর বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শুধু বলিল, "আপনার মাথায় এতও আসে।"

মহেন্দ্র হৈমন্তীর আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "না এসে উপায় কি হৈমন্তী? তুমি ছাড়া আমার যে দ্বিতীয় চিন্তা নেই। তোমাকে আমার চোখের উপর থেকে কে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে তার খোজ আমি করব না ত কে করবে?"

হৈমন্তী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র তাহার দুইটা হাত আপনার দুই মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "হৈমন্তী, যদি মানুষের একাগ্রতার কি সাধনার কোনও মূল্য থাকে, তবে তোমাকে আমি আমার ক'রে পাবই, তুমি যতই কেন মুখ ফিরিয়ে স'রে যাও না। আমি দূরে চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু আমার সমস্ত মন এইখানেই তোমাকে ঘিরে প'ড়ে থাকবে, তুমি অনুভব করবে, তুমি ভুলে যেতে পারবে না।"

হৈমন্তীর দুইখানা হাত মহেন্দ্রের হাতের ভিতর ঘামিয়া ও কাঁপিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে হাত দুইখানা ছাড়াইয়া লইল।

উৎসব-সমারোহ শেষ হইয়া গিয়াছে। মিলি সুরেশ তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহে নূতন সংসার পাতিয়াছে। তাহারা এখনও ঘর-সংসার গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা কর্তব্যের দায়ে তাহাদের একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মহেন্দ্র সত্যসত্যই দুই বৎসরের জন্য জার্মানী চলিয়া যাইবে। মিলিদের বিবাহে যে কয়জন প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহাদের মধ্যে একজন। মহেন্দ্রকে বিদায়-বেলা একটু আদর অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে না ডাকিলে ভদ্রতা হয় না।

আজ মহেন্দ্রের বিদায় উপলক্ষে সুরেশ তাহাদের ছোট দলটিকে নিজেদের বাড়ীতে ডাকিয়াছে। বাড়ীতে আসবাব খুব বেশী নাই, কাজেই ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। হেলান দিয়া বসিবার জন্য যথেষ্ট তাকিয়া নাই, মিলি আজ বিছানা হইতে মাথার বালিশগুলি তুলিয়া আনিয়া ফরাসের উপর সাজাইয়াছে। বাড়ীতে ট্রে মাত্র একটা, কিন্তু দানসামগ্রীতে বড় বড় থালা গোটা-দুই পাওয়া গিয়াছে। সেই থালার উপরেই খাবারের রেকাবীগুলি সাজাইয়া খাবার পরিবেশন করা হইবে ঠিক হইল। মিলির হাতে একটা থালা, সুরেশের হাতে আর একটি। রেকাবীগুলি কিন্তু কাঁসার পাওয়া যায় নাই, সেগুলি কাচেরই। তাহাদের জলখাবারের দুইখানা মাত্র কাঁসার রেকাবী আছে, তাহাতে পান মশলা সাজাইয়া টি-সেটের কাচের প্লেটগুলিই কাঁসার থালার উপর সাজান হইয়াছে। নিখিল বলিল, "তোমাদের ঘরের সাজসজ্জা সবই বেশ দেশী রকম হয়েছে, কেবল এই টি-সেটটা ছাড়া। এটা খাঁটি সাহেবের দোকান থেকে আমদানি।"

মিলি বলিল, "আমার পাথরবাটি জামবাটি সবই আছে, দিশী মতে তাতে চা দিতে পারতাম, কিন্তু খাবারগুলো ত হাতে হাতে তুলে দিতে পারি না; তাই দায়ে প'ড়ে বিলিতী সেটটাই বার করতে হল।"

নিখিল বলিল, "ফুলকাটা মাটির সরা পাওয়া যায়, তাইতে খাবার দিয়ে আর স্টেশনের হিন্দু চায়ের মত মাটির ভাঁড়ে চা দিলে কিছু মন্দ হ'ত না।"

মহেন্দ্র বলিল, "মানুষের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে হ'লে ওইটাই সব চেয়ে ভাল প্রথা বলতে হবে। একবার উচ্ছিষ্ট বাসন আর না ব্যবহার করা এক মাটির জিনিস ব্যবহার করলেই হয়।"

সুধা বলিল, "পাতার বাসন আরও ভাল। আমাদের দেশে পাতার থালা বাটি সবই লোকে ব্যবহার করে। এখানে শহরের মাঝখানে গাছই নেই ত পাতা কোথা থেকে আসবে?"

তপন বলিল, "গাছ নেই ব'লে পাতার অভাব আছে মনে করবেন না। বাজারে গেলেই যত পাতা চান কিনতে পাবেন। তবে আপনাদের দেশের মত শালপাতা নয়, কলার পাতা।"

হৈমন্তী বলিল, "পাতার বাসন, পাতার আসন দিয়ে একদিন পিকনিক করলে মন্দ হয় না।"

তপন বলিল, "দল যে রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, এখন কি আর চট্ ক'রে পিকনিক হবে?"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "তা না-হয় হৈমন্তী দেবীর গৃহ-প্রবেশের সময় আমরা সবাই পাতার বাসন গাঁথতে ব'সে যাব।"

হৈমন্তী বলিল; "অত সুদূর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সম্প্রতি একটা কিছু করবার ব্যবস্থা করলেই ত ভাল হয়।"

নিখিল বলিল, "যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে আপনাদের ভবিষ্যৎকে সুদূরপরাহত মনে করবার কোনও কারণ দেখছি না।"

হৈমন্তী বলিল, "আচ্ছা, আপনি মস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা হয়েছেন, আপনাকে আর বেশী ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে না।"

নিখিল তবুও হাসিয়া বলিল, "ডব্‌ল-ব্যারেল্‌ড্ গানের সামনে পড়লে মানুষের প্রাণ আর কতক্ষণ টেঁকে? আপনি কি এতই বজ্রকঠিন?"

তপন ও মহেন্দ্র দুইজনেই নিখিলের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইল। হৈমন্তী মুখ লাল করিয়া একবার তপনের দিকে চাহিয়া দেখিল। তপন তখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া আছে। মহেন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, "সুরেশ-দা, তোমাদের প্রোগ্রামে এর চেয়ে ভাল আলোচ্য বিষয় কি কিছু নেই? যদি নিতান্তই কিছু না থাকে, না-হয় গ্রামোফোনটা বাজাও, যাবার আগে গোটা-কয়েক ভাল গান শুনে যাই।"

মিলি বলিল, গ্রামোফোনের গান শোনবার আগে কিছু আনারসের সরবং খেয়ে দেখুন, প্রোগামে একটু বৈচিত্র্য অনুভব করতে পারেন।"

নিখিল ভরসা পাইয়া বলিল, "এমন ভাল জিনিসের কথা আগে বলেন নি কেন? তাহলে ব্রহ্মতেজে ভস্ম হবার সম্ভাবনাটা আমার একটু কমত।"

মিলি থালার উপর কতকগুলি কাল পাথরের উঁচু উঁচু বাটি বসাইয়া সরবং আনিয়া হাজির করিল। সুরেশ সেই সঙ্গেই তাহার পোর্টেব্‌ল্ গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগাইয়া দিল,

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর—"

নিখিল চীৎকার করিয়া উঠিল, "সুরেশ-দা, কর কি, কর কি! এখুনি আদালতে তোমার নামে নালিশ রুজু হয়ে যাবে।"

সুরেশ বলিল, "এটা ত আমার 'অনারে' হচ্ছে না, তোমাদের অনারেই হচ্ছে। তোমাদের তিন-তিনজনের ভাবনার কাছে আমার একলার সুখদুঃখ অতি তুচ্ছ জিনিস।"

মিলি বলিল, তার চেয়ে ওই গানটা দাও না---

"এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘন ঘোর বরিষায়—"

সুরেশ বলিল, "আচ্ছা, একে একে সবই হবে। যতগুলো বর্ষার গান আছে সব ক'টাই পরে পরে লাগিয়ে দেব।"

সরবং চা ও নিউমার্কেটের ডালমুটের সঙ্গে বহুক্ষণ গ্রামোফোন ও কণ্ঠসঙ্গীত চলিল। বহুদিন পরে যেন তাহাদের ছাদের সভা আবার সুরেশের ঘরে জাঁকিয়া উঠিল। মহেন্দ্র ইউরোপীয় স্ত্রী লইয়া দেশে ফিরিলে তাহাদের সভাকে কি রকম অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে তাহা লইয়া সুরেশ রসিকতার সূচনাও একবার করিয়া ছিল, কিন্তু কাহারও নিকট উৎসাহ পাইল না।

তখন রাত্রি হইয়াছে। বাহিরে টিপ টিপ করিয়া একটানা বৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু ধারাবর্ষণ নাই। হৈমন্তী বলিল, তাহার গাড়ীতে সে তাহাদের দলের সকলকে পৌছাইয়া দিতে পারে।

মহেন্দ্র ও তপন দুইজনেই সমস্বরে বলিল, "এইটুকু টিপটিপে বৃষ্টিতে গাড়ী চড়বার কিছু দরকার নেই। আমরা এমনই বেশ পাড়ি দিতে পারব। প্রায় সবটাই ত ট্রামে যাব, দু-চার পা খালি হাঁটা।"

সুরেশ বলিল, "ওহে নিখিল, তুমি ত চিরকালের শিভালরাস জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান, এত রাত্রে বর্ষার দিনে ভদ্রমহিলাদের একলা ফে'লে পালানো তোমার উচিত নয়। তুমি না-হয় যাও, ওঁদের পৌঁছে দিয়ে এস।"

নিখিল বলিল, "আমায় হুকুম করলেই যাব। আমার ওতে মান্য বৃদ্ধিই হয়, হানি কিছু হয় না।"

মহেন্দ্র বলিল, "যাক্, এই সুযোগে নিজের দর কিছু বাড়িয়ে নিলে। তোমারই সুনাম থাক। সবাই মিলে গাড়ীতে ভিড় করলেও এখন ত আর আমাদের যশ হবে না।"

মহেন্দ্র ও তপন ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নিখিল সুধা ও হৈমন্তীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

হৈমন্তীর গাড়া, কাজেই সুধাকে আগে নামাইয়া দেওয়া ভদ্রতা। সুধাকে বাড়ীর দরজায় ছাতা ধরিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া নিখিল বলিল, "এবার আপনাদের বাড়া চলুন।"

হৈমন্তী বলিল, "আর আপনি?"

নিখিল বলিল, "আমি ত মস্ত লোক, আমার জন্যে আবার ভাবনা? আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি সোজা দৌড় দিয়ে বাড়ী গিয়ে উঠব।"

হৈমন্তী তাহাতে রাজী হইল না। তখন ঠিক হইল, হৈমন্তী নামিবার পর ঐ গাড়ীতেই নিখিল বাড়ী যাইবে।

গাড়ীতে নিখিল ও হৈমন্তী ছাড়া আর কেহ ছিল না। বর্ষার বিষণ্ণ রাত্রি। মানুষের মনে বাহিরের চেয়ে ভিতরের কথাই বেশী বড় হইয়া উঠে এমন সময়ে। হৈমন্তী ভাবিতেছিল আপনার অদৃষ্টচক্রের কথা। মন তাহাকে টানিতেছে একদিকে, কিন্তু তাহার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল আর একজন। এই সমস্যার মাঝখানে আজ আবার নিখিল অকস্মাৎ নূতন কি একটা ঠাট্টা করিয়া বসিল। মহেন্দ্রও ত সেদিন এই ধরণেরই কথা বলিয়াছিল। হৈমন্তীকে একলা না থাকিতে দিবার লোকের নাকি অভাব নাই। তপন ও নিখিলেরও নাকি ওই একই চিন্তা। নিখিলের বিষয়ে কথাটা সম্পূর্ণই আন্দাজ বলিয়া মনে হয়। না হইলে সে নিজেই হৈমন্তীকে ঠাট্টা করিবে কেন? কিন্তু মহেন্দ্র ও নিখিল দুইজনেই ত বলিতে চাহে যে তপনেরও মন এইদিকে। নিখিলকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা কি হৈমন্তীর উচিত? যদি নিখিল তাহাকে কিছু মনে

করে? স্ত্রীলোকের পক্ষে এই জাতীয় প্রশ্ন করা ঠিক শালীনতার পর্যায়ে পড়ে কি না হৈমন্তী ঠিক করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল নিখিলের ঠাট্টার কারণটা জানিবার জন্য। এ-কথাটা জানা তাহার নিতান্তই দরকার। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে শুধু যে হৈমন্তীর মনটা ঠাণ্ডা হইবে তাহা নয়, মহেন্দ্রকেও একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয়ত যাইবে। বেচারী মহেন্দ্র কেন দীর্ঘকাল ধরিয়া ওই ভাবনার পিছনে ঘুরিয়া মরিবে? হৈমন্তীও পথ খুঁজিয়া হায়রান হইয়া গেল কি করিয়া মহেন্দ্রর নিকট হইতে সে লুকাইতে পারে। দূর দেশে মহেন্দ্র যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতেও সে হৈমন্তীকে নিষ্কৃতি দিবে না নিশ্চয়ই।

হৈমন্তী বলিয়া বসিল, "আপনি মিনিদির বাড়ীতে আমায় সকলের সামনে ওরকম ঠাট্টা কেন করছিলেন? বাইরের লোকও ত ছিল।"

নিখিল বলিল, "আমি ত কারুর নাম করিনি। আর মিথ্যে কথাও যে বলেছি তা মনে হয় না। তা থাকগে, আর ওসব কথা কখনও তুলব না, এবারকার মত আমায় মাপ করবেন। মহেন্দ্রর কথা আমি ধ্রুব সত্য ব'লে অবশ্য বলতে পারি না, কিন্তু তপনের বাড়ীতে আমি এ-কথা তাকে বলেছিলাম, সে ত অস্বীকার করেনি।"

হৈমন্তী একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "এটা কি আপনাদের একটা আলোচনার বিষয়?"

নিখিল লজ্জিত হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, "না, না, সে কি কথা? সে কি কখনও হতে পারে? তপন আমার বিশেষ বন্ধু, আমি তার মন জানবার জন্যে একবার মাত্র এ-কথা বলেছিলাম। না হ'লে সে কখনও নিজে থেকে এ-কথা উচ্চারণ করেনি। তার বরং প্রতিজ্ঞাই আছে, এ বিষয়ে কথায় কি ব্যবহারে কিছুকাল কোনও মানুষের কাছেই সে কিছু প্রকাশ করবে না।"

হৈমন্তী আর কৌতূহল দেখাইতে পারিল না। যে আলোচনার জন্য নিখিলের প্রতি সে বিরক্ত হইতেছিল, নিজেই তাহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করা তাহার অত্যন্তই অশোভন মনে হইল। কিন্তু তবু তাহার মনে এ প্রশ্ন জাগিতেছিল, তপনের মনে যদি এই কথাই আছে, তবে সে কাহারও কাছে কিছু প্রকাশ করিবে না কেন? যাহার কাছে প্রকাশ করাটা সকলের আগে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, সেও কেন বাদ যাইবে? নিখিলের কথা সত্য ত?

মিথ্যা কথাই বা অকারণ কেন নিখিল বলিবে? হয়ত তপনের সকল কাজেই নিজস্ব এই রকম একটা ধরণ আছে। সে ত ঠিক সাধারণ আর পাঁচজনের মত ব্যবহার কোনও কাজেই করে না।

নিখিলের কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হৈমন্তীর মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল; সংশয়কে সে মনে স্থান দিতে পারিতেছিল না। পৃথিবীতে যাহা এত দেশে এত কালে সত্য হইয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার বেলাই কেন সত্য হইবে না? একজনও স্পষ্ট করিয়া বলিবার আগে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, মানবপ্রেমের ইতিহাসে ইহা কি এমনই অভূতপূর্ব ঘটনা? ইহাই ত স্বাভাবিক, ইহাকেই সত্য বলিয়া হৈমন্তী বিশ্বাস করিবে। সে ছেলেবেলায় বিলাতী আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিল বলিয়া পুরুষজাতিকে যে রকম বিলাতী উপন্যাসের নায়কের মত মনে করে, বাঙালীর ঘরের স্বল্পবাক্ যুবক তপন সে রকম না হইতেই ত পারে। মনের কথা হৈমন্তীর কাছে প্রকাশ করিতে হয়ত তাহার অনেকদিন লাগিবে। কিন্তু হৈমন্তীর মনে তপনের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলেও অভিমান হইল। নিখিলের কাছে এ-কথা স্বীকার করিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? এই একটি কথা তাহার তপনের মুখে সর্বপ্রথম শুনিবার অধিকার ছিল না? না-হয় সে দুই দিন পরে শুনিত, কিন্তু নিখিলের কাছে শোনার চেয়ে সে-শোনার মূল্য যে অনেক বেশী ছিল। তপনের স্বাদেশিকতার আইনে কি বলে তপনই জানে, কিন্তু নিখিলের মাঝখানে আসিয়া পড়াটা হৈমন্তী কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না।

৩১

বর্ষা যাই-যাই করিয়াও যায় না। পথের ধারে খানায় খন্দে জল এখনও থই-থই করিতেছে, কিন্তু তাহার উপর রৌদ্রের হাসিও থাকিয়া থাকিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। আকাশে কালো মেঘের বুক চিরিয়া সূর্য কিরণ ঝলসাইয়া উঠিতেছে।

হৈমন্তীর মনেও আলো-অন্ধকারের খেলা এমনই করিয়া চলিয়াছে। নিখিলের একটা আকস্মিক উক্তিতে তাহার মনে নূতন রং ধরিয়াছে, সংশয়ের মেঘ বারে বারে ছিন্ন হইয়া আশার দীপ্তি ফাটিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পরের মুখের কথায় মনকে এতখানি নিঃসংশয় করা কি সহজ? হৈমন্তীর মনের কোণের আশার আলোটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে উঠিতেই আবার ম্লান হইয়া যায়। তপন হৈমন্তীকে ত কিছুই বলে নাই, তবে তাহাকে নিজের মনের কথা হৈমন্তী কি করিয়া বলিবে? ভদ্রতার শাস্ত্রে, শালীনতার শাস্ত্রে ইহা যে নিষিদ্ধ। এমন ত নয় যে তপনের মনের কথা বলিবার কোনও সুযোগ ঘটে নাই। পৃথিবীতে কত দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া মানুষ কতবার এ সুযোগ আপনি করিয়া লইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সে তুলনায় তপন ত কত সুযোগ হেলায় হারাইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু হয়ত সব মানুষ এক রকম নয়। এক ক্ষেত্রে যে বীরশ্রেষ্ঠ, অন্য ক্ষেত্রে তাহার ভীরুতার সীমা নাই, এমন মানুষ ত কত-শত আছে। তপন কি সেই রকম মানুষ হইতে পারে না? হয়ত তাহাই, না হইলে এই অকারণ নীরবতার প্রতিজ্ঞার কোনও অর্থ হয় না। মানুষ এই সঙ্কোচকে ভীরুতাই বলে বটে, কিন্তু হৈমন্তীর মন তাহা বলিতে চাহে না।

মিলির বিবাহের পর হইতেই বাড়ীটা কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। এ বাড়ীতে কেহই আর আসে না। সুরেশের বাড়ীর পার্টির পর তপন এবং নিখিল একবারও এ বাড়ীতে আসে নাই। একটুখানি খবরের টুকরা কি এককণা আশার ইঙ্গিতের জন্য হৈমন্তীর মন ছটফট্ করিতেছিল। কিন্তু কোথায়ও সাড়া নাই। সুধা আসিলে তাহার কাছে মনের কথা বলিয়া হয়ত

একটু মনটা হাল্কা হইত, অথবা একটুখানি সুপরামর্শ পাওয়া যাইত। কিন্তু সুধাও এখানে নাই, সে সুরেশদের পার্টির পরদিনই মহামায়াকে লইয়া নয়ানজোড়ে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক কবে যে আসিবে, তাহাও বলিয়া যায় নাই।

মনে এতবড় একটা বোঝা লইয়া নিঃসঙ্গ দিনগুলা হৈমন্তী কি করিয়া কাটাইবে? তাহার মন অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতটুকু একটু খাঁটি খবর কি পাওয়া যায় না? তপন ছাড়া আর কে তাহা দিতে পারে? অন্যের মুখের কথা ত হৈমন্তী দুইবার শুনিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মন ত ঠাণ্ডা হয় না। তপনের মনে এদিক্‌কার সম্বন্ধে হয়ত কোনও ভুল ধারণা আছে, হয়ত এমন কোনও বাধাকে সে দুরতিক্রমণীয় মনে করিতেছে, যাহা বাস্তবিক কোনও বাধাই নয়; তাই যথাস্থানে তাহার মনের কথা আসিয়া পৌঁছিতেছে না। এমন সময় শালীনতার শাস্ত্রে হৈমন্তী যে আচরণ নিষিদ্ধ মনে করিতেছে, বাস্তবিক কি তাহা নিষিদ্ধ? যদি তপনের কোনও ভুল সে ভাঙিয়া দিতে পারে, যদি তাহার কোনও বাধা দূর করিয়া পথ সুগম করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সে কার্যে হৈমন্তীর একটুখানি অগ্রসর হওয়াই ত ন্যায়সঙ্গত ও মনুষ্যজনোচিত কার্য। হৈমন্তী এই লইয়া আর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে না। যদি তাহার একটুখানি অগ্রসর হওয়া ভুলই হয়, তাহাতেই বা কি যায় আসে? মানুষ ভাল ভাবিয়া ভুল কি করে না? ভুল হইবার ভয়ে নিশ্চল বসিয়া থাকিলে শিশু ত কোনওদিন হাঁটিতেও শিখিত না। তাছাড়া সে যাহার সম্বন্ধে ও যাহার কাছে ভুল করিবে, সে মানুষটি ত তপন ছাড়া আর কেহ নয়। হৈমন্তীর ভুলের ছুতা লইয়া হৈমন্তীকে লজ্জায় ফেলিবার মানুষ যে তপন নয়, এ-বিষয়ে হৈমন্তীর মনে এক কণাও সন্দেহ নাই।

হৈমন্তী তাহার সেই দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের অলস গতির দিকে চাহিয়াছিল। এই মেঘ যুগে যুগে কত বিরহীর কাতর দৃষ্টি ও নীরব প্রার্থনা বহন করিয়া লইয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু যাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার কথা তাহাকে কি কোনও দিন কোনও ইসারা করিতে পারিয়াছে? হৈমন্তীর মন উড়ন্ত মেঘের পিছনে পিছনে ভাসিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু কে তাহাদের পথ বলিয়া দিবে, কে তাহাদের ভাষায় মুখর করিয়া তুলিবে?

এই বাস্তব জগতের কঠিন লেখনীর কালো আঁচড়েই তাহার হৃদয়ের বেদনাকে রূপ দিতে হইল। সে কালির আঁচড়ে মনের ব্যাকুলতার এক কণাও কি ফুটিল? হৈমন্তী কি যে লিখিল, তাহা তাহার কিছুই মনে রহিল না। মনে হইল, আপনাকে সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, এতখানি না বলিলেও চলিত। কিন্তু কতটুকু বলিলে, কি প্রশ্ন করিলে তপন হৈমন্তীর প্রার্থিত উত্তরটি দিবে, কতটুকু না বলিলেই ভাল দেখাইবে তাহা হৈমন্তী ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সে দ্বিতীয়বার চিঠিখানা পড়িলও না, উত্তেজনার বশে যাহা লিখিল তাহাই খামে বন্ধ করিয়া ডাকে দিয়া যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আর দুইটা দিন কাটিলে যাহা হউক কিছু একটা জবাব ত সে পাইবে। মন এমন করিয়া আর ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না, সে একটা স্পষ্ট সত্য আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ তাহার হাতের মুঠির ভিতর আসিয়াছে, কি আকাশ-কুসুম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতে চায়। নিষ্ঠুর সত্যকে সহ্য করিবার শক্তির অভাবে মিথ্যার মায়াকে বহুদিন ধরিয়া চোখের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিতে প্রাণ ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু যাহা ছলনা তাহার উপর ভিত্তি করিয়া জীবনকে গড়িতে কি পারা যাইবে? তাছাড়া হৈমন্তীর মনে আশা জাগিয়াছে, নিষ্ঠুর সত্য তাহাকে শুনিতে হইবে না, মধুর সত্যই সে শুনিবে। দু-দিন আগে-পিছের ব্যাপার ছাড়া আর বেশী কিছু সন্দেহকে সে মনে আমল দিবে না।

চিঠি চলিয়া গেল, হৈমন্তী দিন ঘণ্টা প্রহর গুনিতে লাগিল। কলিকাতার চিঠি কলিকাতাতে দুই-চার ঘণ্টাতেও পৌঁছায় আবার একদিন পরেও যায়। ঠিক যে কখন পৌঁছিবে বলা শক্ত হইলেও তৃতীয় দিনে একটা জবাবের আশা করা যাইতে পারে। ডাক-পিয়নের ময়লা খাকি পোষাক আর পাগড়ীটা যতবার পথের ধারে দেখা দিত ততবারই হৈমন্তী জানালার ধারে আসিয়া দেখিত মানুষটা তাদের বাড়ীতে আসে কি না। ডাকঘর হইতে বাহির হইবার আন্দাজ কত মিনিট পরে যে তাহাদের রাস্তার মোড়ে ওই ময়লা পাগড়ীটা দেখা যায় তাহা এক দিনেই হৈমন্তীর মুখস্থ হইয়া গেল। ডাকবাক্সে চিঠি মাঝে মাঝে পড়িল বটে, কিন্তু তাহা হৈমন্তীর চিঠি নয়।

উৎকণ্ঠাপূর্ণ নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ দিন কাটিতে চাহে না, এক-একটা ঘণ্টা যেন এক-একটা যুগ, বুকের উপর দিয়া ভারী কাঁটার শৃঙ্খল টানিয়া টানিয়া

চলিয়াছে। চিঠি লিখিয়াই উৎকণ্ঠা যেন দশগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। উত্তরের আশা আছে বলিয়াই নিরাশা এমন করিয়া মনকে পীড়ন করিতে পারিতেছে, চিঠি না লিখিলে এমন করিয়া প্রত্যেকটি মুহূর্ত গুনিয়া প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন ত থাকিত না। এক বৎসরে যতখানি আকুলতা মনের উপর ছড়াইয়া থাকিত, তাহা যেন দুই দিনে ঠাসা হইয়া ব্যথায় টন্‌টন্ করিতেছে। হৈমন্তী কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? আর একখানা চিঠি সে লিখিতে পারিবে না। নিখিলকে ডাকিয়া খোঁজ করিতে বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুধা এখানে নাই, থাকিলেও হয়ত কিছুই করিতে পারিত না। কিছু প্রশ্ন করা যেখানে চলিবে না সেই মিলিদের বাড়ী এক যাওয়া যায়, যদি কথায় কথায় কোনও কথা বাহির হইয়া পড়ে।

সুরেশ ও মিলি দুইজনেই বাড়ীতে ছিল। হৈমন্তী নিজেকে যথাসাধ্য সংযত ও স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিয়া চিঠি লিখিবার দিন চার-পাঁচ পরে সেদিন তাহাদের বাড়ীতে সন্ধ্যায় গিয়া উপস্থিত হইল। সুরেশ ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, "গরীবের বাড়ী এত শীগ্‌গির তোমাদের পদধূলি আবার পড়বে তা আশা করিনি।"

হৈমন্তী বলিল, "জ্যাঠাইমা না-হয় দেশেই চ'লে গেছেন। তাই ব'লে মিলিদের সঙ্গে আমাদেরও কি সম্পর্ক চুকে গিয়েছে? একবারটিও ত আপনার আর ও রাস্তা মাড়াবেন না। কাজেই আমি না এসে আর করি কি?"

মিলি সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, "না রে না, আমি কালই সকালে যাব ঠিক করেছিলাম তোর কাছে, কাকাবাবুও আমি না গেলে রাগ করেন জানি। কাল রবিবার আছে, তার উপর উনি সারাদিনই বাড়ী থাকবেন না, আমার ও-বাড়ী যাওয়াই ভাল।"

হৈমন্তী বলিল, "কেন, সুরেশদার কি এখনও আমাদের বাড়ী যাওয়া বারণ? ওঁকেও নিয়ে চল না, অন্য কোথায় আবার কি করতে যাবেন?"

সুরেশ বলিল, "পরের দায় এসে ঘাড়ে পড়েছে, না গিয়ে করি কি? কাল ট্রেন থেকে তপনের একটা চিঠি পেলাম, তার কোন্ বন্ধুর অত্যন্ত জরুরী কাজ, সে বোম্বের দিকে যাচ্ছে। কবে কোথায় কতদিন থাকতে হবে তার ঠিক নেই। অকস্মাৎ যেতে হ'ল ব'লে গ্রামের ইস্কুলের ভাল বন্দোবস্ত ক'রে যেতে পারেনি। আমাদের উপর ভার দিয়েছে একটা বিলিব্যবস্থা করবার।"

হৈমন্তী সংক্ষেপে বলিল, "কি ব্যবস্থা করবেন ?"

সুরেশ বলিল, "তপনের বদলে কয়েক মাসের জন্যে একজন মাস্টার রেখে দিতে হবে, আর রবিবারে রবিবারে নিখিল আর আমি গিয়ে তদারক করব। ওদের ছুটি এমনিতেই শনিবারে, কারণ সেদিন হাট বসে। কাজেই কাজকর্মের কোনও অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, ভাল কথা, তপন কারও সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারেনি ব'লে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছে। সকলের মধ্যে তুমিও একজন ব'লে তোমাকেও ব'লে রাখছি।"

মিলি বলিল, "দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আর বক্তৃতা না শুনিয়ে ঘরে নিয়ে বসাও না। আয় হিমু, তোকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। অসুখ করেছে নাকি কিছু ?"

হৈমন্তী বলিল, "না, অসুখ কিছু করেনি। বাড়ীতে জনপ্রাণী প্রায় কেউ নেই, একলা একলা বড় খারাপ লাগে। শুধু সত্য আর বাবা খাবার সময় একবার ক'রে টেবিলে এসে বসেন, বাকি সময় সবাই নিজের নিজের কাজে।"

ঘরে আসিয়া বসিয়া মিলি বলিল, 'সত্যি, সবাইকার যেন দেশ ছেড়ে পালাবার ধুম লেগে গিয়েছে। মাকে বাবার জন্যে দেশে যেতেই হ'ত, কিন্তু সুধা কলকাতায় থাকলে তোর সঙ্গীর অভাব হ'ত না, তা সেও কিনা ঠিক সময় বুঝে চ'লে গেল। তপনবাবুও আর বন্ধুর উপকার করবার সময় পেলেন না, দিন দে'খে দে'খে বেরিয়ে পড়লেন, পাছে কালেভদ্রে দু-একটা গালাগাল শুনিয়ে মানুষের উপকার ক'রে ফেলেন। মহেন্দ্রদা ত সবার প্রায় সব ব্যবস্থাই ক'রে ফেলেছে, শুনছিলাম দেশ থেকে ফিরে এসে হপ্তাখানেকের মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়বে। যদি দেশ থেকে আসতে দেরী হয়, তাহলে তাঁদের দিনেই সাগর পাড়ি দিতে বেরোতে হবে।"

সুরেশ অকস্মাৎ মহোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, কথা ছিল বটে, কিন্তু ওইখানে একটা গোলমাল বেধে গেছে। দেশ থেকে ফিরবার পর আর পার্টি দেওয়ার সুবিধা হয়ত হ'য়ে উঠবে না ব'লে আমরা আগেভাগে খাইয়ে দিলাম। কিন্তু এখন দেখছি পার্টিটা মহেন্দ্রকে না দিয়ে তপনকে দিলেই ভাল হ'ত। মহেন্দ্র কালই দেশ থেকে ফিরে এসেছে, আমার আপিসে এসেছিল দেখা করতে, বলছে সব কাজকর্ম ভাল ক'রে না গুছিয়ে এত হুড়োহুড়ি ক'রে যাওয়া

ঠিক হবে না। এ জাহাজটা ও ছেড়ে দিচ্ছে, এর পর কোনটায় বুক্ করবে নিজের সব স্থবিধা বুঝে ঠিক করবে।"

মিলি হাসিয়া বলিল, "তোমার বন্ধুদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যার কাজকর্ম ভাল ক'রে গোছানো উচিত ছিল সে রাতারাতি কোথায় দৌড় দিল তার ঠিক নেই, আর যার জাহাজ অবধি ঠিক হয়েছিল তারই অকস্মাৎ শুভমতি হ'ল কাজকর্ম গোছাবার জন্যে। এবার বিলেতের টিকিট না কিনে ওকে রাঁচির টিকিট কিনতে বল।"

হৈমন্তী চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। তপনের খবর পাইবার ক্ষীণ আশা মনে লইয়া সে এ-বাড়ী আসিয়াছিল, এমন খবর পাইবে একবার কল্পনাও করে নাই। এই কথাবার্তায় সে কি ভাবে যোগ দিবে? তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল সেই চিঠিখানার কথা! পাগলের মত তাহাতে এলোমেলো কি যে সে লিখিয়াছিল তাহার স্পষ্ট কিছুই মনে নাই। উত্তেজনার মুহূর্তে দ্বিতীয়বার পড়িয়াও দেখে নাই। চিঠির জবাব আস্থক বা না-আস্থক, তাহা তপনের হাতে পড়িয়াছে মনে এই একটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু এখন তাহাও ত নিশ্চিত বলা যায় না। হৈমন্তী যখন ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, হয়ত তখন তপন বিদেশযাত্রার জন্য তল্পী বাঁধিতেছিল। চিঠিখানা তপনের বাড়ী পৌছিবার অনেক আগেই নিশ্চয় সে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তারপর তাহা কাহার হাতে পড়িয়াছে কে জানে? মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই। কেহ যদি তপন বাড়ী নাই দেখিয়া চিঠিখানা খুলিয়া থাকে? লজ্জায় হৈমন্তীর মাথা হেঁট হইয়া আসিতেছিল। যাহারা হৈমন্তীকে ভাল করিয়া চেনে না, তাহাদের হাতে এ-চিঠি পড়িলে তাহারা কি না ভাবিতে পারে। তাহার জীবনে যাহা পূজার ফুলের মত পবিত্র, মানুষের মক্ষিকাবৃত্তি তাহাকে কালিমা-ময় করিতে এতটুকুও ইতস্তত করিবে না।

মিলি আবার বলিল, "হিমু, আমরা এত ব'কে মরছি তুই ত কই কথা বলছিস্ না। নিশ্চয় তোর কিছু হয়েছে। দাঁড়া, চা ক'রে আনি, গরম গরম চা খেলে চাঙ্গা হয়ে উঠবি।"

পিছন হইতে নিখিল ডাকিয়া বলিল, "আমার জন্যেও এক পেয়ালা চা করবেন। অনেক জায়গায় নিরাশ হয়ে আজ প্রথম আপনার এখানে একটু আশার আলো দেখছি।"

হৈমন্তী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার হাসিয়া বলিল, "কিসের সন্ধানে আপনি এত ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ?"

নিখিল বলিল, "মানুষের সন্ধানে। যার বাড়ী যাই, সব দেখি ডেসার্টেড। পরশু তপনের বাড়ী গিয়ে দেখলাম, সে পালিয়েছে। কাল আপনার বন্ধুর বাড়ী সাহস ক'রে গিয়ে দেখলাম, তিনিও নেই। আজ মরিয়া হয়ে একটু আগে আপনার ওখানে গিয়েছিলাম, আপনাকেও না-পেয়ে শেষে এইখানে শেষ চেষ্টায় এসেছি।"

হৈমন্তী বলিল, "সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, চলুন আমরাও পালাই।"

নিখিল বলিল, "বাস্তবিক, কলকাতাটা একেবারে মিয়োনো মুড়ির মত বিশ্রী হয়ে গিয়েছে।"

সুরেশ বলিল, "হিমু, ওর সঙ্গে আর কথা ব'লো না। আমরা এতগুলো মানুষ কলকাতায় রয়েছি, আমাদের কি কোনও দাম নেই ? সুধাই কেবল এখানে সুধা-সঞ্চার করতে পারে ?"

নিখিল লাল হইয়া বলিল, "না, না, তেমন কোনও কথা ত আমি বলিনি। আমার এত স্পর্দ্ধা নেই এবং এমন অবাচীনও আমি নই। লোকে কেন পালাচ্ছে তাই বলছিলাম।"

নিখিল ও সুরেশ চেষ্টা করিল, কিন্তু চায়ের মজলিস জমিল না। হৈমন্তীর মনে কেবল একই কথা ঘুরিতেছিল। তাহা ঠিক কি, না বুঝিলেও, নিখিল এটুকু বুঝিল যে মহেন্দ্রর বিদায়-উৎসবে সে হৈমন্তীকে যাহা বলিয়াছিল তাহারই ক্রিয়া হৈমন্তীর মনে চলিয়াছে। কিন্তু তপনের আচরণে নিখিলের কথা মিথ্যা হইয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে দেখিয়া নিখিল হৈমন্তীর নিকট নিজেকে কতকটা যেন মিথ্যাচারী বলিয়াই বোধ করিতেছিল।

ইহাদের কথায় হৈমন্তী বুঝিল তপন দীর্ঘকালও বাড়ী না ফিরিতে পারে। যাক, যদি তপন তাহার চিঠি না পাইয়া থাকে ভালই হইয়াছে, হৈমন্তী যাহা মনে করিয়াছিল তাহা সত্য হইলে এমন নিরাসক্তভাবে তপন কি চলিয়া যাইতে পারিত ? নিকটে থাকিয়া নীরবতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা না-হয় বুঝা যায়, কিন্তু এমন করিয়া সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রার অর্থ সে ত কিছুই বুঝিতেছে না।

৩২

মিলির বিবাহের পর বাড়ী ফিরিয়াই সুধা ঠিক করিয়াছিল, মাকে লইয়া সে একবার নয়ানজোড়ে যাইবে। যে আবেষ্টনের ভিতর জন্ম হইতে শৈশবের সকল আনন্দ সে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার জীবন গঠিত, বেদনার দিনে সেইখানেই সে জুড়াইতে যাইতে চায়। মানুষের সকল ব্যথার ক্রন্দনই যেমন 'মা'কে ডাকিয়া আশ্রয় চাওয়া, এই জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণও তেমনই তাহার আশ্রয়ভিক্ষা। নূতন জীবনে সুখদুঃখ যাহা তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে তাহা এই শৈশবের নীড়ে আসিলে কিছুকালের মত অন্ততঃ হাঁসের পালকের জলের মত তাহার চিত্ত হইতে ঝরিয়া পড়িবে। অতি দুঃখের দিনে আজকাল সে যখন রাত্রির স্বপ্নের ক্রোড়ে আপনার ব্যথাহত চিত্তটি লইয়া পলাইয়া যায়, তখন বহুবার দেখিয়াছে নিদ্রাদেবী তাহাকে পথ ভুলাইয়া লইয়া যান সেই স্বপ্নলোকে যেখানে তাহার দিদিমা ভুবনেশ্বরী সকালে উঠিয়া নাতি-নাতনীর দুধ মাপিতে বসেন, মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ ভুলিয়া পুকুরের জলে সখীদের সঙ্গে সাঁতার কাটেন, দাদামহাশয় দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গাড়ী হইতে কোলে করিয়া নামাইতে চান। কোন্ মায়াস্পর্শে তাহার জীবনের এতগুলা বৎসর পিছাইয়া চলিয়া যায় সে বুঝিতে পারে না। তাহাদের গতির সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া লইয়া পিছু হটিয়া নিঃশব্দে তাহারা চলিয়া যায়, সুধার জীবনের ছোটবড় ব্যথার ক্ষতগুলি রাত্রির অন্ধকারে জুড়াইয়া দিবার জন্য। নয়ানজোড়ের ধূমলেশহীন দিনের আলোও এই রাত্রির অন্ধকারকে অনেকখানি সাহায্য করিবে বলিয়া সুধার বিশ্বাস। তাই সুধা তাহার পঙ্গু মায়ের অনেক অসুবিধার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তাহাকে সঙ্গে যাইতে রাজি করাইয়াছে। তাহাকে ফেলিয়া গেলে সেখানে ত সে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না।

শৈশব তাহাকে যে আনন্দ দিয়াছিল তাহাতে ছন্দের দোল দিবার জন্য দুঃখের কোনও আঘাত ছিল না, কিন্তু যৌবনের আনন্দে দুঃখবেদনার আঘাত তাহার সুখকে ছাপাইয়া উঠিতে চলিয়াছে। যদিও এই দুঃখের কষ্টিপাথরেই তাহার প্রেমকে সে চিনিয়াছে, তবু ইহার হাত হইতে ক্ষণিকের মুক্তি যদি সে না পায়, তাহা হইলে হৃদয়তন্ত্রী তাহার টুটিয়া যাইবে।

শেষবর্ষণের ঘনঘটার মধ্যে সুধা নয়ানজোড়ে আসিয়া পৌছিল। গরুর গাড়ী করিয়া স্টেশন হইতে যখন তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌছিল তখন ভরা বর্ষার কালো মেঘসাগরের বুকে চতুর্থীর চাঁদ ছোট একটি আলোর নৌকার মত ভাসিয়া চলিয়াছে। উন্মত্ত তরঙ্গের মত মেঘ কখনও তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, কখনও আবার সে জাগিয়া উঠিতেছে মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে। এ যেন গঙ্গাধর মহাদেবের জটাজালে দীপ্যমান শিশুশশী। বর্ষার এই ঘন কালো মেঘজালে ভাসমান চতুর্থীর চাঁদ কবে কোন্ আদি কবির মনে এ কল্পনা আনিয়া দিয়াছিল কে জানে? সুধার মনে হইল, [illegible] গঙ্গা এই মেঘের জটা হইতে যেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিলেন, তেমনই [illegible] তাহার প্রাণেও এই ঘন বর্ষা শান্তিধারা ঢালিয়া দিতে পারিবে।

গরুর গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে এখনই [illegible] সাঁওতাল আসিয়া বাক্স-বিছানা নামাইতে লাগিল। মুখখানা কিছুমাত্র ম্লান না করিয়া সে প্রথমেই বিনা ভূমিকায় খবর দিল, “[illegible] মরে গেছে [illegible]।”

মহামায়া বলিলেন, “আহা, কি হয়েছিল বাছার?”

সুধার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। হাড়ু যে কি জবাব দিল তাহা সুধা শুনিল না। মৃগাঙ্ক ও হাড়ু মহামায়াকে ধরিয়া নামাইল। সুধা লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিল। সেই ছেলেবেলার মৃগাঙ্কদাদা, এখন মস্ত একজন ভদ্রলোক হইয়াছে, বলিল, “সুধা আর ত ডাগর হয়নি, মামামা!” কিন্তু সুধার মনে হইল জীবনের অভিজ্ঞতায় সুধাই তাহার চেয়ে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মৃগাঙ্কদাদার জীবনে এখনও ধান আদায়, গোলা বোঝাই ও জমি বিলি করা বছরে বছরে একই ভাবে ঘুরিয়া আসে, সুধার জীবন ইহারই ভিতর কত দীর্ঘ পথের কাঁটা মাড়াইয়া ফুল কুড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

পিসিমা হৈমবতী অন্ধকারে ঘরের ভিতর বসিয়া হরিনামের ঝুলি লইয়া মালা করিতেছিলেন। সুধাদের দেখিয়া মালাটি মাথায় ঠেকাইয়া দেয়ালের পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিলেন। সেই তাহার তেজস্বিনী পিসিমার মুখে কি একটা অসহায় ভাব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি পৃথিবীতে কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই, কাহারও অভাবে ভয় পান নাই, তিনি যেন এই অন্ধকারে হাতড়াইয়া সহায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সুধার মনটা দমিয়া

গেল। নয়নজোড়কে সে যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ত ঠিক নাই। পৃথিবীতে দুঃখ কি শুধু তাহার জন্য, যে সে দুঃখের হাত হইতে পলাইয়া বাঁচিবে অপরের সুখশান্তি দেখিয়া? দুঃখ পৃথিবীর নিঃশ্বাস-বায়ুর ভিতর দিয়া বিশ্ব-জনের হৃদয়ে ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

পিসিমার মুখের সতেজ রেখাগুলি বেদনায় যেন ঠোঁটের কোণে, চোখের কোণে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, পায়ের জোরে মাটি আর তেমন কাঁপিয়া উঠে না। পিসিমা দুই হাতে সুধাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। মহামায়াকে দেখিয়া বলিলেন, "বৌ, তুমি সেদিনের মেয়ে, তোমাকে এমন দে'খে যাওয়াও আমার অদৃষ্টে ছিল? কত দেখেছি, জানি না আর ওকত দেখতে হবে!" এই বিষণ্ণতার আবহাওয়া সুধার ভাল লাগিতেছিল না, সে বলিল, "পিসিমা, আজ রাত হয়েছে, মাকে শুইয়ে দিই, কাল দিনের আলোয় অনেক গল্প হবে এখন।"

যে-ঘরে সুধারা ছেলেবেলায় শুইত সে-ঘরটা জিনিসপত্রে ঠাসা পড়িয়া আছে, অনেক কাল তাহা খোলা হয় নাই। সুধারা পিসিমার ঘরের মেঝেতেই বিছানা পাতিয়া শুইল।

রাত্রি হইতেই বৃষ্টি শুরু হইয়াছিল, সারা রাত্রি কানের কাছে ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টির শব্দ হইয়াছে। কখন যে সকাল হইয়া গিয়াছে সুধা টেরও পায় নাই। বেশ খানিকটা বেলায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বৃষ্টির এখনও বিরাম নাই। সমস্ত আকাশ কান-ঢাকা ব্যালাক্লাভা ক্যাপের মত মেঘের টোপর পরিয়াছে; কোনখানে একটুও ফাঁক নাই। তাহা হইতেই ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি গুঁড়া বালির মত ঝরিয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় এমন বৃষ্টি মানুষের সহ্য হয় না, কিন্তু এখানে দিনের আলোয় সুধার মনটা প্রসন্ন হইয়াছিল, এ-বৃষ্টি তাহার ভালই লাগিল।

পশ্চিম দিকের সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেতের পর যে শালবনটা ছিল, এবার সুধা দেখিল কোন্ কাঠের ব্যবসাদার আসিয়া তাহা নির্মূল করিয়া কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। পিছনের নদীর জলরেখা এখন দেখা যায়। বর্ষায় নদীর জল তাল-ক্ষীরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ফাঁপিয়াছে যেন ফুটন্ত দুধের কড়া। ওপারের বালুর চর ডুবাইয়া একেবারে সবুজ অরণ্যানীর বুকে গিয়া ঠেকিয়াছে স্ফীত রক্তাভ নদী। ঝাঁকে ঝাঁকে বক নদীর দিক হইতে উড়িয়া ওপারে কোথায় চলিয়াছে। তাহাদের শেষ নাই, কোথা হইতে আকাশের বুকে দোদুল্যমান

এই বলাকার মালায় একের পর এক করিয়া পদ্মের মত শুভ্র বকগুলি গাঁথিয়া দেওয়া হইতেছে কেহ জানে না। ইহাদের ডানার দ্যুতি দেখিয়া দশ বৎসর পূর্বেকার বালিকা সুধা যেন স্বপ্নময় ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল।

মনে হইল, ওই শৈশবের দৃষ্টি দিয়া পৃথিবীর সহিত প্রথম যে বিস্ময়-ঘন পরিচয়, তাহাই সত্য, তাহাই শাশ্বত, যৌবনবেদনার এ কোন দুঃখময় গহনবনে সে ঘুরিয়া মরিতেছিল? ওদিকে আর ফিরিয়া না চাহিয়া এই হারানো শৈশবে সে যদি আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিত তাহা হইলে জীবনে কোনও সমস্যার পদতলে মাথা কুটিতে হইত না, আপনার কাছে আপনি নিরন্তর জবাবদিহি করিবার কোনও ভাবনা থাকিত না। ওই বর্ষার মেঘ, ওই নদীর জল, ওই বকের ডানার দ্যুতি তাহারা আজও সেই অতীতের ধারাতেই চলিয়াছে, কেন মানুষের জীবনের মিথ্যা এ দুঃখময় পরিবর্তন?

তবু তাহার এ দুঃখকে সে ভুলিতে চাহে না, এই ধরণীর সৌন্দর্যের সহিত ছন্দ রাখিয়া তাহা তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য হইয়া থাকুক। মাসীমা সুরধুনীর মত মনোমন্দিরেই চির-জাগর প্রদীপ জ্বালিয়া সে দেবতার আরতি করিয়া যাইবে। সে আরতিতে অশ্রুর অন্ধকার যদি না থাকিত, দুঃখজয়ের গৌরব যদি প্রদীপ-শিখার মত দীপ্তি দিত, তবেই সার্থক হইত তাহার প্রকৃতির ক্রোড়ে সাধনা।

কিন্তু এ পণ টিঁকে না। যে মাটিতে দুঃখের ফসল ফলিয়াছিল তাহা ছাড়িয়া আসিয়া মনে একটু স্থৈর্য আসিয়াছে বটে, কিন্তু এই মূক পৃথিবীর সহিত প্রাণের কথার বিনিময় যে চলে না।

সুধা দিন গুনিতে লাগিল কবে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে, কবে মানুষের আবেষ্টনে প্রাণে হাসিকান্নার ঢেউ আবার দুলিয়া উঠিবে। তপনের আশা সে হারাইয়াছে বিশ্বাস হয় না, দূরে আসিয়া মনে হয় হৈমন্তীর ঘরের সেই রাত্রির কাহিনী সবই বুঝি স্বপ্ন। কি করিয়া তাহা সে বলিতে পারে না, কিন্তু কোনওপ্রকারে হয়ত সে স্বপ্ন তাহার টুটিয়া যাইবে।

ঘটনাবৈচিত্র্যহীন দিন কাটিতে লাগিল। সেদিন ভরা বর্ষার পর সূর্যের আলোতে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। কালো মেঘের পুঞ্জ সাদা হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি মেঘের বুক চিরিয়া চিরিয়া আলোর তুবড়ীর মত সহস্রমুখী হইয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, কোথাও বা মেঘের মাথায় মাথায় হীরার মুকুটের

মত জলজল করিতেছে। মাঠে পুকুরে ক্ষেতে খালে বিলে জল টলমল করিতেছে। তাহার উপর সূর্যের তির্যকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অকস্মাৎ প্রকৃতি যেন একটা বিরাট শিশমহল হইয়া উঠিয়াছে, যেন হাজার দর্পণের ভিতর দিয়া সূর্যের আলো ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। গাছের মাথায় পাতায় পাতায় অভ্রকণার মত জলবিন্দু জলিতেছে। এক সূর্যের কোটি প্রতিবিম্ব।

চন্দ্রকান্ত ছাড়া কলিকাতা হইতে এই একমাসে সুধা কাহারও চিঠি পায় নাই, সুধা আজ সকলকেই এক একখানা চিঠি লিখিয়া খবর লইবে ঠিক করিয়াছিল। কাগজ কলম লইয়া মাদুর পাতিয়া সে তাহার ছেলেবেলার সেই দাওয়ায় বসিয়াছিল। হাড়ু সাঁওতাল হাট হইতে ফিরিবার পথে মাদুরের উপর একখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল।

সুধা চমকিয়া উঠিল, এ কাহার চিঠি? এ লেখার ছাঁদ ত সে ভুলিতে পারে না। কিন্তু তপন ত কখনও সুধাকে চিঠি লেখে না। না-জানি ইহাতে কি আছে? ভাল না মন্দ, হাসি না অশ্রু, কে বলিতে পারে?

এইখানে এই পথের ধারের দাওয়ায় বসিয়া সে চিঠি পড়িবে না। কে কখন আসিয়া পড়িবে, কোন্ অসময়ে মিথ্যা প্রশ্নে তাহাকে উত্যক্ত করিবে কে জানে? সুধা কাগজ কলম ঘরে রাখিয়া চিঠিখানা হাতে করিয়া সাঁওতাল-পাড়ার দিকে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

তপন লিখিয়াছে,

"সুধা, তোমাকে নাম ধ'রে চিঠি লিখছি ক্ষমা ক'রো। আর কোনও সম্বোধন তোমাকে করতে পারি না, পারব না ব'লেই আজ চিঠি লিখছি। আমি পলাতক, আরও কতদিন পলাতক থাকব তা জানি না। হয়ত আমাকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে বন্ধুমহলে, তুমি শুনে থাকবে। যার মধ্যে কল্পনার স্থান নেই, যা খাঁটি সত্য সেইটুকু তোমাকে বলতে এসেছি। তোমার মনের কথা কিছুই জানি না। না জেনে আমার অর্ঘ্য তোমায় নিবেদন করা উচিত কি অনুচিত ভাবতে বসব না, আমার যা বলবার তা বলা ছাড়া আজ উপায় নেই।

"তুমি জান আমি কথা কম বলি, চিঠিতেও বাক্যজাল বিস্তার করব না আমার অন্তরের যে মণিকোঠায় তোমার জন্য দেবতার বেদী রচনা করছিলাম, সেটি যদি তোমায় খুলে দেখাতে পারতাম, আর ভাষার প্রয়োজন হ'ত না।

"কিন্তু মানুষের প্রথম যৌবনের অর্ঘ্য নিবেদনে সঙ্কোচ একটা বড় জিনিস। আমার যোগ্যতার কথা তুলব না, যোগ্যতা যদি থাকতও, তবু এগিয়ে এসে দাঁড়াতে আমার ভীরু মন আরও কত দীর্ঘদিন নিত জানি না। সে ভীরুতার শাস্তি আমি পেয়েছি, সকরুণ সে শাস্তি, তাই সুকঠিন।

"তোমার কাছে যা বলিনি, অপরের কাছে তা বলবার সুযোগ এসেছিল, প্রয়োজনও বোধহয় ছিল। কিন্তু আমার সঙ্কোচ, আমার মূর্খতা, সেখানেও আমাকে বোবা ক'রে রেখেছিল।

"বিধাতার শাস্তি নেমে এল পুষ্পমালার রূপ ধ'রে। এ শুধু আমার শাস্তি নয়, নিরপরাধিনী একটি বালিকারও শাস্তি। বুঝতে পারলাম না, ভগবান কেন শাস্তি দিলেন তাকে যার মাথায় তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ ঝ'রে পড়া উচিত ছিল। বেদনায় বুক ফেটে আসতে লাগল, তবু গ্রহণ করতে পারলাম না সে পুষ্পমালা। মুখ দেখাব কি ক'রে সেখানে তার এই দুঃখের দিনে? তাই আমি পলাতক।

"একথা সে জানে না, আর কেউ জানে না, শুধু আমিই জানি আর আজ তুমি জানলে। আমার দুর্ভিক্ষপীড়িত মনের একমাত্র অন্ন যার ছায়াময়ী মূর্তি, তাকে না জানিয়ে আর থাকতে পারলাম না।

"আমি জানি তুমি একথা কোথাও প্রকাশ করবে না। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে—তোমার কাছে আসা, তবু তুমি ক্ষমা ক'রো। দীর্ঘদিন পথে পথে ঘুরব তুমি ক্ষমা করেছ এইটুকু সান্ত্বনা মনে নিয়ে। যদি কখনও সময় হয়, যদি কখনও ডাক দাও, ফিরে আসব।"

সুধার চোখের জলে চিঠির পাতা ভিজিয়া গেল। এ তাহার সুখের দিনে দুঃখের অশ্রু, না দুঃখের দিনে সুখের অশ্রু? সে আপনার শূন্য মন্দিরে যে নিভৃত পূজার আয়োজন করিতেছিল, তাহাতে আজ অসময়ে দেবতার আসন টলিল কেন? সে ত ডাকে নাই, সে ত চাহে নাই। যে দিন সে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আপনার প্রার্থনাকে আপনি রুদ্ধবাক্ করিয়া টিপিয়া মারিতে বসিল, সেইদিনই এই সাড়া?

এ-চিঠির কি জবাব সে দিবে? বিধাতা নিজে হৈমন্তীর সুখের দিন না আনিয়া দিলে সুধা কি ইহার জবাব দিতে পারিবে?

গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য বই

চিরন্তনী	উপন্যাস	মূল্য ৩৲
জীবনদোলা		মূল্য ২॥০
দুহিতা		মূল্য ১৲
উর্বশী	গল্পের বই	মূল্য ১।০
সিঁথির সিঁদুর	”	মূল্য ১৲
স্মৃতির সৌরভ	উপন্যাস	মূল্য ১॥০
বধূবরণ	গল্পের বই	মূল্য ১॥০
হুক্কাহুয়া	ছেলেমেয়েদের সচিত্র বই	মূল্য ।০

উদ্যানলতা মূল্য ১॥০
হিন্দুস্থানী উপকথা মূল্য ২৲
সাত রাজার ধন মূল্য ১৲
} শ্রীসীতা দেবীর সহযোগে লিখিত